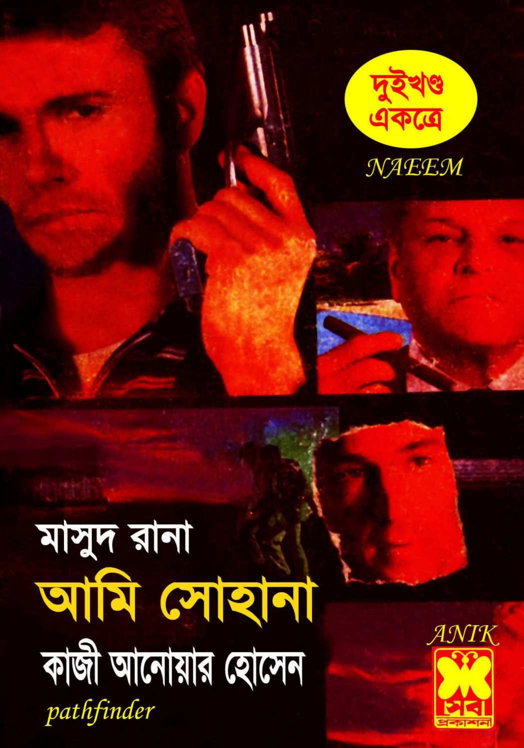


দুইখণ্ড একত্রে

মাসুদ রানা

আমি সোহানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

সাঁইত্রিশ টাকা

ISBN 984 16 7201 4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩
তৃতীয় প্রকাশ ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
AMI SOHANA
(Part I & II)
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

আমি সোহানা-১ ৫—১১৮
আমি সোহানা-২ ১১৯—২৪০

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক *কায়রো *মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র *রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক *শয়তানের দূত* এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা *তিন শত্রু অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ *পাগল বৈজ্ঞানিক এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা *হংকং সম্রাট *কুউউ! বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক *আই লাভ ইউ, ম্যান সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন *বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা *প্রতিশোধ *মেজর রাহাত লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা *বেনামী বন্দর *নকল রানা রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় *মরণ খেলা অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন *বুমেরাং কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয়সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক *সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী দুই নম্বর *কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ কালপুরুষ *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া।

আমি সোহানা-১

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৯৩

এক

মানুষটা সতর্ক, কাজেই অসন্তুষ্ট হবার কারণ আছে মাসুদ রানার।

পানিতে নামার আগে ও পরে পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছে স্কুবা গিয়ার নিখুঁত অবস্থায় আছে কিনা। মাস্ক-এর বাইরেটা সিগারেটের অবশিষ্টাংশ দিয়ে ঘষেছে, লেন্সের ওপর দিয়ে পানি যাতে অবাধে বয়ে যেতে পারে, কারণ জানে, তা না হলে সামনের দৃশ্য কাঁপা কাঁপা লাগবে চোখে। ভেতরটা ঘষেছে কেল্প দিয়ে, লেন্সে যাতে বাষ্প না জমে। খানিক পরপর এয়ার ডিমান্ড রেগুলেটর অ্যাডজাস্ট করেছে, কারণ গভীরতা কয়েক ইঞ্চি কমবেশি হলেও অনায়াসে শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

রানা আরও জানে, কব্জিতে বাঁধা স্টেনলেস স্টীল রোলেক্স ওকে জানিয়েছে, এবারের ডাইভে চল্লিশ ফুট গভীরতায় সতেরো মিনিট ধরে রয়েছে ও। এটা ওর দিনের সপ্তম ডাইভ। তারমানে, সব মিলিয়ে দু'ঘণ্টার ওপর থাকা হয়ে গেছে পানির তলায়। সারফেস থেকে দশ ফুট নিচে দু'মিনিটের জন্যে থামতে হবে ওকে, ডিকমপ্রেশন-এর জন্যে—ওঠার সময়।

স্কুবা ডাইভিঙের সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চলার পরও, মুহূর্তের অসতর্কতায় বিপদ একটা ঘটেই গেল। সাগরের মেঝেতে শুধু বালি নয়, প্রবালও রয়েছে; এমনভাবে পা ছুঁড়ল ও, রাবার ফিন পরা পায়ের নগ্ন গোড়ালি একটা স্টার ফিশের তীক্ষ্ণ-মুখ কাঁটাবহুল মেরুদণ্ডে বাড়ি খেল।

পানির তলায় শব্দে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কর্কশ ভাষায়, মনে মনে, ক্ষোভ প্রকাশ করাও কঠিন, কারণ তা করতে গেলে দম আটকে রাখার একটা ঝোঁক এসে যায়, স্কুবা ডাইভিঙের সময় তা বিপদ ডেকে আনতে পারে। তবে শান্তভাবে চিন্তা করায় কোন বাধা নেই। 'তুমি একটা গর্দভ, কারণ এ-ধরনের ভুল শুধু আনাড়িদেরই মানায়,' ধরনটা অলস ভাবনার মত, তবে শব্দ নির্বাচনে নির্দয়তার পরিচয় দিল রানা, গালিটা যেন মনে থাকে।

ধৈর্যের সঙ্গে, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত, রশি দিয়ে বানানো বড় বাস্কেটটা নামিয়ে রাখল ও, পা থেকে খুলে ফেলল ফ্লিপার। হাতের প্রাইং-আয়রন দিয়ে পাথরের গা থেকে ছাড়িয়ে আনল সী স্টারকে। বিশাল, চামড়াসর্বস্ব শরীরটা প্রায় দু'ফুট, টকটকে লাল কাঁটাগুলো নড়াচড়া করছে। ওগুলোরই কিছু ডগা, নিজস্ব বিষসহ, ভেঙে রয়ে গেছে রানার পায়ের তলার মাংসে।

প্রাইং-আয়রনের সাহায্যে কাঁপতে থাকা শরীরটা চিৎ করল রানা, উল্টোদিকের নরম শোষকের মুখে চেপে ধরল পায়ের গোড়ালি। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র

টান অনুভব করল মাংসে. শুষে নিচ্ছে।

দু'মিনিট পর তীব্র ব্যথা কমে এল। পা ছাড়িয়ে নিয়ে সী স্টারের স্তূপটাকে প্রাইং-আয়রনের ডগা দিয়ে সরিয়ে দিল দূরে, আবার ফ্লিপার পরল, তারপর পরবর্তী দশ মিনিটের জন্যে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে রইল রানা। চারপাশের পানি শান্ত ও স্বচ্ছ, বিশ সেকেন্ড পরপর থামল ও, চোখ বুলিয়ে দেখে নিল কোন হাঙর বা মোরে ঈল আসছে কিনা।

ঝিনুকের বড় খোল খুঁজে পেতে হলে অভিজ্ঞ চোখ থাকা চাই, বিশেষ করে ওগুলো যদি বালির নিচে আংশিক গাঁথা থাকে। কাউকে এগোতে দেখলে মুখ বন্ধ করে ফেলে ওগুলো, কিংবা বুদবুদ ছাড়ে, কিন্তু তা এতই মৃদু ও খুদে যে সাধারণত কারও চোখে ধরা পড়ে না। মুক্তো সংগ্রহ দীর্ঘদিনের শখ রানার, ওর চোখকে ফাঁকি দেয়া সহজ নয়। বালি খুঁড়ে, পাথরের খাঁজে আঙুল গলিয়ে ওগুলোকে বের করে আনল ও। বোটটা চল্লিশ ফুট ওপরে, সাগরের তলায় প্রকাণ্ড ছায়া ফেলেছে।

দেখতে দেখতে ভরে গেল বাস্কেট, ঝুলে থাকা রশির কাছে ফিরে এল রানা, বাস্কেটের হাতলের সঙ্গে রশির প্রান্তটা বাঁধল। উঠতে শুরু করবে, তার আগে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল আরেকবার। না, হাঙর বাবাজিরা নেই আশপাশে। অলস ভঙ্গিতে উঠছে, লক্ষ রাখছে প্রতিদ্বন্দ্বী বুদবুদগুলো যেন আগে থাকে।

তিন মিনিট পর পানির ওপর মাথা তুলল রানা, ফিশিং বোটের পাশে বাঁধা ধাপ বেয়ে উঠে পড়ল ওপরে। একটানা কয়েকটা দিন রোদে থাকায় ওর চামড়া পুড়ে গেছে, পরনের একদা নীল ডেনিম ট্রাঙ্ক প্রায় সাদা হয়ে এসেছে। মাস্ক ও ফ্লিপার খুলে ফেলল ও, তারপর পিছন ফিরল জার্কার দিকে, সত্তর-কিউবিক-ইঞ্চি অ্যাকুয়ালাঙটা খোলার জন্যে তার সাহায্য দরকার।

'সী স্টার,' বলে বসে পড়ল রানা, পা-টা তুলল। ভাঙা টোবাকো পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে বোটের বাইরে থুথু ফেলল জার্কা, তারপর রানার পায়ের তলায় তাকাস শিরাবহুল আঙুল দিয়ে টেপাটেপি করল মাংস।

'ইজ ওকে,' বলল জার্কা, তার ইংরেজি শুনে এখন আর হাসে না রানা। পাইপটা আবার মুখে তুলে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল লোকটা। বাস্কেটের ঝিনুকগুলো বোটের মেঝেতে ঢালা হয়েছে। জার্কার হাতে ছোট একটা ছুরি, দ্রুত অভ্যস্ত হাতে প্রতিটি ঝিনুক খুলছে সে, ওপরের পিচ্ছিল চামড়ার আবরণে আঙুলের চাপ দিচ্ছে, খোলের চকচকে ভেতরটা গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখার পর কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলছে পিছন দিকে।

জার্কা একজন আদিবাসী, চোদ্দপুরুষ ধরে আর্কিপিলাগো দে লাস পারলাস-এ বসবাস করছে ওরা, বড় হয়েছে পালোটো গ্রামে। পানামার মেইনল্যান্ড পারোটো থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে, সারা জীবনে একবারই মাত্র সেখানে গেছে জার্কা। তার বয়স পঞ্চাশ, দেখে মনে হয় সত্তর, কিন্তু আটচল্লিশ ঘণ্টা একটানা পরিশ্রম করার পরও এতটুকু ক্লান্ত হয় না বা চোখের পাতা নেমে আসে না। সারাটা জীবনই মুক্তো সংগ্রহ করছে জার্কা, ফলে তার পিঠ বাঁকা হয়ে গেছে। দশ বছর আগে ডাইভিঙের সময় এক দুর্ঘটনায় মারা গেছে তার স্ত্রী। পরে অল্প বয়েসী একটা

মেয়েকে বিয়ে করেছে সে। বিয়ে করে বিপদেই পড়েছে জার্কা, কারণ নতুন বউয়ের জেদ, ডাইভিং ছাড়তে হবে তাকে। কাজের অভাবে আদিবাসীরা বেশিরভাগ চোর-ডাকাত হয়ে গেছে, জার্কা সৎভাবে বেঁচে থাকতে চায়, ডাইভিং ছেড়ে দিলে সংসার চালাবে কিভাবে সে? বউয়ের ইচ্ছে শহরে গিয়ে বসবাস করে তারা, ফুটপাথে বসে ব্যবসা করলে তাদের সংসারে আর কোন অভাব থাকবে না। তার কথায় যুক্তি আছে, কারণ ট্যুরিস্টরা এদিকে প্রায় না আসায় জার্কার রোজগার খুবই কম হয়, তাতে সংসার চালানো অত্যন্ত কঠিন। বছরে দু'একজন ভবঘুরে টাইপের ট্যুরিস্ট যা আসে, তারা সবাই আমেরিকান হলে কি হবে, হয় পকেট খালি নয়ত হাড় কিপটে, মজুরি বা মুক্তোর দাম, কোনটাই ন্যায্য পাওয়া যায় না। এই প্রথম একজন অ-আমেরিকানকে মক্কেল হিসেবে পেয়েছে জার্কা। লোকটার আচরণ লক্ষ করে তার মনের সমস্ত দুঃখ যেন উথলে উঠেছে। এ আবার কেমন লোক, খেতে বসলে ভাগ দেয় তাকে, দশটা মুক্তো পেলে ন'টাই তাকে দিয়ে দেয়? আবেগে অস্থির জার্কা তার সমস্ত দুঃখবেদনার কথা গলগল করে বলে ফেলেছে ওকে। একটুও বিরক্তবোধ করেনি তার নতুন মক্কেল, মন দিয়ে শুনেছে কথাগুলো। তবে কোন মন্তব্য করেনি। যদিও কাজটা ভাল হয়নি বলে সন্দেহ হচ্ছে তার, কারণ কথাগুলো শোনার পর জার্কাকে আর একটি মুক্তাও দান করেনি ও। কে জানে, তার গল্প হয়তো বিশ্বাস করেনি। হয়তো মনে মনে তার ওপর খেপে গেছে, ধরে নিয়েছে নির্লজ্জ সাহায্যপ্রার্থী। সেই থেকে লজ্জায় মরে যাচ্ছে সে।

'ওরা দু'জন একা,' বিড়বিড় করল জার্কা, হাত দুটো মুহূর্তের জন্যে থেমে নেই। 'খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা!' একটা করে ঝিনুক খুলছে সে, ছুরির ডগা দিয়ে পেশী ছিঁড়ছে, ভেতরে কোন ফোসকা বা ফুসকুড়ি দেখলে সেটাও কাটছে, কারণ অনেক সময় ওগুলোর ভেতরও আড়াল করা থাকে মুক্তো। না থাকলে পিছনের স্তূপে ফেলে দিচ্ছে খোলটা। 'সাথে কোন পুরুষমানুষ নেই। নির্ঘাত বিপদে পড়বে।'

কি যেন নাম তার মক্কেলের? মাসুদ আনা। আনা না রানা? নাম যা-ই হোক, ভারি কাজের লোক। আজ পনেরো-ষোলো দিন একসঙ্গে রয়েছে ওরা, ওর কেরামতি দেখে রীতিমত তাজ্জব বনে গেছে জার্কা। অত্যন্ত খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক, বাছাই না করে কোন ঝিনুক তোলে না। তারপরও প্রতিদিন দুশো করে তুলছে। প্রায় গোলাকার দুটো বড় মুক্তো পেয়েছে ওরা। ঈশ্বরই বলতে পারে কত দাম হবে ওগুলোর। আঠারোটা মুক্তো দিয়ে বোতাম তৈরি করা যাবে। ছয় জোড়া মুক্তো পেয়েছে পানির ফোঁটা আকৃতির। আরও বত্রিশটা ছোট মুক্তো, ছোট হলেও রঙ আর নকশার জন্যে চড়া দামে বিক্রি হবে ওগুলো।

নির্দয় সূর্যের নিচে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাজ করছে ওরা। পুব দিকে চার মাইল দূরে রয়েছে আইলা দেল রেই, পশ্চিমে ঘন বাষ্পে ঢাকা পড়ে আছে সান হোসে উপকূল। মাঝখানে গাছপালা নিয়ে ছোট ছোট অনেকগুলো দ্বীপ বিন্দুর মত ছড়িয়ে আছে, সাগরের তলা থেকে খাড়াভাবে উঠে এসেছে পানির ওপর। নিচের দিকে নামছে সূর্য, তবে এখনও এত গরম লাগছে যেন তন্দুরের ভেতর রয়েছে ওরা। 'মাত্র দু'জন!' বিস্ময়ে আবার বিড়বিড় করে উঠল জার্কা। 'বিপদ হলে কেউ

সাহায্য করার নেই।'

শেষ ঝিনুকটা ফেলে দিয়ে পানি থেকে নোঙর তুলল রানা, জার্কার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাল আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

যেন একটা ধাক্কা খেল জার্কা। 'কোথায়, বস্? কেন?'

'আরও পুব দিকে সরে যাব, আমার আরও বড় ঝিনুক দরকার।'

'আমিও যাব, বস্।' দৈনিক পাঁচ ডলার সমমূল্যের বালবোয়া মজুরি হিসেবে পাচ্ছে জার্কা, এই টাকায় পনেরো দিন খাটিয়ে নেয় তাকে আমেরিকান ট্যুরিস্টরা।

'না,' বলল রানা। 'তোমার অন্য কাজ আছে।'

'অন্য কাজ, বস্?'

শর্টস-এর পকেট থেকে ছোট একটা প্লাস্টিকের থলে বের করে জার্কার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'বল তো, কত দাম হবে এগুলোর?' তার দিকে পিছন ফিরে পাল তুলতে শুরু করল ও।

থলের মুখ খুলে হাতের তালুতে মুক্তোগুলো বের করল জার্কা। দেখল, গত পনেরো দিনে তোলা সবগুলো মুক্তোই রয়েছে ওর হাতে, শুধু দুটো বড় মুক্তো ও তাকে দান করা কয়েকটা মুক্তো বাদে। মনে মনে হিসাব কষছে জার্কা। পাল তুলে বোটটাকে বাতাসের দিকে ঘুরিয়ে নিল রানা।

'সতেরো থেকে উনিশ শো ডলার, বস্—নির্ভর করে কোথায় আপনি বিক্রি করবেন,' বলল জার্কা। মুক্তোগুলো থলেতে ভরে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

'ওই টাকাটা তোমার পুঁজি,' বলল রানা। 'যাও, বউ-বাচ্চাদের নিয়ে শহরে চলে যাও, দেখ কোন ব্যবসা করতে পারো কিনা।' প্রথম পক্ষের চারটে, দ্বিতীয় পক্ষের একটা, মোট পাঁচটা বাচ্চা জার্কার। বড় দুটোই মেয়ে, তাদের বিয়ে দিতে হবে। গত বছর আমেরিকান ট্যুরিস্টদের অন্তত তিনজন আভাসে ইঙ্গিতে প্রস্তাব দিয়েছে, মেয়ে দুটোকে শহরের হোটেলে নিয়ে গিয়ে তুলবে তারা, বিনিময়ে ভাল টাকা পাবে জার্কা। রাগে ও ঘৃণায় তাদের কাজ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে জার্কা। কিন্তু রানা জানে দারিদ্র্যের কষাঘাতে তার রাগ পানি হয়ে যেতে পারে।

রানার আচরণ স্রেফ পাগলামি বলে মনে হলো জার্কার, কাজেই বিশ্বাস করল না। গম্ভীর হলো সে, বলল, 'বস্, আপনিও দেখছি ওদেরই মত—গরীব মানুষের সঙ্গে কৌতুক করেন।' থলেটা রানার দিকে ছুঁড়ে দিল সে, রানা ধরতে না পারলে পানিতে পড়ে যেত।

জার্কার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, কিছু বলল না। বুঝতে পারল শুধু যে কৌতুক মনে করে রেগে গেছে জার্কা তা নয়, এটা দান হলেও হতে পারে এই সন্দেহ করে অপমান বোধ করছে সে।

রানার জায়গায় নিজে বসে বোটের হাল ধরল জার্কা। আরও দু'মাইল উত্তরে তার গ্রাম পালোটো। চারশো গজ বামে খয়েরি ও সবুজ একটা দ্বীপ। দ্বীপের একটা প্রান্ত কয়েকটা সরু ভাগে ভাগ হয়ে সাগরের ওপর অনেক দূর পর্যন্ত লম্বা হয়ে আছে। 'ওরা ওখানে গেছে,' বিড়বিড় করল জার্কা, হাতের পাইপটা তাক করল দ্বীপের দিকে। 'আমার মেয়ে দুটোর মতই বয়স হবে। তবে আরও সুন্দরী। ওরা বোধহয় আমেরিকান। বোটটাও ভারি সুন্দর।'

'আমেরিকান সুন্দরী?' হাসল রানা। 'ঠাট্টা করছ তুমি। ট্যুরিস্ট রুট থেকে অনেক দূরে রয়েছি আমরা।'

কাঁধ ঝাঁকাল জার্কা। তার মক্কেল ঠিক বলছে। তবে এ-ও সত্যি যে সাদা ও নীল একটা বোট দেখেছে সে, এক ঘণ্টা আগে তাকে পাশ কাটিয়ে এদিকে চলে এসেছে, রানা তখন পানির তলায় ছিল। মেয়ে দুটো তাকে উদ্দেশ করে হাত নেড়েছে। সঙ্গে কোন পুরুষ মানুষ ছিল না। এমন হতে পারে, ট্যুরিস্টদের মধ্যে যারা ভুল করে পানামা সিটি থেকে আইলা দেল রেই-তে চলে আসে, মেয়ে দুটো তাদেরই দলের। কিংবা হয়তো খুব বেশি সাহসী, আশপাশের দ্বীপগুলো দেখার লোভে একা একাই চলে এসেছে। 'দুটো মেয়ে,' আবার বলল সে। 'আমি দেখেছি।'

তাহলে সত্যি দেখেছে, ভাবল রানা। 'বোটে বসে ঝিমোচ্ছিলে, স্বপ্ন দেখেছ,' বলল ও। হাতের থলেটা বোটের ওপর রাখল। 'এসো, বাজি ধরি। দ্বীপটায় যদি কোন আমেরিকান সুন্দরী থাকে, ওগুলো তোমার। আর না থাকলে আমার সঙ্গে পুবদিকে যাবে তুমি, বিনা মজুরিতে পনেরো দিন কাজ করবে। রাজি?'

'আপনি, বস্, জেনেশুনে হারতে চাইছেন,' অভিযোগ করল জার্কা।

'শোন,' বলল রানা। 'এটাকে দান মনে কোরো না। আমি শুধু দুর্লভ মুক্তো খুঁজছি, পেয়েওছি দুটো, বাকিগুলো তুমি না নিলে অন্য কাউকে দিয়ে দিতে হবে।'

পায়ের কাছ থেকে আধ ভাঙা একটা ঝিনুক তুলে নেড়েচেড়ে দেখছে জার্কা, আঙুলের চাপ দিতেই ভেতর থেকে হড়কে বেরিয়ে এল বাদাম আকৃতির একটা মুক্তো।

'দেখি দেখি!' আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়াল রানা। হাতে নিয়ে পরীক্ষা করল জিনিসটা। মূল্যহীন হলেও, ফেলনা নয়। ঘষে বা চেঁছে একটা মুক্তোকে নিষ্কলঙ্ক করতে হলে চর্চা দরকার, দরকার একজন দক্ষ শিল্পীর হাত। কাজটা অত্যন্ত কঠিন, তবে সফল হলে একটা মুক্তোর দাম পাঁচগুণ বেড়ে যেতে পারে, ব্যর্থ হলে ওটার আর কোন মূল্যই থাকবে না। চীনা বাদাম আকৃতির এই মুক্তোটা হাত পাকাবার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। 'এটা আমাকে দেবে, জার্কা?' রানার গলায় আবেদন।

'দিতে পারি,' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল জার্কা। 'এক শর্তে। খোঁজ নিয়ে আপনাকে দেখতে হবে, মেয়ে দুটো এখানে কি করছে। ওরা যদি এদিকে বেশিক্ষণ থাকে, বিপদ ঘটতে কতক্ষণ!'

মুক্তোটা পকেটে রেখে দিল রানা। 'বেশ, এত করে যখন বলছ—তীরে ভেড়াও তরী।'

বোট ঘুরিয়ে নিয়ে দ্বীপের দিকে এগোল জার্কা, সৈকতে পৌঁছুবার আগেই বালিতে ঠেকে গেল খোল। বড় পালটা নামাচ্ছে, গুটিয়ে উঠল পুলিগুলো। পায়ে স্যান্ডেল গলাল রানা, তুলে নিল রাকস্যাকটা, হাঁটু সমান পানি দিয়ে হেঁটে উঠে এল দু'জন গরম হলুদ সৈকতে।

ওদের সামনে আধখানা চাঁদের আকৃতি তৈরি করেছে পামগাছগুলো। জমিন ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে, আরও সামনে একটা রিজ। রাকস্যাক থেকে

বিনকিউলারটা বের করল রানা। 'তুমি সংসারী মানুষ, জার্কা, একজোড়া আমেরিকান সুন্দরীর পিছু নেয়া উচিত হবে না। আমার জন্যে অপেক্ষা করো, কেমন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে পামগাছের তলায় বসল জার্কা, পাইপটা ধরাল। গাছপালার ভেতর দিয়ে এগোল রানা। ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে ঢাল বেয়ে।

এদিকের দ্বীপপুঞ্জে মাত্র পনেরো শো মানুষ বাস করে। জার্কাদের গ্রামে বাস করে বাষট্টিজন, তার ভাষ্য অনুসারে তাদের মধ্যে ষোলোজন সক্ষম যুবক, সবাই তারা অসহায় অবস্থায় পেলে ট্যুরিস্টদের টাকা-পয়সা কেড়ে নেয়। বাষট্টিজনের মধ্যে ষোলোজন, পনেরো শো জনের মধ্যে তাহলে কত? এতগুলো লোকের মধ্যে কারও চোখে যদি পুরুষ সঙ্গী ছাড়া দুটো মেয়ে পড়ে যায়, কি অবস্থা হবে তাদের?

নরম মাটি আর পাথরকে জায়গা ছেড়ে দিল বালি, এদিকটায় দোর্দণ্ড প্রতাপ সূর্যের নিচে বেঁচে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে ঝোপ ও গাছগুলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রিজ-এর মাথায় উঠে এল রানা। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে চোখে বিনকিউলার তুলল। ওর নিচে খাঁড়িটা নির্জন, খাঁ-খাঁ করছে; তবে জমিনের সরু ফালিগুলোর ওপর প্রকৃতির তৈরি রিজ-এর দূর প্রান্তটা নিচু, পরবর্তী সৈকতটা পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, সিকি মাইল দূরে। বালির গায়ে কি যেন একটা নড়ে উঠল বলে মনে হলো। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল ও, পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল শরীরটা, উত্তেজনায় টান পড়ল পেশীতে।

অসুস্থবোধ করল রানা। অসুস্থ ও অসহায়। চোখের সামনে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে।

শক্তিশালী বিনকিউলারে প্রতিটি খুঁটিনাটি পরিষ্কার ধরা পড়ল। দু'জন লোক, কেউ তারা স্থানীয় নয়। তাদের একজন একটা মেয়েকে ধরে আছে, মেয়েটার চুল মধু রঙা, পরনে সুইমস্যুট, তার হাত মুচড়ে পিঠের ওপর দিকে তোলা হয়েছে। বিশ গজ দূরে, পানির কিনারায়, অপর লোকটা হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে, সামনের দিকে ঝুঁকে। তার নিচে ফর্সা একজোড়া নগ্ন পা দুর্বলভাবে বালিতে লাথি মারছে। দ্বিতীয় মেয়েটার ওই পা দুটো ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না রানা, কারণ উপুড় হয়ে রয়েছে সে, লোকটা প্রায় উঠে বসেছে তার পিঠে, দু'হাত দিয়ে মেয়েটার মাথা চেপে ধরেছে নরম, ভিজে বালির ওপর।

দ্রুত শ্বাস টানল রানা, সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। হাতে রাইফেল থাকলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লোক দু'জনকে মারতে পারত ও। এমনকি পিস্তল থাকলেও ফাঁকা আওয়াজ করে ওদেরকে ভয় দেখাতে পারত। এখান থেকে সরাসরি সৈকতে পৌঁছুনো সম্ভব নয়, ঘোরা পথ ধরে যেতে হবে। সময় লাগবে দশ মিনিট। আর যদি খাঁড়িতে নেমে সাঁতরে যাবার চেষ্টা করে, আরও বেশি সময় লাগবে, কারণ খাঁড়ির ওপারে আরও একটা রিজ রয়েছে—প্রায় খাড়া।

দশ মিনিট…

লম্বা পা দুটো স্থির হয়ে গেল। লোকটাকে দাঁড়াতে দেখল রানা। মেয়েটা বালির ওপর পড়ে আছে, নড়ছে না। এখন তাকে আগের চেয়ে ভালভাবে দেখতে

পাচ্ছে। বিকিনি পরে আছে সে; বান্ধবীর চেয়ে তাঁর চুল অনেক বেশি ঘন ও কালো। মুহূর্তের জন্যে লোকটার মুখ দেখতে পেল রানা, সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল—চেহারাটা নয়, ধরনটা, গোটা দুনিয়া জুড়ে এরকম চেহারা কয়েকশো দেখেছে ও। একজন খুনীর চেহারা। ঠাণ্ডা, নিষ্প্রভ ও নীচ—একজন পেশাদার খুনী। লোকটা সম্ভবত ভাড়াটে, ধারণা করল রানা। এই টাইপের লোকেরা শত্রুতাবশত কাউকে খুন করে না, খুন করে শুধু টাকার বিনিময়ে। লোকটা পেশীবহুল নয়, তবে লম্বা-চওড়া। কালো, স্ল্যাকস আর সাদা শার্ট পরে আছে, হাফহাতা। মুখ আর বাহু পুড়ে গেছে রোদে। শোল্ডার হোলস্টারের অস্তিত্ব শার্টের বাইরে থেকেও পরিষ্কার টের পাওয়া গেল।

অসহায় রাগে এখনও কাঁপছে রানা, হাঁপিয়ে উঠেছে। দেখল বালুর ওপর দিয়ে মেয়েটাকে টেনে পানির দিকে নিয়ে যাচ্ছে লোকটা। মেয়েটার মাথা পানির নিচে চেপে ধরল সে।

তারমানে দুর্ঘটনা বলে চালানো হবে। ডুবে মারা গেছে। নীল ও সাদা বোটটা এক সময় পাওয়া যাবে, অল্প পানিতে নোঙর ফেলে আছে কোথাও। লাশটা যদি আদৌ পাওয়া যায়, ফুসফুসে থাকবে পানি, আঘাতের কোন চিহ্ন থাকবে না।

কিন্তু লোক দু'জন কারা? এল কোত্থেকে? কিভাবেই বা এল?

তাড়াতাড়ি বিনকিউলার ঘোরাল রানা। ঠাণ্ডা মাথায়, নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে খুন করা হচ্ছে মেয়েটাকে, দেখতে গিয়ে প্রথম মেয়েটার কথা মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়েছিল ও। ইচ্ছে হলো চিৎকার করে, ওদের কুকর্মের সাক্ষী আছে জানলে হয়তো মেয়েটাকে ছেড়ে পালাবে ওরা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। একটানা বাতাস লাগছে ওর মুখে, চিৎকার করলেও ওদের কানে তা পৌঁছুবে না।

প্রথম লোকটা এখনও ধরে আছে তাকে। ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটা। তাকেও কি খুন করবে ওরা? সেরকম ইচ্ছে থাকলে একজন একজন করে কেন? এ-সব প্রশ্ন না তুলে চেষ্টা করা উচিত ওদের কাছে পৌঁছুনোর।

বিনকিউলার নামিয়ে নেবে রানা, আকস্মিক একটা নড়াচড়া লক্ষ করে স্থির হয়ে গেল ও। মেয়েটা কিছু একটা করেছে, সম্ভবত পা ছুঁড়েছে পিছন দিকে। ভাগ্য ভাল, লোকটার শরীরের স্পর্শকাতর জায়গায় লেগেছে, তা না হলে তলপেটের নিচেটা দু'হাতে চেপে ধরে ওভাবে বসে পড়ত না।

মেয়েটা মুক্ত, ছুটছে সে। ধীরে ধীরে সিধে হলো লোকটা, ব্যথায় কুঁচকে আছে হিংস্র মুখ। তবু মেয়েটাকে ধাওয়া করল সে। সঙ্গীর মতই, সে-ও একটা শোল্ডার হোলস্টার পরে আছে। একই টাইপের চেহারা দু'জনের, নির্দয় পাষণ্ড।

মেয়েটার ওপর ফোকাস স্থির করল রানা।

'শাবাশ, ছুট লাগা···আরও জোরে।' নিজের অজান্তে, মরিয়া হয়ে, বিড়বিড় করে উঠল রানা। 'চলে আয় এদিকে!' মেয়েটার মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এখন। বয়স খুব কম, আঠারো কি উনিশ, ভয়ে ভাঁজ খেয়ে আছে মুখের চামড়া। দৌড়াবার প্রাণপণ চেষ্টায় সরু হয়ে আছে মুখ, যেন শিস দিচ্ছে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, ছোটার মধ্যে থাকলেও হাত দুটো নিজের সামনে পুরোপুরি লম্বা করে রেখেছে সে। একটু কোনাকুনিভাবে, সাগর থেকে দূরে সরে আসছে। তার সামনে

বালির বিস্তৃতি, তবে খানিকটা দূরে নিচু পাঁচিলের মত উঁচু হয়ে আছে পাথর। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে রানা। পাথরটার কাছে এসেও মেয়েটা তার ছোটার গতি কমাল না। রানা বুঝল, লাফ দিয়ে পেরিয়ে আসবে। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তেও লাফ দেয়ার কোন লক্ষণ তার মধ্যে দেখা গেল না। সে যেন পাথরের নিচু পাঁচিলটা দেখতেই পায়নি। পাঁচিলটা চওড়া, লাফ দিলে ওপরে উঠতে পারত, টপকাতে পারত না। টপকাতে হলে আরও একটা বা দুটো লাফ দেয়ার দরকার। পাঁচিলের অস্তিত্ব টের পেয়ে সেটাকে এড়াবার চেষ্টা করল মেয়েটা, কিন্তু এখন আর সম্ভব নয়। শরীরটা শুধু ঘুরল, পাঁচিলে পা লেগে পড়ে গেল সে।

মাত্র এক সেকেন্ড, তারপরই আবার সিধে হলো সে, ছুটতে শুরু করল।

'ইয়াল্লা!' আটকে রাখা দম ছাড়ল রানা, দু'চোখে অবিশ্বাস। মেয়েটা আবার ছুটছে বটে, কিন্তু দাঁড়াবার পর দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে সে, জানে না কোন দিকে যাচ্ছে। 'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল রানা। সরাসরি খুনীটার দিকে চলে মেয়েটা।

এবারও লোকটার উপস্থিতি একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে টের পেল না সে। আগের মতই হাত দুটো সামনে লম্বা করা।

লোকটা এখন আর ছুটছে না। স্থির দাঁড়িয়ে আছে সে, আলিঙ্গন করার জন্যে সামনে মেলে ধরেছে হাত দুটো। মাংসল প্রকাণ্ড মুখে নিঃশব্দ হাসি ফুটছে, পরিষ্কার দেখতে পেল রানা।

সরাসরি লোকটার বাহুর ভেতরে ঢুকে পড়ল মেয়েটা। ক্ষিপ্র প্রতিক্রিয়া হলো, শরীরটা মুচড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল বন্ধন থেকে, কিন্তু তার কাঁধ শক্ত করে ধরে ফেলল লোকটা। পরমুহূর্তে দু'জনেই পড়ে গেল বালির ওপর। হাত-পা ছুঁড়ে ধস্তাধস্তি করছে মেয়েটা, শরীরের ওপর থেকে লোকটাকে সরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে; ওদের দিকে ছুটে আসছে লোকটার সঙ্গী, চিৎকার করে কি যেন বলল সে। মেয়েটার ওপর থেকে হঠাৎ নেমে পড়ল প্রথম লোকটা, তারপর হাতের কিনারা দিয়ে প্রচণ্ড একটা কোপ মারল তার ঘাড়ের পাশে। স্থির হয়ে গেল শরীরটা।

'ইয়াল্লা, মেয়েটা অন্ধ!' ফিসফিস করল রানা। ঘামে ভিজে গেছে ওর হাতের তালু। ওরা যদি একেও খুন করতে চায়, ওর কিছু করার নেই। আর যদি...

দু'জনেই এখন মেয়েটার ওপর ঝুঁকে রয়েছে। তার হাত নিয়ে কি যেন করছে ওরা। উজ্জ্বল ধাতব কিছু চকচক করে উঠল, ধরা পড়ল রানার চোখে। সম্ভবত হাইপডারমিক। মনে মনে প্রার্থনা করল, তা-ই যেন হয়।

সিধে হলো লোক দু'জন। নিজেদের মধ্যে কি যেন আলাপ করল। তারপর একজন ঝুঁকে নিজের কাঁধে তুলে নিল মেয়েটাকে। ঘুরল ওরা, ফিরে যাচ্ছে। ফিরছে সৈকতের দিকে নয়, ঢালের দিকে। সৈকত থেকে বেরুতে হলে ওই ঢাল বেয়ে উঠে ওপারে যেতে হবে ওদেরকে।

বিনকিউলার নামিয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছল রানা। 'অন্ধ একটা মেয়ে!' কর্কশ শোনাল নিজের গলা। এরইমধ্যে ছুটতে শুরু করেছে ও। খাঁড়ির দিকে পিঠ, সামনে সামান্য উঁচু হয়ে উঠে গেছে পাথুরে জমিন। ছুটছে ও, জানে কি করতে হবে ওকে।

চিরতরুণ মাসুদ রানা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের

প্রতিনিধিত্ব করছে, জীবনানন্দ দাশ ও জসীমউদ্দিনের রোদনক্লিষ্ট বাংলা মায়ের এক দামাল সন্তান। বুক ভরা দেশপ্রেম আর গোটা অস্তিত্ব জুড়ে রোমাঞ্চের নেশা, তারই সংক্ষিপ্ত নাম এম. আর. নাইন। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম এজেন্ট রানা, এম. আর. নাইন ওর কোড নেম। দুনিয়ার যে-কোন দেশে, যে-কোন পরিবেশে নিজেকে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে ও। ছদ্মবেশ ধারণের সমস্ত কৌশল ওর জানা। সব ক'টা মহাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় থাকায় যে-কোন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অনায়াসে এক হয়ে মিশে যেতে পারে ও।

বর্তমানে বিসিআই-এর কোন দায়িত্ব নেই রানার কাঁধে, কারণ ছুটিতে রয়েছে ও। এবারের ছুটিতে ল্যাটিন আমেরিকায় এসেছে শুধু মুক্তো সংগ্রহ করার জন্যে। এ-ও এক ধরনের অ্যাডভেঞ্চার। তবে শিকারের কোন ইচ্ছে না থাকায় সঙ্গে করে রাইফেল আনেনি। আর সাধারণত ছুটিতে থাকার সময় সঙ্গে কোন পিস্তল বা রিভলভার রাখে না ও। এই মুহূর্তে অস্ত্র বলতে শুধু ছুরি রয়েছে ওর কাছে, সাগরের তলায় নামার সময় দরকার হতে পারে বলে সঙ্গে রেখেছে। ছুরিগুলো দীর্ঘদিনের পুরানো, বহুকাল ধরে ব্যবহার করছে।

ছুটছে রানা, ঠাণ্ডা মাথার ভেতর কাজ চলছে। সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করছে ও, রণকৌশল ঠিক করে রাখছে। খুনী দু'জন নিশ্চয়ই কোন বোট থেকে এসেছে। বোটটা নির্ঘাত বড় আকৃতিরই হবে, সেজন্যেই কম পানিতে ঢুকতে পারেনি সেটা। পাহাড়ী ঢালটা পায়ে হেঁটে পেরিয়ে এসেছে ওরা। সেই পথেই ফিরে যাচ্ছে, অজ্ঞান মেয়েটিকে নিয়ে।

ওদের বোটটা দেখতে চায় রানা। আরও জরুরী ব্যাপার হলো, পাহাড়ী ঢালের মাথায় ওদের আগে পৌঁছুতে হবে ওকে। ছোটার গতি ক্রমশ বাড়ছে ওর। গাছপালা ঢাকা ঢালের মাথায় উঠে এল, লোক দু'জনকে এখনও দেখতে পাচ্ছে না। ঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে এগোচ্ছে।

কিনারার কাছে পৌঁছুতেই বোটটা দেখতে পেল রানা। তীর থেকে দুশো গজ দূরে নোঙর ফেলেছে। চল্লিশ ফুট লম্বা, দুই এঞ্জিনের একটা ইয়ট, সেলুন ও ফ্লাই ব্রিজ উঁচু মঞ্চের ওপর। বোটের নিচে, পানিতে, নীল ও সাদা ডোরাকাটা শার্ট পরা এক লোককে দেখা গেল। বড় একটা ডিঙি নৌকোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ডিঙিটা বোটের গায়ের কাছে ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে। দেখে মনে হলো, তীরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। ডান দিকে চট করে একবার তাকিয়ে দেখে নিল রানা খুনী দু'জন ফিরছে কিনা। ঘন একটা ঝোপের ভেতর বসে পড়ল, আবার বিনকিউলার তুলল চোখে। ইয়টের ফোরডেকে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। একজনের কাপড়চোপড় ডিঙিতে দাঁড়ানো লোকটার মত, দাঁড়িয়ে আছে গ্যাংওয়েতে। বাকি দু'জনের দিকে ফোকাস ফেলল রানা। বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল সঙ্গে সঙ্গে।

দু'জনের একজন রোগা, মুখটা সরু। হাঁটার সময় প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে তার শরীর সামান্য ঝাঁকি খাচ্ছে, ঘন ঘন হাত ও মাথা নাড়ার মধ্যে ভাঁড়সুলভ একটা ভঙ্গি আছে। তাকে রানা চেনে। তবে ওর মনোযোগ কেড়ে নিল দ্বিতীয়

লোকটা, যে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন একটা মূর্তি, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তীরের দিকে।

মুখের রঙ প্রায় ধূসর, কান দুটো অসম্ভব খাড়া। এতটা দূর থেকে চোখের সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, তবে না দেখেও ওগুলোর বর্ণনা দিতে পারবে রানা। চোখের সাদা অংশটুকু কালচে হয়ে গেছে, তার ওপর লাল সরু দাগ পড়ছে অনেকগুলো। দু'বছর আগে লোকটার চুল ছিল রেশমের মত ঝলমলে ও কালো, এখন সব সাদা হয়ে গেছে। তার চুলের এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের জন্যে দায়ী রানা ও সোহানা।

কোন লোকের কাছ থেকে চুরি যাওয়া বিশ লাখ ডলারের হীরে কেড়ে নাও, তারপর তাকে তিনদিন ধরে ধাওয়া করো, বাজি ধরে বলা যায় তার চুল সাদা হয়ে যাবে। বিশেষ করে লোকটা যদি পেনিফিদার হয়, যার জীবনে ব্যর্থতা বলে কিছু নেই।

পেনিফিদার ও ক্রনেল।

চোখে বিনকিউলার তোলার পর পাঁচ সেকেন্ড পেরিয়েছে। ওটা নামিয়ে ধীরে ধীরে, সতর্কতার সঙ্গে পিছু হটতে শুরু করল ও, যতক্ষণ না জমিনের একটা ভাঁজের আড়ালে পড়ে গেল ইয়টটা। এখন ও জানে, খুনটা কার নির্দেশে হয়েছে। একটা মেয়েকে খুন, আরেকটাকে অপহরণ। এর মধ্যে আরও বড় কিছু আছে। কি হতে পারে, সেটা নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে। আপাতত ওর কর্তব্য পরিষ্কার। ওদের হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে অন্ধ মেয়েটাকে।

উত্তর দিকে এগোল রানা, সরু একটা পথ ঢালের ঠোঁটের দিকে এগিয়ে গেছে, যেদিক দিয়ে উঠে আসবে খুনী দু'জন। ভাল বা নিরেট কোন আড়াল নেই এদিকে। লোকগুলো ঢালের ঠিক যেখানটায় উঠে আসবে বলে ধারণা করল ও, তার বিশ গজ সামনে একটা গাছ রয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক নিচে নেমে এসেছে সূর্য, পথের ওপর লম্বা ছায়া পড়েছে গাছটার। খাপ থেকে ছুরি বের করে গাছের দিকে ফিরে দাঁড়াল রানা। অপেক্ষা করছে।

রানার অপেক্ষার মধ্যে কোন অস্থিরতা নেই। ওর মন খালি হয়ে আছে, স্থির হয়ে আছে শরীরটার মতই। নিস্পলক চোখের নড়া বাদে প্রাণের আর কোন লক্ষণ নেই। ওই গাছ, মাটি বা আশপাশের বাতাসের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই ওর; প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে।

এ হলো নিনজুৎসু-র একটা কৌশল, পুরোপুরি চোখের সামনে থেকেও প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে ধরা না পড়া। বলা হয় আগেকার দিনে নিনজায় সুদক্ষ গুরুরা নাকি কারও চোখে ধরা না পড়ে ভিড়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে পারতেন। ঢালের মাথায় উঠে দশ গজ না এগোনো পর্যন্ত খুনীরা যদি ওকে দেখতে না পায়, তাতেই সন্তুষ্ট রানা। লড়ার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে ও, কিন্তু লক্ষ রাখবে লোক দু'জন যাতে গুলি করতে না পারে। গুলি হলে ইয়ট থেকে শুনতে পাওয়া যাবে, তাহলে...

ঢালের মাথায় প্রথমে একজনকে দেখা গেল, যে লোকটা মেয়েটাকে ধরে রেখেছিল। সামান্য হাঁপাচ্ছে সে, ঘামে ভিজে গেছে মুখ। সাদা শার্ট ও কালো

স্ল্যাকস পরা অপর লোকটা কয়েক পা পিছনে রয়েছে। এ লোকটা আকারে বড়, কাঁধে অজ্ঞান মেয়েটা পড়ে থাকায় সামান্য ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। দাঁড়িয়ে পড়ল সে, বলল, 'আমাকে একটু বিশ্রাম দাও, বব।' গলাটা বেসুরো, কর্কশই বলা যায়।

ঠাণ্ডা, প্রায় নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা। একজনের কাঁধ থেকে আরেকজনের কাঁধে চলে গেল মেয়েটা। দু'জনেই জর্জ লরেন্স হোলস্টার পরে আছে, স্প্রিং ক্লিপ সহ। প্রতিটি হোলস্টারে একটা করে .৩৮ স্পেশাল বডিগার্ড, ফাইভ শট হ্যামারলেস রিভলভার।

এবার সামনে থাকল বড় আকৃতির লোকটা, বালিবহুল জমিনের ওপর ক্লান্ত, ভারি পা ফেলে হেঁটে আসছে। দু'বার রানাকে ছুঁয়ে গেল তার দৃষ্টি, কিন্তু দেখতে পেল না। রানার কাছ থেকে আট কদম দূরে যখন, হঠাৎ বোধোদয় ঘটল তার, চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, হাতটা উঠে গেল শোল্ডার হোলস্টারে।

রানার ছুরি ধরা হাতের কব্জি ঝাঁকি খেল। ভারি ছুরিটার পিছু ধাওয়া করল ও। ছুরির এগারো ইঞ্চি লম্বা ফলা নাভির ঠিক ছয় ইঞ্চি উপরে ঢুকল, ওপর দিকে মুখ করে থাকায় বিঁধে গেল হৃৎপিণ্ডে। হোলস্টারের স্প্রিঙ ক্লিপ থেকে রিভলভারটা বের করে এনেছে লোকটা, এই সময় মারা গেল সে। সৈকতে খুন হওয়া মেয়েটার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি।

লোকটা পড়ে যাচ্ছে, লাফ দিয়ে বাধাটা টপকাল রানা। দ্বিতীয় লোকটার দৃষ্টিতে ভোজবাজির মত উদয় হলো ও—বাদামী ও অর্ধনগ্ন একটা প্রাণী, চোখ দুটো চকচকে কালো। রানাকে মানুষ হিসেবে চিনতে পারলেও, বিশ্বাস করতে পারল না, বিস্ময়ের মাত্রা এতই প্রবল। দীর্ঘ একটা বাহু লম্বা হলো; লোহার চিমটের মত রানার বুড়ো আঙুল ও তর্জনী চেপে ধরল তার ওপরের ঠোঁট, নাকের ঠিক নিচে—সামনের দিকে ঝাঁকি দিতেই ব্যথায় কাতর একটা চিৎকার বেরিয়ে এল লোকটার গলা থেকে।

মাটিতে মুখ থুবড়ে, উপুড় হয়ে পড়ল লোকটা, তার গায়ের ওপর পড়ল মেয়েটা। মুখ থুবড়ে পড়ল বলেই রিভলভারের বাট ধরা তার হাতটা নিজের শরীরের নিচে চাপা পড়ে গেল।

লোকটার মাথার তেল-চকচকে চুল মুঠো করে ধরল রানা, কপালটা দ্বিতীয়বার সজোরে ঠুকে দিল মাটিতে, অপর হাত দিয়ে তার গা থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল মেয়েটাকে। পরমুহূর্তে ঝট করে উঁচু করল মাথা, একই সঙ্গে হাতের কিনারা দিয়ে কোপ মারল লোকটার ঘাড়ের পিছনে।

অস্পষ্ট হলেও, মট করে একটা শব্দ ঢুকল রানার কানে।

সিধে হলো ও, ছুরিটা উদ্ধার করার জন্যে ফিরে এল প্রথম লোকটার কাছে। বালিতে ঘষে ফলাটা পরিষ্কার করল ও, ঢুকিয়ে রাখল খাপের ভেতর। মেয়েটার কাছে ফিরে এসে অনায়াসে তাকে তুলে নিল দু'হাতে, ফিরতি পথ ধরে দ্রুত হাঁটা ধরল, ঢাল বেয়ে বাম দিকে নেমে যাচ্ছে— এ-পথে গেলেই জার্কার বোটের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছুনো যাবে।

সুষ্ঠুভাবে কাজ করছে রানার মাথা, সম্ভাবনাগুলো বিবেচনা করছে। কম করেও

বিশ মিনিট পর সঙ্গীদের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে পেনিফিদার, কি ঘটছে দেখার জন্যে তীরে কাউকে পাঠাবে সে। আরও পনেরো মিনিট পর আশপাশের পানিতে একটা বোট খুঁজতে বেরুবে তার ইয়ট। কোন বোট দেখলেই সেটাকে চ্যালেঞ্জ করবে ওরা, সার্চ করবে।

জার্কার বোট মান্ধাতা আমলের, এই সময়ের ভেতর সেটায় চড়ে পালানো সম্ভব নয়।

একমাত্র সমাধান হতে পারে গুহা। সাগর থেকে সরাসরি ওটার ভেতর ঢুকে পড়তে পারে ওরা। দ্বীপের উত্তর প্রান্তে ওটা, একটা বাঁকা বাহু আড়াল করে রেখেছে। শুধু আশপাশের দ্বীপবাসীরা চেনে, বাইরের কারও জানার কথা নয়। প্রবেশমুখটা যথেষ্ট চওড়া, পাল নামিয়ে নিলে অনায়াসে ভেতরে ঢোকা যাবে। ওখানে ওরা ঘণ্টা দুয়েক নিরাপদে লুকিয়ে থাকতে পারবে। আর সন্ধের পর ওদেরকে খুঁজে পাওয়া পেনিফিদারের পক্ষে সম্ভব হবে না।

ওর হাতে নেতিয়ে থাকা মেয়েটার দিকে তাকাল রানা। হালকা শরীর, সম্ভবত এক শো দশ পাউন্ড হবে। সরু হাড়ের ওপর ভরাট মাংস, হাতগুলো যথেষ্ট লম্বা। কাছ থেকে দেখায় বয়স সামান্য বাড়ল, বিশ কি একুশ হবে। মুখে কোন তিল বা দাগ নেই, নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলো যে-কোন মেয়ের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করবে। চেহারাটা সুন্দর, সন্দেহ নেই, তবে যতটা না সুন্দর তার চেয়ে বেশি মিষ্টি ও সরল। রানার মনে হলো, অসহায় একটা শিশুকে ধরে আছে ও। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ওর–লোভ নয়, গোপন কোন আকাঙ্ক্ষা নয়, রোমাঞ্চ বা পুলকও নয়, মেয়েটা যেন ওর ভেতর কোথাও একটা ছিপি খুলে দিয়েছে, বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে কোমল স্নেহ।

যা ঘটার ঘটে গেছে, কিন্তু মেয়েটা জানে না। জ্ঞান ফিরলে, অন্ধ চোখের পাতা খুললে, রানার মুখে শুনতে হবে তাকে, তার বান্ধবী বেঁচে নেই।

এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। বালিময় পথের ওপর, যেখানে একটা পাম গাছ দাঁড়িয়ে আছে, দু'জন লোককে দেখা গেল।

একটা লাশের পাশ থেকে সিধে হয়ে দাঁড়াল ক্রনেল ম্যাকার্থি, ভেজা হাতটা শার্টের কিনারায় মুছল। 'ববকে মারা হয়েছে ঘাড়ের হাড় ভেঙে,' বলল সে, সরে এসে দ্বিতীয় লাশটার পাশে বসল।

ট্রাউজারের পকেটে হাত গলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টমাস পেনিফিদার, চেহারা দেখে মনে হতে পারে সাংঘাতিক একঘেয়েমিতে ভুগছে সে। 'মারা হয়েছে ঘাড় মটকে,' বিড়বিড় করল, জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা দিল দ্বিতীয় লাশটার পাঁজরে। 'আর এটাকে মারা হয়েছে ছুরি দিয়ে?'

'হ্যাঁ, বোঝাই তো যাচ্ছে, বস্।'

'কি ধরনের ছুরি?'

'বড় কোন ছুরি।' ক্ষতটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল ক্রনেল। 'এত বড় গর্ত পেন্সিল দিয়ে সম্ভব নয়।' নিজের চারপাশে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল সে, হাড়সর্বস্ব মুখে সরু হয়ে উঠল চোখ দুটো। 'আমার ধারণা, ছুরিটা ছোঁড়া হয়েছিল। অচেনা

কাউকে কাছাকাছি হেঁটে আসতে দিয়ে ভুল করেছে ফারগুসন। ভুল করলে তার মাসুল তো দিতেই হবে।'

নিষ্প্রাণ চোখ মেলে পশ্চিম দিকে তাকাল পেনিফিদার, অস্তগামী সূর্য সাগরটাকে লাল টকটকে ইস্পাতের বিশাল একটা চাদরে পরিণত করেছে। 'রানা?' প্রায় কোমল শোনাল তার গলা, প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করল সে।

'রানা? মাসুদ রানা?' ক্রনেলের ভুরু জোড়া আরও একটু কোঁচকাল। 'এখানে কোত্থেকে আসবে সে? বস্, আপনার কি···!'

কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল পেনিফিদার। গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি যেন ভাবছে সে, চেয়ে আছে কিন্তু কিছু দেখছে বলে মনে হল না।

'কেন, এ-কথা আপনার মনে হচ্ছে কেন, বস্?' আবার জিজ্ঞেস করল ক্রনেল।

'তার ছুরি খেয়ে মারা গেছে, এমন লোক আমি দেখেছি,' বিড়বিড় করছে পেনিফিদার, যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে।

'কিন্তু বস্, আপনার মত আমিও জানি রানা ছোট ছুরি ব্যবহার করে,' বলল ক্রনেল। 'এটার তুলনায় সেগুলো আলপিন।'

'রানা,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল পেনিফিদার, এখন আর ক্ষীণ সন্দেহটুকুও নেই। 'কেন বা কিভাবে, তা বলতে পারব না,' দৃষ্টিতে প্রাণ ফিরে এল। 'তবে রানা যে এখানে ছিল, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু···।'

'কোন কিন্তু নেই। এরকম যে ঘটবে, আমি জানতাম। তোমাকে বলিনি, তাকে আমি অনুভব করতে পারি? গত বছর আমি আমস্টারডামে ছিলাম, মনে হলো আশপাশে কোথাও আছে সে। কি, মনে পড়ে? তোমাকে বললামও কথাটা, আর তার দু'ঘণ্টা পরই তাকে আমরা দেখতে পেলাম—রেলস্টেশন থেকে মেয়েটার হাত ধরে বেরিয়ে আসছে। সেবার আমার কাছে অস্ত্র ছিল না, তাই লাগাতে চেষ্টা করিনি। আরও দু'বার আমার অনুভূতি সাবধান করে দিয়েছে আমাকে। দু'বারই জরুরী কাজে ছিলাম, পিছু নিতে পারিনি। কিন্তু আমি জানি, ওর নিয়তিই ওকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। এবারই বোধহয় শেষ বার। অর্থাৎ এবার আমার প্রতিশোধ নেয়ার পালা।'

'কিন্তু একা শুধু রানা নয়, বস্, ওর বান্ধবীও আপনার অনেক ক্ষতি করেছিল,' মনে করিয়ে দিল ক্রনেল। রানা ও সোহানা প্রসঙ্গে আলোচনা করা বসের একটা বাতিকে পরিণত হয়েছে, জানে সে। বসের জীবনে ওরা দু'জন একটা অভিশাপ। দু'বছর আগে বিশ লাখ ডলার দামের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল ওরা। বসের এই বাতিকটা নিয়ে ক্রনেল খানিকটা চিন্তিতও বটে। দু'বছর আগে সেই দিনটির পর থেকে বসের মধ্যে কিসের যেন একটা অভাব লক্ষ্য করছে সে। প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও ঠাণ্ডা মাথায় হিসাব কষার গুণ অটুটই আছে, তবে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসে সামান্য হলেও ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ক্রনেল অনেক বছর ধরে পেনিফিদারের সঙ্গে আছে, তার ধারণা বস্ একা মাসুদ রানার সঙ্গে এখন আর পেরে উঠবেন না। গত এক ঘণ্টায় যা ঘটেছে, সেজন্যে মনে মনে খুশিই হলো

ক্রনেল। এই দ্বীপে এমন কেউ আছে যার সঙ্গে পাল্লা দেয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। 'আমাদের এই ক্ষতি দৈত্যটা পছন্দ করবে না, বস্,' আসলে ঠিক উল্টোটা বোঝাতে চাইল সে।

'সে হাসবে,' আক্রোশে হিসহিস করে উঠল পেনিফিদার।

দৈত্যটা হাসবে, কোন সন্দেহ নেই; জানে ক্রনেল। মনে মনে স্বস্তিবোধ করল সে। পেনিফিদারের পরাজয় উপভোগ করবে দৈত্য, দলের পরাজয় তার কাছে তেমন গুরুত্ব পাবে না। হাসবে সে, মেয়েটাকে আটক করার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেবে। তবে পেনিফিদার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, এ-কথা এখনও বলা যায় না। 'সে কি লন্ডনে, বস্?' জানতে চাইল ক্রনেল।

'তাই তো থাকার কথা। ড. জিমসনকে সরাতে হবে না?'

'ও, হ্যাঁ, শ্রদ্ধেয় ড. জিমসনকে ইহলোক থেকে ছুটি দিতে হবে,' বলে হাসল ক্রনেল। 'যাক, অন্তত কয়েকটা দিন দৈত্যটা আমাদেরকে বিরক্ত করতে পারবে না। আর মেয়েটাকে যে বা যারাই কেড়ে নিয়ে যাক, এখনও খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি।' কপালে হাত রেখে সাগরের দিকে তাকাল সে, একজোড়া জেলে নৌকা ধীরগতিতে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে।

মাথা ঝাঁকাল পেনিফিদার। 'সন্ধের আগ পর্যন্ত খুঁজব আমরা। তারপর ফিরে যাব পানামায়। ভাড়াটে যত লোক পাওয়া যায়, সবাইকে ডাকবে তুমি। রেডিওতে এখনই খবর পাঠাও শহরে। এয়ারপোর্ট ও হাইওয়েতে পাহারা বসাও। শহর আর বন্দরগুলোয় স্থানীয় লোকদের কাজে লাগাও। সবাইকে জানিয়ে দাও কি রকম দেখতে সে।'

'সে? মাসুদ রানা? বস্, ব্যাপারটা স্রেফ আপনার অনুমান!'

চোখ নামিয়ে লাশটার দিকে তাকাল পেনিফিদার, চেহারায় কোন ভাব ফুটল না, সজোরে লাথি মারল লাশের গায়ে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল সে। 'হ্যাঁ, অনুমানই। কিন্তু ওর ব্যাপারে আমার অনুমান কখনও মিথ্যে হয় না।'

দুই

আকস্মিক দ্রুতগতিতে পরপর কয়েকবার পরস্পরকে আঘাত করল লম্বা ফলা দুটো।

'না-না-না!' মাথা নেড়ে, চিৎকার করে, পিছিয়ে এলেন প্রফেসর মালটেজ্জি নিওয়েডা, তীক্ষ্ণাগ্র অসি নিচু করে ছাদের অ্যাসফল্ট মেঝের দিকে তাক করলেন। 'আপনাকে আগেও আমি বলেছি, সিনোরিনা—আক্রমণটা নিচের দিকে হলে তলোয়ারটাকে ঢেকে ফেলার চেষ্টা করবেন না, বিশেষ করে আপনার প্রতিপক্ষ যদি দক্ষ ফেনসার হন। ষাট দাগে বা তার ওপরে আক্রমণ হলে, অবশ্যই ঠেকাবেন। পঁচিশ বা তার নিচের রেখায় হামলা করা হলেও প্রতিপক্ষের ফলাকে ঠেকানো কঠিন। কিন্তু আরও নিচে হলে যদি ঠেকাবার চেষ্টা করেন, সেটা হবে

স্রেফ নির্বুদ্ধিতা!' রেগে গিয়ে কখনও ফ্রেঞ্চ কখনও স্প্যানিশ ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন ভদ্রলোক।

'কিন্তু কাজ তো হলো,' মাস্কের পিছন থেকে মৃদু কণ্ঠে বলল সোহানা। 'ঠেকিয়ে তো দিলাম।'

'ঠেকিয়ে দিলেন! ঠেকিয়ে দিলেন?' ফেনসিং মাস্টারের গলা চড়ল আরও, এক ঝটকায় মুখের মাস্ক সরিয়ে ফেললেন তিনি। 'আমি আপনাকে এখানে শেখাতে এসেছি, তাই নয় কি? আপনার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে এসেছি কি, সিনোরিনা? তরবারি চালনার শিল্প শিখতে চান আপনি, ঠিক? ট্যাকটিকস, ম্যানিপুলেশন, স্টাইল, আর্ট—এসবই আপনাকে শেখাতে হবে। কাজেই, শিখতে হলে সঠিক পদ্ধতিতে শিখতে হবে আপনাকে, সিনোরিনা!'

'দুঃখিত,' ম্লান গলায় বলল সোহানা। 'ভুলে গিয়েছিলাম।'

কটমট করে তাকালেন প্রফেসর মালটেজি নিগুয়েডা, টেনে নামালেন মাস্কটা, নির্দেশ দিলেন, 'এনগেজ!'

তরবারির ফলা দুটো এক হলো।

পেন্টহাউস-এর ছাদে, একটা বেতের চেয়ারে বসে রয়েছেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চীফ মারভিন লংফেলো। সাদা কাপড়ে মোড়া মূর্তি দুটোর দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে আছেন তিনি। তাঁর অফিস হোয়াইট হলে, সোহানার এই পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্ট তাঁর যাবার পথেই পড়ে, সুযোগ পেলেই একবার দেখা করে যান ওর সঙ্গে। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম এজেন্ট সোহানা চৌধুরীকে বয়সের কারণে তিনি যেমন স্নেহ করেন, তেমনি ওর যোগ্যতার কারণে সমীহও করেন। বিএসএস যখন অসংখ্য দু'মুখো সাপের ছোবল খেয়ে ধসে পড়তে যাচ্ছিল, বিসিআই তখন অনুরোধে সাড়া দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়—ধার হিসেবে পাঠানো হয়েছিল প্রথমে মাসুদ রানাকে, পরে সোহানা চৌধুরীকে। এখনও ওরা দু'জন বিএসএস-এর উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সেই সূত্রেই রানা ও সোহানাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ হয়েছে মারফিন লংফেলোর। ওদের দু'জনের দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়েছে বিএসএস, সেজন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কখনও কুণ্ঠিত হন না তিনি। তবে সম্পর্কটা শুধুই অফিশিয়াল বা আনুষ্ঠানিক নয়, ব্যক্তিগতভাবে ওদের দু'জনকে তিনি ভারি পছন্দ করেন, রীতিমত সামাজিক একটা সম্পর্কও গড়ে তুলেছেন।

বিরাট ধনী পিতার একমাত্র কন্যা সোহানা, ইংল্যান্ডে ওর বহু সয়-সম্পত্তি আছে। রানার মত ওরও আছে ব্রিটিশ পাসপোর্ট।

বিএসএস-এর উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করলেও, বিসিআই-এর দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে হয় রানা ও সোহানাকে। তবে এবার রানার মত সোহানাও ছুটিতে রয়েছে। কাজ নিয়ে রাশিয়ায় ছিল সোহানা, ছুটি পাবার পর ওখান থেকে আশরাফ চৌধুরীকে নিয়ে চলে এসেছে ইংল্যান্ডে। আশরাফ চৌধুরী ওর মামাতো ভাই, বয়েসে সোহানার চেয়ে দু'চার বছরের বড় হলেও সম্পর্কটা বন্ধুর মত। আশরাফ চৌধুরী মস্কোয় একটা ইউনিভার্সিটিতে অঙ্কশাস্ত্র পড়ায়। শুধু যে অঙ্কেই তার আগ্রহ তা নয়, বিভিন্ন শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য তার। 'পণ্ডিতপ্রবর ভীতুর ডিম,'

বলে তাকে খেপায় সোহানা। অভিযোগটা সত্যি বলেই এতদিন মুখ বুজে মেনে নিয়েছে আশরাফ চৌধুরী। কিন্তু এবার ইউনিভার্সিটি থেকে পাওনা ছুটি পেয়ে সোহানার খোঁচার জবাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে সে, বড় কোন বিপদে ফেলে পরীক্ষা করো আমাকে, দেখা যাক সত্যি আমি ভীতু কিনা। খুশি মনেই মস্কো থেকে তাকে লন্ডনে নিয়ে এসেছে সোহানা, যদিও ছুটির মধ্যে বিপদে জড়িয়ে পড়ার কোন ইচ্ছে ওর নেই, আর নিরীহ গোবেচারা মামাতো ভাইটিকে বিপদে ফেলার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার পিছনে গোপন একটা ইচ্ছে আছে ওর। বছর কয়েক আগে প্রেমে বিফল হওয়ার পর মেয়েদের দিক থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আশরাফ, প্রতিজ্ঞা করেছে 'নারী জাতীয় গোটা প্রাণীকুলকে' সযত্নে এড়িয়ে চলবে সে। সোহানার জেদ, তার এই ধনুর্ভঙ্গ পণ ভাঙতেই হবে। লন্ডনে ওর যত বান্ধবী আছে তাদের সবার সঙ্গে আশরাফের পরিচয় করিয়ে দেবে ও, তারপর দেখবে কিভাবে ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে সে। ইতিমধ্যে কয়েকটা পার্টিতে তাকে নিয়েও গেছে সোহানা, ওর বান্ধবীদের সঙ্গে পরিচিত হতে আপত্তি করেনি আশরাফ। এটাকে সুলক্ষণ বলেই ধরে নিয়েছে ও।

ফেং, সোহানার প্রৌঢ় বাটলার, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ছাদে, তার পিছু পিছু এল একহারা গড়নের এক বাঙালী তরুণ—মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল, চোখে ভারী ফ্রেমের চশমা, ক্ষীণ হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটের কোণে, কি কারণে যেন সারাক্ষণ লজ্জা পাচ্ছে।

'শুনলাম আপনি নাকি আমেরিকায় পালাবার কথা ভাবছেন?' তরুণের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন মারফিন লংফেলো, ইঙ্গিতে বেতের একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। আশরাফ চৌধুরীর সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে তাঁর।

'আমি ছুটিতে লন্ডনে এসেছি শুনে ডিউক ইউনিভার্সিটির হেড অব দ্য স্ট্যাটিসটিক্স একটা প্রস্তাব দিয়েছেন,' ঠোঁটের লাজুক হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে। 'সাতদিনে সাতটা লেকচার দিতে হবে। কিন্তু সোহানা মানা করায় ওদেরকে আমি বলে দিয়েছি সময় করতে পারলে আগামী বছর যাব।'

ওদেরকে কফি পরিবেশন করল ফেং।

আশরাফ চৌধুরীর শখ হলো অতীন্দ্রিয় বিষয় নিয়ে গবেষণা। এসব তার পোষায়, কারণ বছর কয়েক আগে তার লেখা একটা অঙ্কের বই যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্কুলে পাঠ্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় প্রতি বছর রয়্যালিটি বাবদ প্রচুর টাকা পায় সে।

যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত পদশব্দ উঠল, তারপরই শোনা গেল ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষ। 'না!' ক্ষোভে ফেটে পড়লেন প্রফেসর মালটেজি নিগুয়েডা। 'কোথায় আপনার ইন্টেলিজেন্স, সিনোরিনা? নাকি আপনাকে আমি সাধারণ মেয়ে বলে ধরে নেব? আপনাকে আমি স্টপ-হিট করার সুযোগ দিয়েছি, ঠিক? আই মেক আ ওয়ান-টু উইথ আ স্টেপ ফরওয়ার্ড অন দ্য ফার্স্ট ফেইনট, দেন ডিজএনগেজড টু লাঞ্জ। বাট ডু ইউ মেক দ্য স্টপ-হিট? নো! ইউ ডিফেন্ড উইথ আ সিম্পল প্যারি। দেখা যাচ্ছে এখানে স্রেফ সময়ের অপচয় করছি আমি,' শেষ কথাটা বললেন

স্প্যানিশ ভাষায়।

'আপনার লাঞ্জ আমাকে ছুঁতে পারত,' আত্মপক্ষ সমর্থন করল সোহানা।

'আপনার আঘাতটা আসবে আগে,' চিৎকার করছেন প্রফেসর নিগুয়েডা। 'হোয়াট ডাজ ইট ম্যাটার ইফ মাই ওউন হিট ফলোজ?'

'ইট উড ম্যাটার···,' থেমে গেল সোহানা। এক মুহূর্তের জন্যে মাস্ক খুলে ঝলমলে হাসি উপহার দিল ও, ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল, 'আসুন, আবার শুরু করি।'

খানিক নরম হলেন প্রফেসর নিগুয়েডা। 'আমাকে বলা হয়েছে ফেনসিঙে আপনি মাসুদ রানার কাছে হাতেখড়ি নিয়েছেন। শুনে ভাবলাম, আমাকে তাহলে বেশি খাটতে হবে না। কারণ তাকে আমি শিখিয়েছি, জানি সে কেমন শেখাবে। কিন্তু আপনাকে দেখে···,' তিনিও মাঝপথে থামলেন, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, আবার।'

তরবারির ফলা এক হল, সেই সঙ্গে মুচকি হাসি ফুটল মারভিন লংফেলোর ঠোঁটে। আশরাফ বলল, 'অবাকই লাগছে আমার। ভেবেছিলাম খুব ভাল ফেনসিং জানে সোহানা।'

'প্রফেসর নিগুয়েডার আলোচনা শুনে বিভ্রান্ত হবেন না,' বললেন মারভিন লংফেলো, হাসছেন তিনি। 'তাঁর রাগের কারণ হলো, অত্যধিক ঝুঁকি নিচ্ছেন মিস সোহানা। দেখছেন না, ট্রেনিঙের সময়ও ফয়েল নয়, আসল ইস্পাতের সোর্ড ব্যবহার করেছেন উনি। ঝুঁকি নেয়াটা ওঁর স্বভাবের একটা বৈশিষ্ট্য। মুশকিল হলো, শেখাতে এসে বারবার বিপদের মুখে পড়ে যাচ্ছেন ভদ্রলোক।'

'সত্যি নাকি, রানার কাছ থেকে হাতেখড়ি নিয়েছে সোহানা?'

মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। 'ওঁর কাছ থেকেই তো শিখেছেন সোহানা, নিয়মের কথা ভুলে গিয়ে সুযোগ পেলেই আঘাত হানো। তবে মি. রানার বৈশিষ্ট্য হলো, ইচ্ছে করলে নিয়মের বাইরে না গিয়েও লড়তে পারেন। কিন্তু সোহানা অধৈর্য, নিয়ম ধরে শিখতে হলে খাটতে হবে তাঁকে।'

'আঙুল! আঙুল! আপনি আঙুল ব্যবহার করবেন, সিনোরিনা!' আবার বিস্ফোরিত হলেন প্রফেসর নিগুয়েডা। 'কবজি দিয়ে ব্লেড চালাবে একটা বোকা! আপনার হাতে ওটা তরবারি, সিনোরিনা, টেনিস ব্যাট নয়!'

'র‍্যাকেট,' পরামর্শ দেয়ার সুরে বলল সোহানা।

'আই বেগ ইওর পার্ডন, ওটা টেনিস র‍্যাকেট নয়। কাজেই ওটাকে আপনি আঙুল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করুন। নিন, আবার শুরু করুন, প্লীজ।'

'আপনি, মি. লংফেলো?' জিজ্ঞেস করল আশরাফ। 'খেলাটা জানেন? ওদের সঙ্গে কখনও খেলেছেন?'

'খেলাটা জানি, তবে যুদ্ধটা জানি না,' মৃদু হেসে বললেন বিএসএস চীফ। 'তবে আজকাল আর খেলি না, বয়স বেড়ে গেলে ক্ষিপ্রতা কমে যায়। হ্যাঁ, মি. রানার সঙ্গে খেলেছি বটে, বেশ কয়েকবারই খেলেছি। ওর কোঅর্ডিনেশন অত্যন্ত ভাল। ফেনসিং-এর আসল কথা হলো, সেন্স অব পয়েন্ট···।'

'মানে?'

'প্রতিপক্ষ আর তার ব্লেডের কাছ থেকে কতদূরে, কোথায়, কি অবস্থায় রয়েছে আপনার পয়েন্ট, এটা সঠিকভাবে জানতে হবে আপনাকে, শুধু অনুভবের দ্বারা। কাজটা সহজ নয়। চোখ বুজে চেষ্টা করে দেখুন, দেখবেন এক ফুট ভুল জায়গায় আন্দাজ করছেন আপনি। এ-ব্যাপারে মি. রানার সেন্স দারুণ।'

'আপনার কথাই বিশ্বাস করলাম। ফেনসিং সম্পর্কে রানার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলুন, প্লীজ।' মুচকি হাসি ফুটল আশরাফ চৌধুরীর ঠোঁটে, জানে রানার প্রশংসা করতে পছন্দ করেন মারভিন লংফেলো। 'যদি কখনও ওর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় আমাকে, কাজে লাগবে।'

হেসে ফেললেন বিএসএস চীফ। 'রানার কোন অভ্যেস বা ঝোঁক নেই। এনগেজমেন্ট, থার্স্ট, প্যারি–কোন ব্যাপারেই নির্দিষ্ট কোন ভঙ্গি বিশেষভাবে প্রিয় নয় ওর। কখন কি করতে যাচ্ছে, আন্দাজ করা কঠিন। ওহ্ মাই গড!' মুখে একটা হাত তুললেন মারভিন লংফেলো, চেহারাটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছেন। এইমাত্র একটা পর্ব শেষ হলো। এক মুহূর্তের জন্যে প্রফেসর নিগুয়েডা ও সোহানা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর ফেনসিং মাস্টার ঘুরলেন, পিস্ট-এর কাছে দাঁড়ানো টেবিলের কাছে হেঁটে এলেন, নামিয়ে রাখলেন তরবারি ও মাস্ক।

সোহানা বলল, 'আমি দুঃখিত।'

প্রফেসর নিগুয়েডা ওর দিকে তাকালেনই না।

'কি ঘটল বলুন তো?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল আশরাফ।

'ছুটে এসে আক্রমণ করেছিলেন প্রফেসর,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'প্রথমে পিছু হটার কথা সোহানার, কিন্তু তিনি তা না করে প্রথমে ঠেকান। এরপর ওঁর নিচের দিকে আক্রমণ করেন প্রফেসর। তবু পিছু হটেননি আপনার বোন। এবার শুধু ঠেকাননি, নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে পাল্টা আঘাত করেছেন। নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে, তবে কাজ হয়েছে।'

ওদের দিকে হেঁটে এল সোহানা, তরবারিটা ডান হাতে, মাস্কটা ওই একই দিকের বগলের তলায়। ওকে আসতে দেখে দু'জনেই উঠে দাঁড়াল।

'ওস্তাদ বোধহয় খেপে গেছেন,' বললেন মারভিন লংফেলো।

ঠোঁট ওল্টাল সোহানা। 'প্রথমে আমি আক্রমণ করেছিলাম, সেটা ব্যর্থ হওয়ায় আমাকে পিছু হটতেই হবে, এর কোন মানে আছে?' আশরাফের দিকে তাকাল সে। 'কফি খেয়েছ, আশরাফ?'

মাথা ঝাঁকাল আশরাফ। 'তোমার মুখ ঘামে ভিজে গেছে। লেডিজ আর ওনলি সাপোজড টু গ্লো।'

'ফেনসিং জ্যাকেট আর একজোড়া ব্রেস্ট প্রোটেক্টর পরে কিছুক্ষণ লাফাও, দেখো কি হয়।'

'ব্রেস্ট প্রোটেক্টর?' আশরাফের চোখে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি। 'আচ্ছা! তবে, না, চ্যালেঞ্জটা আমি গ্রহণ করব না–ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে···।'

প্রফেসর নিগুয়েডাকে এগিয়ে আসতে দেখে থেমে গেল সে।

নিজের মাস্ক ও তরবারি নিয়ে আসছেন প্রফেসর, চোখ গরম করে তাকিয়ে আছেন সোহানার দিকে।

গলা সামান্য একটু চড়িয়ে মারভিন লংফেলো সোহানাকে বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই, প্রফেসর ডেবরানকে খবর দিলেই হবে। আরও ভাল হয় যদি প্রফেসর হেমারকে ডাকি। দু'জনেই ওরা খুব নাম করেছেন...।'

'হেমার? ডেবরান?' অবিশ্বাসে প্রায় চমকে উঠলেন প্রফেসর নিগুয়েডা। মারভিন লংফেলোর দিকে কটমট করে তাকালেন তিনি, তারপর ফিরলেন সোহানার দিকে। হঠাৎ করে তাঁর সরু, অভিজাত চেহারায় বিষণ্ন হাসি ফুটল। বাম হাতটা সোহানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি, একটা বাউট শেষ হলে সেটাই নিয়ম। 'আমার ডিসকার্টেসি ক্ষমা করবেন, সিনোরিনা–তবে, সত্যি আপনি বিপদকে মোটেও ভয় পান না।'

'আমি জানি। আগামী হপ্তায় ভয় পাবার চেষ্টা করব।' উষ্ণ হাসি দেখা গেল সোহানার সুন্দর মুখে। 'আপনি আসছেন তো?'

'না এসে উপায় নেই।' মারভিন লংফেলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রফেসর নিগুয়েডা। 'হপ্তায় মাত্র এক ঘণ্টা, এতে কাজ হবে না, সিনোর।' সোহানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'নিজেকে আপনি প্রতিদিন তিন ঘণ্টার জন্যে আমার হাতে ছেড়ে দিন, ছ'মাসের মধ্যে আপনাকে আমি এমন একজন ফেনসারে পরিণত করব, আপনার তুলনায় হোমারকে মনে হবে...মনে হবে কাঠুরে।'

প্রফেসর নিগুয়েডা চলে যাবার পর মারভিন লংফেলোর উদ্দেশে হাসল সোহানা। 'ধন্যবাদ। আপনার কৌশলে কাজ হয়েছে।'

'আমি এক প্রাচীন কৌশলী,' বলে হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন বিএসএস চীফ। 'এবার আমাকে ওই গুণটা চর্চা করতে যেতে হয়।'

'ডেস্কের কাজ পাঁচ মিনিট পড়ে থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। বসুন দেখি, আরেক কাপ কফি খান।'

'একান্তই যদি না ছাড়েন, আধ কাপ,' বলে আগের চেয়ারটায় বসে পড়লেন মারভিন লংফেলো। আশরাফও বসল, তার পাশের চেয়ারে বসল সোহানা। 'ভাল কথা, বৃহস্পতিবারে আমার সঙ্গে ডিনার খাওয়া সম্ভব কিনা?' এক মুহূর্ত থেমে আশরাফের দিকে তাকালেন তিনি। 'প্রশ্নটা আপনাকেও করছি, আপনি যদি লন্ডনে থাকেন।'

অমায়িক হেসে আশরাফ বলল, 'ইতিমধ্যে আপনি জেনে ফেলেছেন, আমাকে ফেলে কোথাও যাবে না সোহানা।'

'ডিনারের আমন্ত্রণ কখনও প্রত্যাখ্যান করতে নেই,' হেসে উঠে বলল সোহানা। 'কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো? হঠাৎ ডিনারের আমন্ত্রণ–স্রেফ সামাজিকতা, নাকি আপনার অপ্রীতিকর কোন সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পর্ক আছে?'

'সামাজিকতাই বলা যায়, গত হপ্তায় আপনি আমাকে ডিনার খাইয়েছেন,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'না, অপ্রীতিকর কোন কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তবে ডিনারের পর আমার এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। ড. জিমসন, ড. প্যাকার্ড জিমসন, আমার ব্যক্তিগত বন্ধু।'

'জিমসন...ড. জিমসন...,' এক মুহূর্ত চিন্তা করল সোহানা। 'ও, হ্যাঁ, হিস্টোরিয়ান। ইন সালাহ্‌তে যে রোমান প্যাপিরাস পাওয়া গেছে তার অর্থ উদ্ধার

করেছেন ভদ্রলোক

ড. জিমসনের সঙ্গে পরিচয় নেই, তবে আশরাফও তাঁর নাম শুনেছে। তাঁর কৃতিত্বের খবরটা কাগজে পড়েছে সে। রোমান আমলের কিছু প্যাপিরাস পাবার পর বহু চেষ্টা করেও লেখাটার কোন অর্থ উদ্ধার করা যাচ্ছিল না। অবশেষে ড. জিমসন সফল হয়েছেন। প্যাপিরাসে পাওয়া সূত্র ধরে খোঁজার পর মাটির তলায় পাওয়া গেছে গোটা একটা শহর। কোথায় যেন জায়গাটা···।

'টাডেমাইট মালভূমিতে,' সোহানাকে বললেন মারভিন লংফেলো। 'ওখানে খোঁড়াখুঁড়ি চলছে, ইচ্ছে করলে আপনি একবার বেড়িয়েও আসতে পারেন। যদি যান, ছুটির সময়টা ভালই কাটাতে পারবেন। খুব ছোট একটা আর্কিওলজিক্যাল টীম কাজ করছে ওখানে, প্রফেসর হোয়াইটস্টোন-এর অধীনে। কথাটা তুললাম এই জন্যে যে আপনি যদি যান, বৃহস্পতিবারের আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ, ড. জিমসনকে বললে তিনি আপনার যাবার সব ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।'

'বলছেন, এটা কোন কাজ নয়?' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল সোহানা।

'নয়,' বললেন মারভিন লংফেলো, ভাবলেশহীন চেহারা। 'কাজ একটা আছে বটে, তবে সেজন্যে মি. মাসুদ রানাকে দরকার হবে আমার। বলতে পারেন, এই মুহূর্তে কোথায় ছুটি কাটাচ্ছেন তিনি?'

'ছুটির সময় আমি কোন কাজ করতে রাজি নই,' বলল সোহানা। 'প্রশ্ন হলো, সাহারার মাঝখানে কেন আমি ছুটি কাটাতে যাব? প্রত্নতত্ত্ববিদরা কি নিঃসঙ্গতায় ভুগছেন? নাকি তাদের রাঁধুনি দরকার?' রানার প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল সোহানা।

'সঙ্গ দেয়ার বা রাঁধার জন্যে মিসেস হোয়াইটস্টোন আছেন,' অন্যমনস্কভাবে বললেন মারভিন লংফেলো। 'স্টকহোমে একটা কনভেনশনে রয়েছেন ড. জিমসন। আমাকে ফোন করেছিলেন। খানিকটা ব্যাকুল, খানিকটা সতর্ক বলে মনে হলো তাঁকে আমার। মনে হলো তাঁর ধারণা মালভূমিতে গোলমেলে কিছু ঘটছে। সেটা কি হতে পারে, আমার কোন ধারণা নেই। তবে আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন কাউকে একবার পাঠাই ওখানে, স্রেফ একটু নজর রাখার জন্যে।'

আশরাফ বলল, 'ব্যাপারটা অস্পষ্ট, তাই না?'

'হ্যাঁ, জানি।' কাঁধ ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। 'ড. জিমসন আমার পুরানো বন্ধু, আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে চাই।' সোহানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'অফিস থেকে কাউকে পাঠাতে পারি না, জানা কথা। ভাবলাম আপনি ছুটিতে আছেন, বললে হয়তো ওদিকে বেড়াতে যেতে পারেন। আশা করি বৃহস্পতিবারে দেখা হলে ড. জিমসন সব কথা খুলে বলবেন।'

'ঠিক আছে, আগে ভদ্রলোকের কথা শোনা যাক। কাজটার খরচ জোগাচ্ছে কে?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন মারভিন লংফেলো, তারপর বললেন, 'ক্যানিং, তবে ব্যাপারটা গোপনীয়। ভদ্রলোক নিজের প্রচার একেবারেই পছন্দ করেন না। কত বছর ধরে জনহিতকর কাজ করছেন তিনি, কিন্তু নিজের নাম কখনও প্রকাশ হতে দেননি।'

'আমাদের অফিসে যতগুলো চ্যারিটি সার্কুলার আসে, তার অর্ধেকেরই প্যাট্রন

তিনি,' বলল সোহানা। 'স্যার ভিক্টর ক্যানিং। উনি কি রাজকীয় পদক পেতে যাচ্ছেন?'

'দু'বার প্রত্যাখ্যান করেছেন।' দাঁড়ালেন মারভিন লংফেলো। 'বৃহস্পতিবার কখন ও কোথায়, ফোন করে জানাব আমি।'

'ঠিক আছে।'

আকাশের অনেক ওপরে উঠে এসেছে চাঁদ ঠাণ্ডা জোছনায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে মেয়েটার মুখ। জার্কার বোটের তলায় শুয়ে আছে সে, পিঠের নিচে মোটা একটা কম্বল, গায়ে উলের চাদর। জার্কার বাড়ি থেকে রানার ব্যাগগুলো নিয়ে আসা হয়েছে, এক ঘণ্টা হলো বাতাস আর স্রোত পেয়ে নর্থ প্যাসেজ ধরে তরতর করে এগোচ্ছে বোটটা।

অবশেষে নড়ে উঠল মেয়েটা। চোখের পাতা বার কয়েক কাঁপল, খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড আর নড়ল না সে। পাশেই বসে আছে রানা, হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁতে গিয়েও ছুঁলো না ও। ধীরে ধীরে সতর্ক একটা ভাব ফুটছে মেয়েটার চেহারায়। হঠাৎ সব কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মোচড় খেল শীররটা, চোখে বিহ্বল দৃষ্টি, হাত-পা ছুঁড়ে গা থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল চাদরটা।

'ভয় পাবার কিছু নেই,' নরম সুরে বলল রানা। 'তোমার বিপদ কেটে গেছে।' হাত বাড়িয়ে মৃদু চাপ দিল কাঁধে।

স্থির হলো মেয়েটা। দৃষ্টিহীন চোখে সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে আছে। মুহূর্তের জন্যে তার নাকের ফুটো দুটো চওড়া হলো, দ্রুত শ্বাস টানল সে। 'কে?'

'তুমি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ,' আশ্বাস দিল রানা। 'সৈকতে যারা তোমাকে ধরেছিল তাদের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করা হয়েছে।'

'জানি,' ফিসফিস করে বলল মেয়েটা, উচ্চারণ ভঙ্গিই বলে দেয় উত্তর আমেরিকার মেয়ে। 'আমি জানি; তোমার গায়ে অন্য রকম গন্ধ।'

হেসে ফেলল রানা। 'শুনে খুশি হলাম।'

মেয়েটার মাথা সামান্য একটু ঘুরল। 'বোটে আরেকজন আছে।'

বোটের পিছনে কালো ছায়ামূর্তিটার দিকে তাকাল রানা। 'হ্যাঁ, ও জার্কা। ওকেও তোমার ভয় পাবার দরকার নেই। আমরা দু'জনেই তোমাকে সাহায্য করছি। অনেস্ট।'

'প্লীজ...,' দু'হাত বাড়িয়ে রানাকে ধরার চেষ্টা করল মেয়েটা। '...আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি...।' একটা গড়ান দিয়ে রানার কোলের ওপর উঠে পড়ল সে, গলা লম্বা করে বোটের বাইরে বমি করল। এক সময় শান্ত হলো সে, আবার একটা গড়ান দিয়ে উঠে বসল, হেলান দিল রানার বুক আর কাঁধে। লোনা পানিতে রুমাল ভিজিয়ে তার মুখটা মুছে দিল রানা। 'দুঃখিত,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মেয়েটা।

'চিন্তার কিছু নেই, তোমাকে ওরা ইঞ্জেকশন দিয়েছিল, এ তারই প্রভাব।'

ধীরে ধীরে মেয়েটার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। তার মুখ দেখে রানা বুঝতে পারল, কি যেন স্মরণ করার চেষ্টা করছে সে। তারপর হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেল, শরীরটা মুচড়ে রানার দিকে ফিরল খানিকটা, ওর একটা কাঁধ খামচে ধরল।

'জুলি?'

চাদর থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা খালি হাত, শক্ত করে সেটা ধরল রানা। 'জুলি মানে তোমার সঙ্গে যে মেয়েটা ছিল?'

'হ্যাঁ। আমার বোন। কোথায় সে? প্লীজ?' আশঙ্কায় ভেঙে গেল গলাটা।

'মনটাকে শক্ত করো,' নরম সুরে বলল রানা। 'খবর ভাল নয়। পৌঁছুতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল। তোমার বোন···জুলি বেঁচে নেই।'

ভাঁজ খেয়ে ফুলে উঠল মেয়েটার মুখ। দু'চোখ বেয়ে হড়হড় করে পানি গড়াল। রানার বুকে মুখ গুঁজে কপালটা ওর কাঁধে ঘন ঘন ঘষল। খানিক পর ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল সে, 'ওরা তাকে খুন করেছে?'

'হ্যাঁ। বিনকিউলার দিয়ে দেখেছি আমি। অনেক দূরে ছিলাম, কিছুই করতে পারিনি।'

'কি দেখেছেন বলুন আমাকে।'

'নিজেকে কষ্ট দিয়ো না,' পরামর্শ দিল রানা।

'না, আমি শুনতে চাই।'

মৃদু গলায়, ধীরে ধীরে, সৈকতে দেখা দৃশ্যটা বর্ণনা করল রানা। একসময় থামল ও। ওর কাঁধে মুখ ঘষল মেয়েটা। তারপর স্থির হয়ে গেল। দশ মিনিট এক চুল নড়ল না। এটা তার একার যুদ্ধ, মেনে নেয়ার চেষ্টা। জার্কা বা রানা, কেউ কোন কথা বলল না। শুধু পানির ছলছলাৎ আর বোটের ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ শোনা গেল। তারপর একসময় রানার কাঁধ থেকে মুখ তুলল মেয়েটা, ঘৃণায় কুঁচকে আছে। গলাটা তিক্ত কান্নার মত শোনাল। 'কেন? জুলিকে কেন? এর কোন অর্থ নেই! ওর মত ভাল মেয়ে হয় না। ওহ্ গড, হোয়াই?'

'নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। ওকে মারল, তোমাকে মারল না। এখন থাক, পরে এ ব্যাপারে কথা বলা যাবে। আগে তুমি সুস্থ হও।'

মনে হলো রানার কথা শুনতে পায়নি মেয়েটা। খানিক পর নিচু গলায় বলল, অন্ধ চোখ আকাশের দিকে স্থির, 'আইন ওদের কিছুই করতে পারবে না। এখানে অন্তত নয়। ওহ্ গড, ওদেরকে আমি খুন করতে চাই! হ্যাঁ! জুলিকে যারা মেরেছে তাদেরকে খুন করতে পারলে জীবনে আর কিছু চাই না আমি।'

'কাজটা করা হয়েছে,' বলল রানা।

ঝট করে ওর দিকে ফিরল মেয়েটা। 'তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর মনে পড়ল মেয়েটা অন্ধ। 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওদের কাছে আর্মস ছিল! যে লোকটা আমাকে ধরেছিল···

'হ্যাঁ, ছিল। কিন্তু ব্যবহার করার সুযোগ পায়নি।'

'আমার স্যার মাসুদ রানার কাছে ছুরি ছিল,' এই প্রথম কথা বলল জার্কা।

'মাসুদ রানা?'

'আমি,' বলল রানা।

'শুধু নামটা বলবে? পরিচয় দেবে না?'

'বাংলাদেশের নাম শুনেছ? ট্যুরিস্ট, বেড়াতে এসেছি।'

'তুমি···তুমি কালো?'

'হ্যাঁ।'

কয়েক মুহূর্ত পর মেয়েটা বলল, 'কিভাবে কি ঘটল সব বলো আমাকে।'

বলবে কি বলবে না ভেবে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা। জেদি মেয়ে, না শুনে ছাড়বে না। কি ঘটেছে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল ও। কথা শেষ হতে রানার মুঠো থেকে নিজের আঙুলগুলো ছাড়িয়ে নিল মেয়েটা, ওর বাহু ছুঁলো, তারপর আঙুল বোলাল কাঁধ ও বুকে। সবশেষে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সে, বলল, 'তুমি ওদেরকে খুন করতেই চেয়েছিলে?'

'না। আমাকে দেখে যদি রিভলভারে হাত না দিত, ওদেরকে আমি আটক করার চেষ্টা করতাম। তবে মেরেছি বলে দুঃখিত নই। এরপর আর কাউকে খুন করতে পারবে না ওরা।'

ক্লান্ত, আড়ষ্ট হাসি ফুটল মেয়েটার মুখে। 'তুমি নিশ্চয়ই অদ্ভুত...অসাধারণ একটা মানুষ। আমার ভাল লাগছে। কিন্তু এর জন্যে তোমাকে ঝামেলায় পড়তে হবে না তো?'

'না। অন্তত আইনগত কোন ঝামেলায় পড়তে হবে না। ইয়টের লোকগুলো এ ব্যাপারে মুখ খুলবে না। শোনো, মেইনল্যান্ডে যাচ্ছি আমরা, দক্ষিণ দিক থেকে পানামা সিটিতে উঠব। ভোর হবার আগে পৌঁছুতে পারব বলে মনে হয় না। তার আগে তোমার সব কথা জানা দরকার আমার। খানিক পরে হলেও...।'

'আমি এখুনি বলতে চাই।'

'লক্ষ্মী মেয়ে। তুমি শুতে চাও?'

'না। আমি হেলান দিয়ে থাকায় তোমার কষ্ট হচ্ছে?'

'না-না!' মেয়েটার শোক ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করতে পারল রানা, এমন কি একজন অচেনা পুরুষের বাহুবন্ধনের ভেতরও খানিকটা সহানুভূতি ও সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছে সে। 'শুতে বলছিলাম আরও আরাম পাবে ভেবে। এবার, প্রথম কথা, পেনিফিদার নামে কোন লোককে তুমি চেনো কিনা?'

সরু ভুরু জোড়া কুঁচকে চিন্তা করল মেয়েটা। 'আমার চেনা উচিত?'

'তাকে আমি ইয়টে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, তোমাকে ধরার জন্যে ওদের দু'জনকে সে-ই পাঠিয়েছিল।'

'আমাকে ধরার জন্যে আর জুলিকে খুন করার জন্যে,' সজোরে ঠোঁট কামড়ে ধরল মেয়েটা, হঠাৎ উথলে ওঠা শোক সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে। 'দুঃখিত। জুলি ছাড়া আর কেউ নেই আমার। ও না থাকায় সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলাম আমি। না, পেনিফিদার নামে কাউকে চিনি না। আমাকে সে ধরতে চাইবে কেন?'

'ওটাই আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন। পেনিফিদার মানে হলো বিপদ। সে আমেরিকান, আন্ডারগ্রাউন্ডের কুখ্যাত অপারেটর। সাধারণত ছোট কোন কাজে হাত দেয় না সে। আমার মনে হয় না মুক্তিপণ আদায় করার জন্যে তোমাকে কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল সে। তোমার টাকা-পয়সা খুব বেশি নাকি?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'সব মিলিয়ে আটশো ডলারের মত আছে ব্যাঙ্কে।'

'তুমি কি সরকারি কোন দফতরে চাকরি করো? এই ধরো...।'

'না। কি ধরব?'

'ইন্টেলিজেন্স?'

ভেতরে হাসি থাকলে ফেটে পড়ত মেয়েটা। 'তোমার ধারণা, অন্ধ মেয়েদেরও ইন্টেলিজেন্সে নেয়া হয়?'

'আরও অনেক অদ্ভুত ঘটনা জানি আমি। নেভার মাইন্ড। বড় কোন কোম্পানিতে আছ কি? ইনডাস্ট্রিয়াল সিক্রেটস?'

'কেন তোমার মনে হলো আমি কাজ করতে পারি?' মেয়েটার গলায় কৌতূহল।

'কাজ পেতে অসুবিধে হবার কথা নয়, তোমার চেহারা অন্তত তাই বলে,' সুরটা স্বাভাবিক, তবে নিশ্চিত একটা ভাব আছে রানার গলায়; বোনকে হারাবার শোকে কাতর হলেও প্রশংসা শুনে মুহূর্তের জন্যে আনন্দময় পুলক অনুভব করল মেয়েটা। সে কিছু বলার আগে আবার বলল রানা, 'শোনো, সব কথা শোনা দরকার আমার। তুমি বরং প্রথম থেকে শুরু করো, শোনার পর আমি হয়তো বুঝতে পারব তোমার প্রতি এত কেন আগ্রহ পেনিফিদারের।'

'ঠিক আছে।' ধীরে ধীরে শুরু করল মেয়েটা, মাঝে মধ্যে দীর্ঘ বিরতি নিল, রানা তাকে বাধা দিল না।

তার নাম জেনি উডহাউস। মা-বাবা দু'জনেই মারা গেছেন। পরিবারটি কানাডা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসে, এগারো বছর বয়সে মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গেলেও, চোখ দুটো হারাতে হয়। এখন তার বয়েস বাইশ, জানে জীবনে কখনও দেখতে পাবে না। তার বোন, জুলি, ওর দেখাশোনা করত। এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় ভুগত জেনি, কারণ ও একা হয়ে যাবে বলে জুলি তার বয়ফ্রেন্ডকে বিয়ে করতে পারছিল না, ফলে নিজেকে অপরাধী লাগত তার। 'শেষ পর্যন্ত আমি একজন বয়ফ্রেন্ড খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করি,' বলল জেনি। 'মনের সায় ছিল না, কিন্তু সমস্যার আর কোন সমাধানও পাচ্ছিলাম না। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হলো আমার।' রানা অনুভব করল, জেনি কাঁধ ঝাঁকাল। 'মাত্র দু'জনের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পেলাম। আমার জানা হয়নি কি রকম দেখতে তারা। নিজে আমি কি রকম দেখতে, এমন কি তা-ও আমি ভুলে গেছি। প্রথম ছেলেটার কাছে আমি সম্ভবত একটা খেলনার মত ছিলাম, কিছুদিন মেলামেশার পর আমার বিশ্বাস অর্জন করল সে, তারপর একদিন একসঙ্গে শুলাম আমরা—ব্যস, তার কাছে আমি পুরানো হয়ে গেলাম। আমাকে ফেলে চলে গেল সে। রাগে পাগল হয়ে গিয়েছিল জুলি। জীবনে সেই প্রথম ওকে আমি রাগতে দেখি। দ্বিতীয় ছেলেটিকে আমার ভাল লেগেছিল, কিন্তু আমার অন্ধত্বের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না তার। তবে খুবই ভদ্র ছেলে, এত ভদ্র যে আমাকে ছেড়ে যেতে বিবেকে বাধছিল তার। সম্পর্কটা আমিই ভেঙে দিই। কারণ এর কোন পরিণতি ছিল না। দুঃখিত, আসলে এসব তুমি শুনতে চাইছ না, তাই না?'

কথা বলার সুযোগ পেয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে জেনি, ওষুধ হিসেবে কাজ দিচ্ছে। 'তুমি বলে যাও, জেনি। তোমার সব কথাই আমি শুনতে চাই।'

বলার কথা অল্পই বাকি আছে। জুলি ছিল অত্যন্ত দক্ষ একজন সেক্রেটারি,

টপ এক্সিকিউটিভ অফিসাররা ঠিক যে-ধরনের সেক্রেটারি পছন্দ করেন। বোনের সঙ্গে থেকে-ডিকটাফোন টাইপিস্ট হিসেবে ট্রেনিং নেয় জেনি···

কথাটা বলার সময় মাথাটা সামান্য একটু ঘোরাল জেনি। রানা ধারণা করল, কাহিনীর এই অংশটুকু বোধহয় সত্যি নয়। যে-কোন কারণেই হোক, এটুকু বানিয়ে বলছে মেয়েটা। কারণটা হয়তো আত্মমর্যাদা। কিছুই গোপন করছে না সে, কাজেই একটা মাত্র মিথ্যে বলায় তাকে চ্যালেঞ্জ না করার সিদ্ধান্ত নিল রানা:

দুই বোন ওরা একসাথে কাজ করত, নির্দিষ্ট কোথাও নয়, বলা যায় ফ্রিল্যান্সার ছিল ওরা। কখনও কানাডায়, কখনও যুক্তরাষ্ট্রে, একনাগাড়ে বেশিদিন কোথাও থাকত না। বেশিরভাগ সময় কাজ করেছে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহকারী কোম্পানির সঙ্গে। দু'একটা খনি ও তেল কোম্পানির কাজও করেছে। তবে গোপন এমন কিছু জানত না জুলি যা ক্রিমিন্যাল অর্গানাইজেশনের কাছে মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে। জুলিও না, সে-ও না।

'আমরা ছুটিতে ছিলাম,' বলল জেনি। 'জুলি একটা গাড়ি ভাড়া করে, মেক্সিকোর ভেতর দিয়ে এদিকে চলে আসি আমরা। ভারি রোমাঞ্চকর একটা জার্নি ছিল। জুলি ছিল আমার চোখ, চারদিকের দৃশ্য এত সুন্দর বর্ণনা করতে পারত, সব প্রায় দেখতে পেতাম আমি। তারপর আমরা ভাবলাম, এত দূরে যখন এসেই পড়েছি, পানামা না দেখে ফিরছি না। তা-ও দেখা হলো, এবার পানামা থেকে আমাদের ফেরার পালা। গাড়ি রেখে বোট ভাড়া করব, ওই বোটে চড়েই যাব নিউইয়র্কে, অথবা সান ফ্রান্সিসকোয়, প্ল্যান করা হলো।'

বুদ্ধিটা এল জুলির মাথায়, এত তাড়াতাড়ি না ফিরে পার্ল আইল্যান্ডে গেলে কেমন হয়? সে যুক্তি দেখাল, তারা দুই বোন চিরকাল তিন হাজার মাইল চওড়া একটা জমিনে বসবাস করছে, জীবনে কখনও কোন দ্বীপে পা ফেলেনি–শুধু লং আইল্যান্ড বাদে, তবে ওটাকে তো আর গোনার মধ্যে ধরা যায় না।

কাজেই ছোট একটা স্টীমারে চড়ে পানামা সিটি থেকে সান মিগুয়েল-এ চলে এল তারা। সেই একই বিকেলে একটা মোটর বোট ভাড়া করা হলো, উদ্দেশ্য ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপগুলোর মাঝখানে ঘোরাঘুরি, তারপর নির্জন কোন একটা দ্বীপে শুয়ে রোদ পোহানো ও গোসল করা।

'জানি গোটা ব্যাপারটাই এক ধরনের পাগলামি ছিল,' বলল জেনি। 'তবে পুরো ছুটির সময়টাই সমস্ত কিছু ঝোঁকের মাথায় করেছি আমরা, কোন বিপদ তো হয়ইনি, বরং প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। জুলি একটা বীচ পছন্দ করল। আমরা যখন তীরে ভিড়ছি, ছোট একটা ইয়টকে পাশ কাটাতে দেখে ও। মনে পড়ছে, ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথাও বলি আমরা। কারণ তার আগে পর্যন্ত ওদিকে আমরা কোন মানুষ বা বোট কিছুই দেখিনি। বীচে আছি ঘণ্টাখানেক হবে, এই সময়···।'

গলাটা কেঁপে গেল জেনির, কষ্ট করে একটা ঢোক গিলল সে।

'হ্যাঁ, বলো,' তাগাদা দিল রানা।

'হঠাৎ জুলি বলল, দু'জন লোক আসছে। আমার মনে হয় আমরা দেখতে পাবার আগেই সৈকতে নেমে এসেছিল লোকগুলো। জুলির গলা শুনে বুঝতে

পারলাম অস্থির হয়ে উঠেছে সে, ভয় পাচ্ছে। আমাকে ধাক্কা দিয়ে বোটে তোলার চেষ্টা করল সে। কিন্তু ওরা আমাদেরকে ধরে ফেলল।'

রানার বুকে হেলান দিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল জেনি, চোখ দুটো বন্ধ। তারপর বলল, 'এরপর কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করা কঠিন। আমার চেয়ে তুমিই বোধহয় ভাল জান। এ-পর্যন্ত যা শুনলে, কোন লাভ হলো?'

'না, কোন তথ্য বা সূত্র পেলাম না,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'যতটুকু বুঝতে পারছি, ওদের শুধু তোমাকে দরকার ছিল। জুলিকে পালিয়ে যেতে দিলে অপরাধের একজন সাক্ষী থেকে যায়, তাই তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। ওর ব্যাপারটাকে এমন ভাবে সাজাতে চেয়েছিল, দেখে যাতে মনে হয় তোমরা ডুবে মারা গেছ—জুলির লাশটা তীরে এসে ঠেকে, তোমারটা স্রোতের টানে ভেসে যায়। এ থেকে আরেকটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়।'

'কি ব্যাপার?'

'আগে বা পরে তোমাকেও ওরা মেরে ফেলত।'

'জীবনে কারও সঙ্গে আমাদের ঝগড়া পর্যন্ত হয়নি, কেন কেউ আমাদেরকে মেরে ফেলতে চাইবে?' জেনির গলায় নির্ভেজাল বিস্ময়। 'কিভাবে ঘটেছে সেটা না হয় জানলাম, কিন্তু কেন ঘটেছে তার উত্তর কে দেবে?'

'ব্যস্ত হবার কিছু নেই,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'ঘটনার এখানেই শেষ নয়। পেনিফিদারকে চিনি। তোমাকে যদি তার দরকার থাকে, হাল ছাড়বে না।' কেঁপে উঠল জেনি, আবার বোধহয় অসুস্থ বোধ করছে। ব্যাগ থেকে ব্র্যান্ডির ছোট্ট ফ্লাস্কটা বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। 'ধরো এটা, একটা চুমুক দিলে ভাল লাগবে।'

ফ্লাস্কটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে মেয়েটাকে সাহায্য করল রানা। ছোট ছোট ঢোক গিলে বেশ খানিকটা ব্র্যান্ডি খেল সে। একটু পরই তার কাঁপুনি থামল। 'দুঃখিত। লোকটাকে যে আমি ভয় পাচ্ছি তা নয়। জীবনের প্রতি যতটুকু মায়া থাকলে মৃত্যুকে ভয় পায় মানুষ, ততটুকু মায়া আমার ভেতর আর নেই—জুলি নেই, কাজেই কিছুই আর আমি গ্রাহ্য করি না। তবে তুমি যদি ওই লোকটাকেও খুন করতে, আমার ভাল লাগত।'

'শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দাঁড়াবেও তাই—হয় সে, নাহয় তুমি।'

রানার কোলের ওপর জেনির শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

রানা বলে চলেছে, 'বাস্তব পরিস্থিতি তুমি মেনে নিতে পারবে, বুঝতে পারছি বলেই কথাটা বললাম, জেনি। শোনো। যেখানেই তুমি পালাও, তোমাকে পেনিফিদার হাতের মুঠোয় না পাওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটার ইতি ঘটবে না। কিংবা সে মারা না যাওয়া পর্যন্ত। কাজেই এখন থেকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে তোমাকে।'

ধীরে ধীরে শিথিল হলো জেনির পেশী। 'পানামা সিটিতে পৌঁছুলাম আমরা, তারপর তুমি আমাকে পুলিসের কাছে নিয়ে যাবে?'

'তুমি যদি চাও। তবে তাতে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। পেনিফিদারের যোগাযোগ একটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের চেয়েও বেশি। ভোরের

মধ্যে পানামার প্রায় সব ক'টা গুণ্ডা তার পক্ষ থেকে তোমাকে খুঁজতে বেরুবে। পানামা পুলিসের বৈশিষ্ট্য হলো, ওদের কাছে প্রোটেকশন চাইলে মৃত্যুটা আরও তাড়াতাড়ি আসে। টাকা খেয়ে পুলিস অফিসাররাই খুনীদের সুযোগ তৈরি করে দেয়।'

'কিন্তু ক্যানাল জোনে? ওখানেও কি একই পরিস্থিতি? ওদিকটা তো আমেরিকানরা নিয়ন্ত্রণ করে।'

'সব জায়গায় একই অবস্থা। তাছাড়া, খানিক আগে দু'জন আমেরিকানকে পৃথিবী থেকে ছুটি দিয়েছি আমি।'

অনেকক্ষণ কথা বলল না জেনি। মাথাটা একদিকে সামান্য কাত হয়ে থাকল, যেন মন দিয়ে রানার নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ শুনছে। তার নাকের ফুটো বড় হতে দেখল রানা, অনুভব করল তার আঙুলগুলো ওর বাহুর ওপর নড়াচড়া করছে। বুঝতে পারল, নিজস্ব ভঙ্গিতে ওকে বুঝতে চেষ্টা করছে মেয়েটা, ওর সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা পেতে চায়। অবশেষে মুখ খুলল সে, 'তোমাকে খুব অভিজ্ঞ মনে হলো আমার। কিন্তু নিজের সম্পর্কে সব কথা আমাকে জানাওনি।'

'শুধু এটুকু জেনে রাখো, আমার কাছে তুমি নিরাপদ।'

'আর কিছু যদি না জানাতে চাও, তোমাকে আমার রহস্যময় মানুষ বলে মনে হবে।'

'আর কি জানতে চাও তুমি?'

'মাসুদ রানার আসল পরিচয়।'

হেসে উঠল রানা। 'বললে বিশ্বাস করবে, বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করাটা আমার পেশার একটা অংশ বিশেষ? তবে ছুটিতে আছি আমি।'

'প্রাইভেট আই?' জিজ্ঞেস করল জেনি, তাকে রোমাঞ্চিত বলে মনে হলো রানার।

'না, আমি সরকারি চাকরি করি।'

'ও। তারমানে কি জেমস বন্ডের বাস্তব সংস্করণ?'

আবার হেসে ফেলল রানা। 'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সাথেও লিয়াজোঁ আছে আমার,' বলল ও।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মেয়েটা, তারপর বলল, 'আমার জন্যে অনেক করেছ তুমি, মাসুদ রানা। অসংখ্য ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে, এরপর কি করবে তা-ও তুমি ভেবে রেখেছ। বলবে আমাকে?'

'পোয়ের্টো দে কোরেরা-র পিছনে, রাস্তার কাছাকাছি ছোট্ট একটা কটেজ আছে আমার। মাইল দুয়েক হাঁটতে পারবে তুমি?'

'পারব। চাদর মুড়ি দিয়ে?'

'জার্কার মেয়েরা তোমার জন্যে কিছু কাপড় ও এক জোড়া স্যান্ডেল দিয়েছে, আপাতত ওগুলো দিয়েই কাজ চালাতে হবে তোমাকে। কটেজের গ্যারেজে আমার একটা গাড়ি আছে বটে, তবে ওটা আমি ব্যবহার করতে চাই না। ওখানে স্রেফ গা ঢাকা দিয়ে থাকব আমরা।'

'কেন?'

'কারণ পানামা থেকে বেরিয়ে যাবার রাস্তা খুব বেশি নেই, ইচ্ছে করলে সবগুলোর ওপর সহজেই নজর রাখা যায়। এয়ারপোর্ট বা পোর্টে পেনিফিদারের লোক থাকবে। হাইওয়ে বর্ডার ক্রসিঙেও থাকবে।'

'তার অর্গানাইজেশন এত বড়?'

'পানামায় গুণ্ডাপাণ্ডা ভাড়া করতে বেশি টাকা লাগে না।'

'গা ঢাকা দিয়ে থাকব—কতদিন?'

'সেটা এখনই বলতে পারছি না। দু'তিন দিন পর পরিস্থিতি বুঝে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারব বলে মনে করি। তবে চিন্তা কোরো না, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে না দিয়ে আমি কোথাও যাচ্ছি না। দরকার হলে আমি আমার বন্ধুদের সাহায্য চাইব।'

'পানামায় তোমার বন্ধু আছে?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে রানা বলল, 'না, পানামায় নেই। তবে আমি ডাকলে দুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকুক তারা, ছুটে চলে আসবে।'

'তাহলে বলা যায় ভাল লোকের হাতেই পড়েছি আমি,' বিড়বিড় করল জেনি, নড়েচড়ে রানার কোলের ওপর পিঠ আর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল সে, চোখ বুজল। অনুভব করল, তার গায়ের চার ধারে চাদরটা গুঁজে দিচ্ছে রানা।

'তুমি ঘুমোও, জেনি,' কোমল সুরে বলল রানা। 'কোন চিন্তা নেই।'

প্রথম শ্রেণীর রেস্তোরাঁ মিডনাইট সান-এ ডিনার সারল ওরা।

'নক্ষত্ররাজির কক্ষপথ ইত্যাদি বিবেচনা করলে,' বলল আশরাফ চৌধুরী, 'আজ যেহেতু বৃহস্পতিবার, সমাজের উচ্চপদে আসীন কারও কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত একটা উপহার পাবার কথা আমার।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল সে। 'দিনটার আয়ু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাকি আছে আর মাত্র নব্বুই মিনিট। ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড-এর রাশিচক্র মিথ্যে হতে পারে না। বিশাল সব সূর্য, আমাদের কাছ থেকে অকল্পনীয় দূরত্বে, মহাশূন্যে চক্কর দিচ্ছে, খানিকটা কাছাকাছি বেশ অনেকগুলো গ্রহও নিজেদের কক্ষপথ ধরে ঘুরছে—সবগুলো মিলে একযোগে চেষ্টা করছে ঘটনাটা ঘটাবার, সে-চেষ্টা যত সূক্ষ্মই হোক—সমাজের উঁচু পদে আসীন কারও কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত একটা উপহার পাবই পাব আমি। কিন্তু ঘটনাটা তবু ঘটছে না।'

টেবিলে কফি ও ব্র্যান্ডি দিয়ে গেল ওয়েটার।

'সমাজের উঁচু পদে নেই আমি,' বলল সোহানা।

'মি. মারভিন লংফেলো আছেন,' বলল আশরাফ চৌধুরী। 'আমি দেখতে পাচ্ছি, তাঁর হাতের কাছে একবাক্স ভাল চুরুটও রয়েছে।'

হেসে উঠলেন বিএসএস চীফ, বাক্স খুলে চুরুট অফার করলেন আশরাফকে। খাওয়াদাওয়ার পর পরিতৃপ্ত বোধ করছেন তিনি: সোহানার সঙ্গ সব সময়ই ভাল লাগে তাঁর। আশরাফের সান্নিধ্যও তাঁকে আনন্দ দান করছে। দু'জনকে নিমন্ত্রণ করার সময় মনে ক্ষীণ একটু সন্দেহ ছিল তাঁর, ওরা হয়তো নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত থাকবে যে তাঁর উপস্থিতি টেরই পাবে না। বাস্তবে তেমন কিছু ঘটেনি।

আশরাফ আর সোহানার সম্পর্কটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, দ্বিধাদ্বন্দ্বে আড়ষ্ট নয়, দু'জনের কেউই গোপন জটিলতায় ভুগছে না। যদিও, স্নেহপরায়ণ শুভানুধ্যায়ী হিসেবে মারভিন লংফেলো কামনা করেন, সোহানার এমন একজন বয়ফ্রেন্ড থাকা দরকার যাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখবে সে। সোহানা যে সে-ধরনের কোন স্বপ্ন আশরাফ চৌধুরীকে নিয়ে দেখছে না, এটা আজ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

আজ রাতে উজ্জ্বল সবুজ একটা সিল্ক ড্রেস পরেছে সোহানা, স্লিভলেস, সঙ্গে ম্যান্ডারিন কলার। একটি মাত্র অলঙ্কার, একটা ব্রোচ, পরেছে কলারের নিচে—সাদা সোনার ওপর বসানো গাঢ় রঙের নীলা। তার চোখ, নীলার চেয়েও গাঢ়, আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে আছে। খুবই কম কথা বলছে সোহানা, তবে মন দিয়ে শুনছে, আশরাফ চৌধুরীর হালকা রসিকতা ভালই লাগছে তার।

'কিন্তু বললে না তো কেন তুমি প্লেনে চড়তে পছন্দ করো না,' আগের কথার খেই ধরে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'ওড়াউড়ির ব্যাপারটা মানুষের জন্যে নয়, পাখির জন্যে,' অলস ভঙ্গিতে অজুহাত দেখাল আশরাফ চৌধুরী।

'আসল কথাটা বলছ না কেন? প্লেনে চড়তে তুমি ভয় পাও, তাই না?' বলল সোহানা। 'অথচ ভয় পাওয়ার সত্যি কিছু নেই। ফ্লাইং ইজ স্ট্যাটিসটিক্যালি ভেরি সেফ, তোমার জানা উচিত।'

'আমি একজন স্ট্যাটিসটিশিয়ান। তুলনামূলক সেফটি ফ্যাক্টর সম্পর্কে অবশ্যই জানি আমি। মস্কো থেকে লন্ডনে আসার পথে পুরোটা সময় হিসাব কষায় ব্যয় করেছি—দুর্ঘটনায় পড়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। কিন্তু আমরা হিথরোতে আসার পর যখন সেফটি-বেল্ট বাঁধতে বলা হলো, আমাকে বাঁধতে হয়নি। মস্কো থেকে প্লেন টেক-অফ করছে যখন, কাজটা তখনই করা হয়ে গেছে।'

হেসে উঠল সোহানা, তাকাল মারভিন লংফেলোর দিকে। 'আপনার বন্ধু ড. জিমসনের সঙ্গে কখন আমরা দেখা করতে যাব?'

'তাঁর প্লেন যদি সময় মত পৌঁছে থাকে, এইমাত্র বাড়ি ফিরে এসেছেন তিনি,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'বিশ মিনিট সময় দেয়া যাক তাঁকে। রওনা হবার আগে ফোনে যোগাযোগ করব আমি।'

'কি নিয়ে উদ্বিগ্ন তিনি, এখনও আমার তা জানা হয়নি,' বলল সোহানা। 'জায়গাটা যেন কোথায়?'

'প্যাপিরাসের লেখা অনুসারে জায়গাটার নাম মাস। তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধের পরপর নিউমিডিয়ায় একজন রোমান শাসক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল ডোমিটিয়ান মাস। প্যাপিরাসের লেখাগুলো তাঁরই।'

'কিন্তু রোমানরা নিশ্চয়ই ইন সালাহ্ পর্যন্ত আসেনি।'

'না, দখল করেনি,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'তবে বার্বারদের অনেক গোষ্ঠীপতির সঙ্গে চুক্তি করেছিল তারা, কাজেই ধরে নেয়া চলে রোমান অফিসাররা ঘন ঘন আসা-যাওয়া করত। ডোমিটিয়ান মাস বার্বারদের এক রাজকুমারীকে বিয়েও করেন। শহরটা রোমানদের পরিচালনায় বার্বারদের দ্বারা তৈরি করা হয়। দীর্ঘদিন মেলামেশা করায় রোমানদের অনেক সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠান শিখে

ফেলে তারা, অন্তত ইতিহাস তাই বলে।'

'ইতিহাস মিথ্যে বলে না,' সায় দিল সোহানা। 'মিলটা এখনও চোখে পড়ে। মরোক্কান আর্কিটেকচারের দিকে তাকান।'

'জায়গাটা খুবই ছোট,' বললেন মারভিন লংফেলো, অ্যাশট্রেতে চুরুটের ছাই ঝাড়লেন। 'অনেকটা জর্দানের পেট্রার মত, আমার ধারণা, তবে আরও ছোট।'

'মাটি ফুঁড়ে প্রাচীন একটা শহর পাওয়া গেছে, ভাল কথা,' বলল আশরাফ। 'আবার গোলমাল বাধল কি নিয়ে? ড. জিমসন কোন আভাস দেননি?'

'না, ফোনে আলাপ করতে চাননি,' বললেন বিএসএস চীফ। 'তবে একটু পরেই জানতে পারব আমরা। ফোনে শুধু বারবার বলছিলেন, কিছু একটা গোলমাল আছে। প্রফেসর হোয়াইটস্টোনের চিঠিগুলো কেমন যেন, ওগুলোয় কি যেন গোপন করার চেষ্টা হয়েছে। প্রফেসর হোয়াইটস্টোনকে কি ব্যাপারে সন্দেহ করেন তিনি, প্রশ্নটা করায় আমার ওপর রেগে গেলেন। জোর দিয়ে বললেন, হোয়াইটস্টোন আমার বাল্যবন্ধু, তাঁকে আমি নিজের মতই বিশ্বাস করি।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। 'মাস হলো দুনিয়ার শেষ প্রান্ত, ওখানে শুধু হোয়াইটস্টোনের টীম কাজ করছে, লোকাল শ্রমিকরা নেই—তারমানে লেবার প্রবলেমও তো থাকার কথা নয়।'

'আপনি চিঠির কথা বলছিলেন,' এক মুহূর্ত পর বলল সোহানা।

'হ্যাঁ। খোঁড়ার কাজে প্রচুর ব্যয় করেছেন ভিক্টর ক্যানিং। টীমটাকে সেরা ইকুইপমেন্ট দেয়া হয়েছে। আলজিয়ার্স থেকে প্রতি হপ্তায় সাপ্লাই নিয়ে যায় একটা প্লেন। চিঠি-পত্রও বহন করে।'

'ড. জিমসন নিজে কেন গিয়ে দেখে আসছেন না?' জিজ্ঞেস করল আশরাফ।

নিজের বুকে একটা আঙুল তাক করলেন মারভিন লংফেলো। 'হার্ট। জায়গাটা অত্যন্ত গরম।' সোহানার দিকে তাকালেন তিনি, চোখে প্রশ্ন।

'খোঁড়াখুঁড়ি দেখতে আমার ভালই লাগবে বলে মনে হয়। আমি কি নিজের চেষ্টায় যাব?'

'গুড লর্ড, নো! আপনি যদি যেতে রাজি হন, ভিক্টর ক্যানিঙের সঙ্গে কথা বলে ড. জিমসনই সব ব্যবস্থা করবেন—আপনি যাতে আলজিয়ার্স থেকে সাপ্লাই প্লেনে চড়তে পারেন।'

'তিনি কি তাঁর উদ্বেগের কথা স্যার ভিক্টর ক্যানিংকে জানিয়েছেন?'

'বলেছেন। হাসেননি ভিক্টর ক্যানিং, মন দিয়ে শুনেছেন, অন্তত শোনার ভান করেছেন। তারপর সান্ত্বনাসূচক কিছু শব্দও উচ্চারণ করছেন। বন্ধু মহলে একটা কথা অনেক আগে থেকেই রটেছে, ড. জিমসন সব ব্যাপারেই একটু বেশি মাত্রায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।'

'ঠিক আছে, যাব আমি। বেড়ানও হবে, প্রফেসর হোয়াইটস্টোনের সঙ্গে আলাপও করা যাবে, ফিরে এসে আমিও কিছু সান্ত্বনাসূচক শব্দ উচ্চারণ করব।'

'আই শ্যাল বি রিয়েলি গ্রেটফুল।'

'কিন্তু একটার চেয়ে দুটো মাথা কি ভাল নয়?' জিজ্ঞেস করল আশরাফ। 'মানে, বলতে চাইছি, সোহানার সঙ্গে আমিও যেতে পারি? আমার উপস্থিতি গোটা

ব্যাপারটায় অ্যাকাডেমিক কালার এনে দেবে বলে মনে করি। তাছাড়া একা একটা মেয়ে, হোক সে রণরঙ্গিণী, ধু-ধু মরুভূমিতে যদি হারিয়ে যায়, কে তাকে খুঁজে বের করবে?'

চিন্তিত ভাবে মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। 'আপনার কথায় যুক্তি আছে।'

সোহানা বলল, 'ধন্যবাদ।' আশরাফের দিকে তাকাল সে। 'চিন্তা কোরো না, প্লেনে আমি তোমার হাত ধরে থাকব, আর স্ট্যাটিসটিক্স্ কোট করব।'

'তা কোরো, আমার টেকনিক্যাল প্রশ্নগুলোর উত্তর পাইলটের কাছ থেকে আদায় করার পর যদি সময় পাও। তবে যাই করো, খবরদার, আমার সেফটি-বেল্ট খোলার চেষ্টা কোরো না।'

তিন

সাত মিনিট পর হাইড পার্কে ঢুকল সোহানার মার্সিডিজ। রেস্তোরাঁ থেকে বেরুবার আগে সবুজ ড্রেসের সঙ্গে মানানসই একটা সিল্ক কোট পরেছে সে। পিছনের সীটে বসেছে আশরাফ, সোহানার পাশে মারভিন লংফেলো। খুক করে কেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ভদ্রলোক, তবে কিছু বললেন না।

'মনে হচ্ছে কি যেন বলতে চান আপনি?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'আভাসে কাজ হয়নি,' বললেন বিএসএস চীফ। 'কাজেই সরাসরি জিজ্ঞেস করি। মি. রানা এই মুহূর্তে কোথায় জানতে পারলে আমার একটা উপকার হত।'

'জানতে পারি, কি ধরনের উপকার?' মৃদু, আড়ষ্ট হাসি সোহানার মুখে।

'আমার কিছু ইনফরমেশন দরকার, জাপানী টেরোরিস্ট গ্রুপ আকামুডা সম্পর্কে,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'মি. রানা একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, গ্রুপটা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছেন তিনি।'

আড়ষ্ট ভাবটুকু অদৃশ্য হলো সোহানার চেহারা থেকে। ড্যাশবোর্ডের একটা সুইচ অন করল সে। 'রানার ব্যাপারটা একটু রহস্যময়। গত পনেরো বিশদিন তার কোন খবরই পাইনি আমি। তবে এখন একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'হেঁয়ালি করছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল আশরাফ। 'রানার খবর তুমি রাখো না? কিংবা রানা তোমার খবর রাখে না?'

ইঙ্গিতটা না বোঝার ভান করল সোহানা, মারভিন লংফেলোকে বলল, 'তেইশ শো ঘণ্টায় রানার সঙ্গে প্রায় রোজই আমার কথা হয়, লন্ডন সময়। কিন্তু বেশ ক'টা দিন রানার সাড়া পাচ্ছি না। আপনি বললে এখুনি ওকে পাবার চেষ্টা করতে পারি।'

'তুমি কি রেডিওর কথা বলছ, সোহানা?' জিজ্ঞেস করল আশরাফ। 'ড্যাশবোর্ডের নিচে অভিধান আকৃতির ওই জিনিসটা সত্যি একটা রেডিও?'

'কেডব্লিউ ২০০০-এ ট্রান্সসিভার, ব্যাটারিতে চলছে। দূরে কোথাও গেলে এই একই জিনিস একটা নিজের সঙ্গে রাখে রানা সাধারণত।'

'তুমি যে রেডিও অপারেটরও, আমার জানা ছিল না,' মন্তব্য করল আশরাফ।

'লাইসেন্সড রেডিও অ্যামেচার।' গ্রসভেনর গেটে ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে গাড়ি থামাল সোহানা, রেডিওর সঙ্গে মাউথপীসটা জোড়া লাগাল। মাউথপীসটা ওর মুখের সামনে ঝুলে রয়েছে।

'এমন কিছু বলো শুনে যেন দুর্বোধ্য লাগে,' আহ্বান জানাল আশরাফ।

'অটোমেটিক সুইচ আছে সেটটায়,' বলল সোহানা। 'কথা বলতে শুরু করলেই মেসেজ পৌঁছে যাবে, আমি থামলেই ওখান থেকে মেসেজ আসবে। হাতের কোন কাজ নেই টোয়েনটি মিটার ব্যান্ড, স্পট ফ্রিকোয়েন্সি ফরটিন ওয়ান-ওহ্-থ্রী মেগস।'

'নির্ঘাত কৌতুক করছ তুমি,' বলল আশরাফ। 'তোমার কাছ থেকে আভাসে জেনেছি আমি, রানা এই মুহূর্তে আমেরিকা বা আরও দূরে কোথাও আছে—হাইড পার্কের ভেতর দিয়ে যাবার সময় একটা গাড়িতে বসে তার সঙ্গে তুমি কথা বলতে পারো না। এ-সব শুধু টিভির স্পাই-থ্রিলারে সম্ভব।'

'এর আগে এটার সাহায্যে ওর সঙ্গে কথা বলেছি আমি—হংকং, ইন্ডিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ব্রাজিলে ছিল ও।'

'অথচ লন্ডনেরই একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়েছি আমি, দশ মিনিট পর হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হই!' সামনের দিকে ঝুঁকল আশরাফ। 'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলাম না। তবু যদি যোগাযোগ হয়, ওকে আমি দু'একটা কটু কথা শোনাতে পারব, অনুমতি আছে?'

'অনুমতি নেই, কারণ হ্যালো বলতে হলেও লাইসেন্স লাগবে তোমার। আসলে, রয়্যাল পার্কে থাকার সময় এই রেডিও চালু করা নিষেধ। যদিও কয়েক মিনিটের মধ্যে পার্ক থেকে বেরিয়ে যাব আমরা। আইনটা অবশ্য তেমন কড়াও নয়।' ট্রাফিক লাইট বদলে গেল, মার্সিডিজ ছেড়ে দিল সোহানা।

'অ্যামেচার ব্যান্ড মনিটর করা হয়,' কাঁধের ওপর দিয়ে আশরাফের দিকে ফিরে বললেন মারভিন লংফেলো। 'আইনে আছে, ধর্মীয় প্রচারণা, রাজনীতি ও ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার করা যাবে না। সেক্সও নিষিদ্ধ।'

'শর্ট ওয়েভের মাধ্যমে সেক্স আমাকে বিপুলভাবে আলোড়িত করবে বলে মনে হয় না,' বলল আশরাফ। 'তবে…,' হঠাৎ যান্ত্রিক গুঞ্জন শুনে চুপ করে গেল সে, পরমুহূর্তে শুনতে পেল মাসুদ রানার ভারী গলা।

'জিথ্রিকিউআরও, জিথ্রিকিউআরও—হিয়ার ইজ জিথ্রিকিউআরএম স্ট্রোক এইচপি কলিং। হাউ কপি?'

সোহানা বলল, 'জিথ্রিকিউআরএম স্ট্রোক এইচপি, হিয়ার ইজ জিথ্রিকিউআরও মোবাইল রিপ্লাইং। তোমার গলা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। আমার সঙ্গে আশরাফ ও মারভিন লংফেলো রয়েছেন। হাউ কপি?'

রানা বলল, 'গুড অ্যান্ড ক্লিয়ার। আমার সঙ্গে পূর্ণিমা রয়েছে।'

আয়নায় চোখ পড়তে আশরাফ দেখল, সোহানার চেহারা বদলে গেল। 'হোল্ড ইট,' বলে মার্বেল আর্ক-এর বিশাল চক্করটা ঘুরল সে খানিকটা এগিয়ে এসে রাস্তার ধারে মার্সিডিজ দাঁড় করাল, বন্ধ করল এঞ্জিন। তারপর মাইকে বলল,

'তোমার সঙ্গে ও কি অনেকক্ষণ থাকবে?'

'সেটা নির্ভর করে চাচা পেনস-এর ওপর।'

এবার মারভিন লংফেলোকে আড়ষ্ট হয়ে উঠতে দেখল আশরাফ. ঝট করে সোহানার দিকে তাকালেন তিনি। তাঁর চেহারা থেকে হাসিখুশি ভাবটুকু মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে।

'...আমাদের দু'জনেরই এখানে দম বন্ধ হওয়ার অবস্থা,' বলছে রানা। 'তবে তারপরও আমি ব্যস্ত।'

'কি নিয়ে ব্যস্ত তুমি?' জিজ্ঞেস করল সোহানা। তার চেহারায় ব্যগ্র একটা ভাব. আশরাফের মনে হলো কোন সূত্র পাবার আশায় কান খাড়া করে আছে সে।

'পুরানো আরবী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি,' বলল রানা। 'বিশ্বাস করো. দ্রুত শিখছি আমি। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে অনেক দূর এগিয়ে যাব বলে আশা রাখি।'

সোহানার পেশীতে ঢিল পড়ল। 'বেশ ভাল। আমার মনে পড়ছে. সা'দ-এর লম্বা কবিতাটা মুখস্থ করতে পারছিলে না।'

'এখন জিজ্ঞেস করে দেখো না,' রানার গলায় গর্ব। 'শোনো তাহলে...' আরবী কবিতাটা আবৃত্তি করল রানা। মাঝে মধ্যে একটু ইতস্তত করল ও, তবে থামল না। ওর কবিতার একটা বর্ণও বুঝল না আশরাফ। মারভিন লংফেলোও আরবী জানেন না।

ড্যাশবোর্ড থেকে প্যাড আর পেন্সিল নিয়ে তৈরি হলো সোহানা। প্রায় দু'মিনিট আবৃত্তি করল রানা। প্যাডে সোহানা শুধু একটা সংখ্যা লিখল। স্থির হয়ে বসে আছে আশরাফ, কথা বলছে না। রানা ও সোহানা নিজেদের পেশাগত বিষয় নিয়ে আলাপ করছে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কি আকৃতি পাবে জানা নেই তার, তবু তার তলপেটের ভেতরটা মোচড় খাচ্ছে।

'কি, কেমন লাগল?' জানতে চাইল রানা।

'মন্দ নয়। উচ্চারণ আগের চেয়ে ভাল হয়েছে। তবে দ্বিতীয় স্তবকে ভুল আছে একটু। ওখানটায় হবে...,' আরবীতে কিছু বলল সোহানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

'শোনো, ট্রাফিক বাড়ছে, কাজেই এখান থেকে সরে যেতে হচ্ছে আমাদের। পরে কথা বলব আবার। দিস ইজ জিথ্রিকিউআরও মোবাইল, অফ অ্যান্ড ক্লিয়ার উইথ এইটি-এইট।'

রানার কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক উত্তর পাবার জন্যে অপেক্ষা করল সোহানা. তারপর রেডিওর সুইচ অফ করে দিল।

'এইটি-এইট কি?' জিজ্ঞেস করল আশরাফ।

'স্ট্যান্ডার্ড কোড—লাভ অ্যান্ড কিস-এর।' মারভিন লংফেলোর দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা।

'পেনিফিদার,' ক্লান্তকণ্ঠে বললেন বিএসএস চীফ। তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু ব্যারনেস ডফিন-এর বিশ লাখ ডলারের হীরে চুরি করেছিল পেনিফিদার দু'বছর আগে. কেসটা তিনি রানা ও সোহানাকে দিয়েছিলেন। সে-যাত্রা হীরে উদ্ধার

হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পেনিফিদার ধরা পড়েনি। তারপর থেকে একের পর এক অনেকগুলো অপরাধ ঘটিয়েছে পেনিফিদার, ব্রিটিশ পুলিস বা ইন্টারপোল তার টিকিটিও ছুঁতে পারেনি। পেনিফিদারের মত ক্রিমিন্যালদের সামলাবার কথা পুলিসের, কিন্তু তারা ব্যর্থ হওয়ায় উদ্বেগের মধ্যে আছেন তিনি।

'হ্যাঁ,' বলল সোহানা। 'আবার বাড়াবাড়ি শুরু করেছে সে।'

'ঠিক কি ঘটেছে বলুন তো?'

'অসুবিধের মধ্যে আছে রানা। সঙ্গে সঙ্গে কিউটিএইচ দেয়নি, তখনই আমি বুঝে ফেলি। তারপর পূর্ণিমার কথা বলল। পূর্ণিমা হলো বিপদ-এর কোড।' সীটের তলা থেকে ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ গাইড বের করে পাতা ওল্টাতে শুরু করল সোহানা।

'মেসেজ যখন পাঠাতে পেরেছেন, খুব একটা অসুবিধের মধ্যে নিশ্চয়ই নেই?' প্রশ্নের সুরে বললেন মারভিন লংফেলো।

'খুব নয়, জটিল। আরবী কোডে বললেও, অত্যন্ত সতর্ক ছিল রানা। ওর সঙ্গে অন্ধ একটা মেয়ে রয়েছে। পেনিফিদারের দু'জন শিষ্য তার বোনকে খুন করেছে, চেষ্টা করছে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নেয়ার। কারণটা জানা নেই রানার। পানামা সিটি থেকে এক ঘণ্টার পথ, একটা কটেজে লুকিয়ে আছে ওরা।'

গম্ভীর হলেন মারভিন লংফেলো। 'পেনিফিদার হাল ছাড়ার লোক নয়।'

'রানা তা জানে বলেই গা ঢাকা দিয়ে আছে। পানামায় আরও ক'টা দিন থাকার ইচ্ছে ওর, বলছে মেয়েটাকে বের করে আনার ব্যাপারে কারও সাহায্য পেলে ভাল হত—এমন কেউ হলে ভাল হয় যার কাভার অটুট আছে।'

'মি. রানার জায়গায় আমি হলেও এরকম সতর্ক হতাম বিশেষ করে পানামায়। ওঁর কাভার কি নষ্ট হয়ে গেছে?'

'ঠিক জানে না। বলছে, সম্ভবত।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মারভিন লংফেলো বললেন, 'দেরি হলে ড. জিমসনকে আমরা হয়তো পাব না।'

'আধ ঘণ্টা দেরি এমন কিছু নয়। হিথরো থেকে কাল সাড়ে আঠারো ঘণ্টায় যদি নিউ ইয়র্কের প্লেন ধরি, ওখান থেকে ডিসিএইট-এ চড়ে শনিবার সাড়ে উনিশ ঘণ্টায় পৌঁছুব পানামা সিটিতে।' মোটা বইটা বন্ধ করে স্টার্ট দিল সোহানা। 'অন্তত ড. জিমসনের কি বলার আছে শোনার সুযোগ পাব আজ—আর কাউকে যদি না পাওয়া যায়, পরে এক সময় যাবার প্রস্তাব দিতে পারি আমি।'

'মেয়েটাকে নিয়ে আপনি সরাসরি ইংল্যান্ডে চলে আসবেন?' জানতে চাইলেন মারভিন লংফেলো।

'তাই আসব বলে ভাবছি। এখানে নিরাপদ থাকবে সে।'

'তারপর?'

'তারপর মানে?' পাল্টা প্রশ্ন করল সোহানা।

'আমি আমার অন্যতম উপদেষ্টার কাছ থেকে পরামর্শ চাইছি—পেনিফিদারের কি হবে?'

'আপনার উপদেষ্টা এই মুহূর্তে ছুটিতে আছেন।'

'আনঅফিশিয়ালি পরামর্শ চাওয়ার রীতি কি উঠে গেছে?'

হেসে ফেলল সোহানা। 'পেনিফিদারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত যদি নিতেই হয়, নেবেন আপনার সিনিয়র উপদেষ্টা, মাসুদ রানা। তা-ও সম্ভবত মেয়েটাকে নিরাপদ জায়গায় আনার পর।'

'শেষ পর্যন্ত আমরা দেখছি একটা অ্যাসাইনমেন্ট পাব বলে মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল আশরাফ।

'তুমি আবার এরমধ্যে আসছ কিভাবে?'

'আমরা মানে তুমি বা তোমরা।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল আশরাফ। সামান্য অপমান বোধ করছে সে। সোহানা তাকে অকস্মাৎ দল থেকে বের করে দিয়েছে। দলে থাকার জন্যে জেদ ধরবে, সে সাহস নেই—পানামা থেকে মেয়েটাকে আনার সময় হয়তো গোলাগুলি হবে। কল্পনার চোখে মারামারি, খুনোখুনির দৃশ্য দেখল সে। ঘেমে গেল হাতের তালু। তবু মরিয়া হয়ে নিজের আত্মমর্যাদা রক্ষার চেষ্টায় বলল সে, 'কিন্তু ভেবে দেখো, সোহানা, পানামায় এমন একজনকে দরকার হবে তোমার, যার পরিচয় ফাঁস হয়নি। কি, ঠিক বলিনি?' মুখে যা-ই বলুক, মনে মনে নিজেকে গালাগাল দিচ্ছে আশরাফ—ছুটি কাটাতে এসে পৈত্রিক প্রাণটা হারাতে চাও নাকি, হাঁদারাম?

নিজের সীটে ঘুরে বসলেন মারভিন লংফেলো, একটা ভুরু কপালে তুলে মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'ওখানে কিন্তু কোন সেফটি-বেল্ট নেই।'

'ভেবেছেন আমি তা জানি না? তাহলে শুনুন, ভীতুর ডিম আমি একটা! কিন্তু সোহানার যদি এমন একজনকে দরকার হয়, যে মেয়েটাকে ছোঁ দিয়ে নিয়ে খিঁচে দৌড়াবে, প্রতিপক্ষের দৃষ্টি অন্য দিকে সরাবার জন্যে নিজে যাবে আরেক দিকে—আমার চেয়ে আদর্শ প্রার্থী আর পাবে ও?'

মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল সোহানা। 'ওর কথায় যুক্তি আছে। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, পালাবার ব্যাপারে আশরাফ ভারি ওস্তাদ।'

'মনে করিয়ে দেয়ার দরকার নেই,' গম্ভীর সুরে বলল আশরাফ। 'এমনিতেই আজ রাতে আমার ঘুম আসবে না। ভাল কথা, পানামায় যাবার ভিসা নেই আমার। জানি, তোমাদের পরিচিত নিশ্চয়ই এমন কেউ আছে⋯।'

'পানামায় যেতে ভিসা লাগে না। তবু ড্যানিয়েল কারভিনকে ফোন করতে হবে, মেয়েটার জন্যে খালি একটা ফর্ম চাইব।'

পাঁচ মিনিট পর বেইজওয়াটার রোড ছাড়িয়ে এল মার্সিডিজ, বাঁক নিয়ে একটা বাড়ির বাইরে থামল। হাত ধরে সোহানাকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করছে আশরাফ, ছোট ও সরু গলিটার শেষ মাথায়, সাদা দরজার সামনে একটা মূর্তিকে দেখতে পেল সে।

মুহূর্তের জন্যে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না আশরাফ। ভাল করে দেখার আগেই তার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল। অসম্ভব, একটা মানুষের শরীর এত বড় হয় কি করে! শুধু বিশাল তা নয়, আকৃতিটাও বেঢপ। আশরাফের মনে হলো, সে বোধহয় কোন ছায়া দেখছে। তারপর লোকটা নড়ে উঠল, হাত উঁচু করে দরজার গায়ে বসানো কলিংবেলের বোতামে চাপ দিল। চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল

আশরাফের, ভয়ে সিঁটকে গিয়ে উপলব্ধি করল ব্যাপারটা বাস্তব, চোখ বা আলোছায়ার কোন চাতুরি নয়।

লোকটা সম্ভবত সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। তার কাঁধ দুটো প্রায় দরজার মতই চওড়া ও চৌকো, সেটার ওপর বসে আছে বিশাল গোল একটা মাথা। দেখে মনে হলো ঘাড় বলে কিছু নেই। প্রকাণ্ড ধড় অসম্ভব লম্বা, ধড়ের নিচ থেকে বেরিয়ে আছে খাটো আকৃতির একজোড়া পা, এতই খাটো যে কল্পনা করা কঠিন হাঁটু বলে কিছু আছে কিনা। অথচ, ধড়টা এত লম্বা হওয়া সত্ত্বেও, হাত দুটো প্রায় হাঁটু ছুঁয়ে আছে।

বিতৃষ্ণার একটা ভাব জাগল আশরাফের মনে, যদিও পরমুহূর্তে মনে মনে লজ্জা পেল।

'পথ দেখাই,' শান্তভাবে বললেন মারভিন লংফেলো, সরু গলি ধরে পা বাড়ালেন। সোহানা তার হাত ধরছে না দেখে আশরাফই তার হাত ধরে মারভিন লংফেলোর পিছু নিল। দরজার সামনে দাঁড়ানো লোকটা ঘুরল ওদের দিকে। গাঢ় রঙের একটা স্যুট পরে আছে সে, আশরাফের মনে হলো ওটা দিয়ে সোহানার মার্সিডিজটাকে ঢেকে দেয়া সম্ভব। কোটটা অবশ্য কোথাও ঝুলে নেই। মাথায় প্রচুর চুল, রঙটা কালো বলেই মনে হলো। ম্লান চাঁদের মত লাগল মুখটাকে, সেটাও এত বড় যে মনে হয় কাঁধের ওপর দুটো মুখ জোড়া লাগানো হয়েছে। চোখ, নাক, ঠোঁট ও কান, একটার সঙ্গে আরেকটার আকৃতিগত কোন মিল নেই।

সমীহের সঙ্গে মাথাটা একটু কাত করল লোকটা, মারভিন লংফেলোকে বলল, 'আপনি কি ড. জিমসন, স্যার?' অত্যন্ত মার্জিত কণ্ঠস্বর, অভিজাত বংশের লোক না হলে উচ্চারণ ভঙ্গির মধ্যে এত বিশুদ্ধ ভাব আনা প্রায় অসম্ভব। আওয়াজটাও ভরাট। তার আকৃতি যে রোমহর্ষক একটা ব্যাপার, প্রায় কিম্ভূতকিমাকার, এ-ব্যাপারে সচেতন বলে মনে হলো না, অপ্রতিভ তো নয়ই।

'দুঃখিত, না,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'ড. জিমসনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি।'

'আমিও তাই এসেছি,' বলল লোকটা। 'উনি বাড়িতে আছেন বলে মনে হচ্ছে না।' চোখ ঘুরিয়ে সোহানা, তারপর আশরাফের দিকে তাকাল সে, চেহারায় বা চোখে কোন আগ্রহ ফুটল না। 'চারবার কলিংবেল বাজালাম। ভেতরে কোন আলোও দেখছি না।'

'বিশ মিনিট আগে তো ছিলেন, আমি যখন ফোন করি,' বললেন মারভিন লংফেলো, ভুরু জোড়া এক হলো। 'তাছাড়া, উনি জানেন আমরা আসছি।'

'আমি যে আসছি, তা-ও তো উনি জানেন,' লোকটার গলায় অস্বস্তির রেশ।

'একা থাকেন, হয়তো চিনি বা চা-পাতা কেনার জন্যে বেরিয়েছেন, এখুনি ফিরে আসবেন,' বলে, জোর করে হাসতে চেষ্টা করল আশরাফ। প্রকাণ্ড লোকটা তার দিকে তাকাল। হঠাৎ নিঃশব্দে হাসল সে। 'আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন। তবে আমার আর অপেক্ষা করা চলে না। আপনারা যদি ক্ষমা করেন...।'

বিশাল দেহটাকে যেতে দেয়ার জন্যে দু'পাশে সরে আসতে হলো ওদেরকে। মারভিন লংফেলো জানতে চাইলেন, 'কে এসেছিল বলব তাঁকে?'

'কেগান। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ডান কেগান। দয়া করে তাঁকে যদি জানান, কাল আমি ফোন করব, আমার খুব উপকার হয়। গুড নাইট।' সরু পথটা জুড়ে এগোল সে, পা দুটো অসম্ভব ছোট হওয়া সত্ত্বেও বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে বয়ে নিয়ে চলেছে বিশাল ধড়টাকে। গেট পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠল সে, বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'আপনার ড. জিমসনের বন্ধুদের বামুন বলা যাবে না,' বলল আশরাফ, দরজার দিকে এগোল। 'এখন আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি, সাধারণত সেটাকে অন্যায় বলে আখ্যায়িত করা হয়—কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি এটাকে অন্যায় বলে মনে করছি না।' ঝুঁকল সে, লেটার বক্সের ঢাকনি সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। 'বাহ্! এমন কেউ আছে নাকি যে লেটার বক্সের ভেতরকার অপূর্ব দৃশ্য দেখার জন্যে লালায়িত?' সোজা হলো সে, দেখল গলির শেষ মাথায় পৌঁছে উঁকি দিয়ে ডান কেগানকে দেখার চেষ্টা করছে সোহানা।

ফিরে এসে মারভিন লংফেলোকে বলল সে, 'আপনি ওকে চেনেন না, মানে এই চেহারার কোন বর্ণনা কখনও পাননি?'

'না।' সোহানার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন বিএসএস চীফ। 'কেন জানতে চাইছেন?'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা। 'ঠিক বলতে পারব না। বেলটা বাজাও, আশরাফ।'

'ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একটা আইটেম চারবার বাজিয়েছে।'

'বলল বটে। তর্ক কোরো না, চাপ দাও বোতামে।'

বোতামে চাপ দিল আশরাফ, দরজার গায়ে কান ঠেকাতে অনেক দূর থেকে বেল বাজার অস্পষ্ট আওয়াজ পেল সে। 'ভদ্রলোক সম্ভবত বাড়ির পিছনদিকে বাস করেন,' বলল সে। 'সেজন্যেই কোন আলো দেখা যাচ্ছে না।'

'হ্যাঁ, ঠিক,' জানালেন মারভিন লংফেলো। 'বেলটা কি বাজছে?'

'বাজছে।'

'এক মিনিট, আশরাফ,' আশরাফকে ছাড়িয়ে সামনে বাড়ল সোহানার একটা হাত। 'এটা তো দেখছি স্রেফ একটা ইয়েল লক,' বলল সে, কবাট আর চৌকাঠের ফাঁকে কয়েক সেকেন্ড ওঠা-নামা করল হাতটা। 'ঠিক আছে, এবার ধাক্কা দাও দেখি।'

আশরাফ ধাক্কা দিতেই খুলে গেল কবাট। অবাক হয়ে সোহানার দিকে তাকাল সে, দেখল সেলুলয়েডের একটা টুকরো হাতব্যাগের ভেতর ভরে রাখল ও। 'মানলাম এটা সিঁধ কাটার সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না, কিন্তু তবু কি কাজটাকে আইনসঙ্গত বলা যাবে?'

'এখনও বলা যাবে, যতক্ষণ আমরা কিছু চুরি না করি,' বলে মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল সোহানা। 'আমরা যদি ভেতরে অপেক্ষা করি, ড. জিমসন কিছু মনে করবেন?'

বিএসএস চীফ মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'দরজাটা যখন খোলা দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের আমি ভেতরেই বসতে বলব।' পথ দেখিয়ে ওদেরকে ভেতরে আনলেন

তিনি। ওপরদিকের কোথাও থেকে আলো আসছে, লম্বা প্যাসেজের শেষ মাথার কাছে তার আভা দেখতে পেল ওরা। সামনের দরজা বন্ধ করে দিল আশরাফ, মারভিন লংফেলো একটা সুইচ খুঁজে পেলেন। মাথার ওপর জোড়া ঝাড়বাতি জ্বলে উঠল। কার্পেট মোড়া একটা বড় হলঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। 'ওটা তাঁর স্টাডি,' ডানদিকের একটা দরজার দিকে হাত তুললেন মারভিন লংফেলো। 'আমার মনে হয় প্রথমে লিভিংরুমটা দেখা দরকার।' প্যাসেজ ধরে এগোলেন তিনি, শেষ মাথায় পৌঁছে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। সিঁড়িটা এখান থেকে ডান দিকে উঠে গেছে, নিচের দিকের কয়েকটা ধাপের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে ছোটখাট একটা মানুষ, পরনে বাদামী রঙের ঢোলা স্যুট। তার ঘাড় একটা হাতের তলায় অদ্ভুত ভঙ্গিতে মোচড় খেয়ে রয়েছে দেখে শিউরে উঠল আশরাফ। মেঝে আর তার কাঁধের ফাঁক থেকে বেরিয়ে রয়েছে একখানা ভাঙা চশমা।

আশরাফের তলপেটের ভেতর ঢেউ উঠল, বমি পেল তার। 'ইস-ইস-ইস্‌স্‌স্‌!'

ঝুঁকলেন মারভিন লংফেলো, একটা হাত সরিয়ে পড়ে থাকা মানুষটার মুখ দেখলেন, তারপর ছেড়ে দিলেন হাতটা। 'হ্যাঁ, উনি জিমসন,' মৃদুকণ্ঠে বললেন তিনি।

ঝুঁকে রয়েছে সোহানা, দুটো আঙুল দিয়ে ড. জিমসনের ঘাড়টা পরীক্ষা করছে। দশ সেকেন্ড পর সিধে হলো ও, গম্ভীর মুখে মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল।

হঠাৎ করে সোহানার ওপর অকারণ রাগ অনুভব করল আশরাফ। এক ঘণ্টা আগেও সবকিছু কি সুন্দর ছিল। সোহানা আসলে অমঙ্গল আর বিপদের প্রতীক। যেখানে যাবে, অঘটন না ঘটে পারে না। কাল তারা পানামার একটা পাগলা গারদের উদ্দেশে রওনা হবে। তা যেন যথেষ্ট নয়, এই মুহূর্তে পা পিছলে সিঁড়ি থেকে পড়া এক লোকের ক্যারোটিড আরটারি পরীক্ষা করছে ও। 'নিশ্চয়ই তুমি আশা করছ না উনি বেঁচে আছেন? কারও ঘাড় ভাঙলে সে কি আর বাঁচে?' ঝাঁঝের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল সে।

'নিশ্চিত হওয়া দরকার,' নরম সুরে বলল সোহানা।

আশরাফের অস্বস্তি আরও বাড়ল। নিজেকে কোনরকমে সামলে নিয়ে বলল, 'দুঃখিত। একটা অস্থিরতা পেয়ে বসেছিল আমাকে।'

মারভিন লংফেলো স্থির দাঁড়িয়ে আছেন, হাত দুটো জ্যাকেটের পকেটে। বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, চেহারা থেকে শোকের ছায়া লুকানোর কোন চেষ্টা নেই। 'অনেকদিন থেকেই জানতাম,তাঁর হার্টের অবস্থা ভাল যাচ্ছে না,' বলে সিঁড়ির ওপর দিকে তাকালেন। 'কিংবা হয়তো স্রেফ পড়ে গেছেন। চিরকালই তাঁকে আমি অস্থির, নার্ভাস দেখেছি।'

এগিয়ে এসে মারভিন লংফেলোর পাশে দাঁড়াল সোহানা, প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বাহুটা স্পর্শ করল একবার।

আশরাফের মনে পড়ল, ড. জিমসন মারভিন লংফেলোর বন্ধু ছিলেন। 'আমাদের বোধহয় কাউকে ফোন করা উচিত,' বিড়বিড় করল সে।

মুখ তুলে তাকালেন মারভিন লংফেলো। 'এখুনি নয়। আপনারা চলে যাবার

পর ওদিকটা সামলাব আমি।' সোহানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'অল্প সময়ে অনেক কাজ করতে হবে আপনাকে। গাড়ি নিয়ে স্রেফ সরে যান। এদিকের সব ব্যবস্থা আমি একা সামলাব।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'আমি দুঃখিত, মি. লংফেলো।'

'ফরগেট অ্যাবাউট ইট নাউ। অ্যান্ড টেক কেয়ার। প্লীজ।'

আবার মাথা ঝাঁকিয়ে আশরাফের কব্জি ধরল সোহানা। মাত্র দু'পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ঘাড় ফিরিয়ে মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল। 'কিছুই বলা যায় না, সময় করে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে একবার ফোন করলে ভাল হয়। খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার ওদের ওখানে ডান কেগান নামে কেউ আছে কিনা।'

চার

রাতের পোশাক পরে নিজের বিছানায় শুয়ে আছে জেনি উডহাউস, চোখ দুটো খোলা। নাইটড্রেসটা তাকে কিনে এনে দিয়েছে রানা। সুতি কাপড়, হাতে নরম লাগে, ফিটও করেছে খুব ভাল। রানা তাকে বলেছে, ওটার রঙ গোলাপী। ঠোঁটে লাজুক হাসি, জেনি ভাবল, মেয়েদের কাপড় কেনার ব্যাপারে মাসুদ রানার বোধহয় অভিজ্ঞতা আছে।

তিন দিন কেটে যাবার পর ছোট্ট কটেজটার কোথায় কি আছে সব জানা হয়ে গেছে জেনির। জুলিকে হারাবার প্রথম ধাক্কাটা ইতিমধ্যে কাটিয়ে উঠেছে সে। এ-ব্যাপারে রানার প্রতি কৃতজ্ঞ জেনি। মৌখিক সহানুভূতি নয়, ওর আশ্চর্য আচরণ একাধারে সেবা-শুশ্রূষা ও সান্ত্বনার কাজ করেছে। এ এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা তার। একজন মানুষ এত ভাল হতে পারে, জেনির কোন ধারণা ছিল না।

জেনির অন্ধত্ব যদি মনে কোন করুণার উদ্রেক করে থাকে, ভুলেও সেটা প্রকাশ করেনি রানা। অন্ধত্বের কারণে নিজেকে জেনি অসহায় ভাবে না, এটা লক্ষ করে রানার মনে যদি কোন প্রশংসার ভাব জেগে থাকে, সে-ব্যাপারেও কোন কথা বলেনি ও। আবার, জেনি যে অন্ধ, আলাপের সময় সেটা এড়িয়ে যাবার কোন চেষ্টাও রানার মধ্যে দেখা যায়নি। এসব কারণে ওর প্রতি কৃতজ্ঞ জেনি। তাকে, তার অন্ধত্ব সহ, স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে মানুষটা। ওর সঙ্গিনী অন্ধ, কথাটা মুহূর্তের জন্যেও ভোলে না—বাগানের কথা যখন তুলল জেনি, রানা তাকে জিজ্ঞেস করেনি ওটা দেখেছে কিনা, জিজ্ঞেস করেছে গন্ধটা পেয়েছে কিনা।

কটেজটা একতলা, টালির ছাদ, ইঁটের দেয়াল। প্যান-আমেরিকান হাইওয়ে থেকে কয়েক মাইল দূরে রয়েছে ওরা। কটেজ থেকে খানিক দূরে সরু একটা পথ আছে, গাছপালার আড়াল থাকায় দেখা যায় না। কটেজটা এক ভারতীয় দম্পতির, ভদ্রলোক কচ্ছপ আর মুক্তো রফতানি করেন ইংল্যান্ডে। তিন মাসের ছুটিতে ভারতে গেছেন তাঁরা, পূর্ব-পরিচয়ের সূত্র ধরে কটেজটা ভাড়া করেছে রানা দেড় মাস আগে, ঢাকা থেকে। কটেজে বেডরুম একটাই, লিভিংরুমটা অবশ্য বিরাট। ছোট

একটা কিচেন ও অফিস কামরা আছে এক ধারে। গ্যারেজটা পিছন দিকে, বাগানের পাশে। অফিস কামরায় একটা ক্যাম্প বেড ফেলেছে রানা নিজের জন্যে।

কটেজ ছেড়ে মাত্র একবারই বেরিয়েছে রানা, প্রথম দিন সকালে। গ্যারেজ থেকে পন্টিয়াক গাড়িটা বের করেনি, পোয়ের্টো দে কোরেরা পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিল, তারপর এক বোট রিপেয়ারার-এর কাছ থেকে একটা তোবড়ানো ভ্যান ভাড়া করে। শহরে গিয়ে চার ঘণ্টা পর ফিরে আসে। জেনির জন্যে কাপড়চোপড়, মেকআপ বক্স আর দশ দিনের মত প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র নিয়ে এসেছে। একটা পোলারয়েড ক্যামেরা আনতেও ভোলেনি। শুধু ওই চার ঘণ্টাই একা ছিল জেনি। কটেজের সামনের বাগানে বা উঠানে ঘোরাঘুরি করলেও, দূরে কোথাও যায় না রানা।

কটেজে বিদ্যুৎ, একটা ফ্রিজ ও টেলিফোন আছে। ফোনের সাহায্যে লন্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি রানা, কারণ পানামা সিটির এক্সচেঞ্জে যে-কোন ইন্টারন্যাশনাল কল রেকর্ড করা হয়। রানার অন্তত জানা আছে, দুই থেকে পাঁচ ডলার দিলেই যে-কেউ রেকর্ড করা কলটা শোনার সুযোগ পেতে পারে।

তবে পন্টিয়াকে ছোট একটা রেডিও আছে রানার। ইতিমধ্যে দু'বার, সন্ধের দিকে, গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বের করে লন্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ও। আজ কটেজের ভেতর ফেরার পর, রানা কিছু বলার আগেই, ওর খুশি খুশি ভাবটা অনুভব করতে পেরেছে জেনি। 'তুমি এত খুশি কেন?' জিজ্ঞেস করেছে সে।

'দু'তিন দিনের মধ্যে পানামায় পৌঁছে যাবে সোহানা।'

সোহানা চৌধুরী। মেয়েটা সম্পর্কে খুব কম কথাই তাকে বলেছে রানা। মনে মনে অবাক না হয়ে পারেনি জেনি। পানামা থেকে তাকে বের করে নিয়ে যেতে আসছে একটা মেয়ে!

ইতিমধ্যে মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। এখনও জেগে রয়েছে রানা, লিভিংরুমে কি যেন করছে একা একা। জেনির প্রখর কান মাঝে-মধ্যে নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে, কখনও বা মৃদু শিস দিচ্ছে রানা।

নিজের সঙ্গে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল জেনি, গায়ের চাদর সরিয়ে নেমে পড়ল বিছানা ছেড়ে। বিছানার পাশে চেয়ারের পিঠে রেখেছে হাউজ-কোটটা, হাত বাড়িয়ে নিল সেটা। কয়েক মিনিট পর দরজা খুলে ঢুকে পড়ল লিভিংরুমে।

মুখ তুলে রানা দেখল, পরিচিত ভঙ্গিতে চৌকাঠের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনি, চোখের দৃষ্টি ওর সামান্য পাশে, মাথাটা একদিকে কাত হয়ে আছে মনোযোগ দিয়ে শোনার ভঙ্গিতে। লক্ষ করল, ঠোঁটে সামান্য লিপস্টিক মেখেছে জেনি। 'তুমি ঘুমাওনি?' জিজ্ঞেস করল ও। 'কিছু দরকার?'

'না। কেন জানি না অস্থির লাগছে।'

'খুব গরম পড়েছে।'

'তা পড়েছে। তবে সেজন্যে না। এক কাপ কফি খাবে নাকি, রানা?'

'খেতে পারি।' কফি বানাবার বা সাহায্য করার প্রস্তাব না দিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল রানা ফার্নিচারগুলো ঠিক জায়গামত আছে কিনা। ওর দিকে মুখ

তুলে নিঃশব্দে হাসল জেনি, কামরার ভেতর দিয়ে সোজা হেঁটে গেল কিচেনের দিকে।

প্রথম যেদিন কটেজে এল ওরা, ঠোঁট সরু করে মৃদু শিস দিয়েছে জেনি, শোনা যায় কি যায় না, তারপর এক ঘর থেকে আরেক ঘরে হাঁটাহাঁটি করেছে ধীরে ধীরে; কান দুটো সজাগ ছিল প্রতিধ্বনি শোনার জন্যে, সামনে কোন বাধা থাকলে অনায়াসে পাশ কাটিয়ে গেছে সেগুলোকে। তার এই কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছে রানা। এই মুহূর্তে কিচেনে যাচ্ছে জেনি, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা, মনটা দুঃখে ভরে উঠল। সারা জীবন অন্ধ থাকার কথা কল্পনা করা আলোক-বর্ষ দূরত্ব কল্পনা করার মতই অসম্ভব একটা ব্যাপার বলে মনে হয় ওর কাছে। চোখ বুজে চিন্তা করল, এই চোখ আমি যদি আর কখনও খুলতে না পারি, কেমন হবে সেটা?

কিচেন থেকে জেনির শব্দ ভেসে আসছে। ফ্রিজ খুলল সে, স্টোভে কেটলি বসাল। কোন জিনিস ধরার জন্যে দু'বার চেষ্টা করতে হয় না তাকে, প্রথমবারই সেটা খুঁজে নিতে পারে, যদি আগের জায়গায় থাকে জিনিসটা। এ-ব্যাপারে খুবই সতর্ক রানা।

'তুমি থেমে আছ কেন?' কিচেন থেকে জানতে চাইল জেনি। 'এক ঘণ্টা ধরে কি যেন চাঁচছিলে।'

'না, ভাবছি,' বলে চোখ মেলল রানা, হাতের কাদা মাখানো শুক্তিটার দিকে তাকাল। 'তোমার কান দুটো রাডার বললেও কম বলা হয়।'

'অত বড়?'

'যেভাবেই হোক ছোট করে নিয়েছ।' এক কি দু'বার চোখ মিটমিট করল রানা, টেবিলের ওপর তাকিয়ে আছে। টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে কয়েক ধরনের সেকরার ফাইল—চ্যাপ্টা ও চৌকো, কর্কশ ও মসৃণ; একটা ছুরি, সিরিশ কাগজ, হরিণের চামড়া, রুবি পাউডার আর লেন্স। ছুরিটা তুলে নিয়ে বাদাম আকৃতি কর্কশ ও দাগপড়া মুক্তোটাকে গোল করার কাজে মন দিল আবার। দু'কাপ কফি নিয়ে ফিরে এল জেনি। কাপ দুটো টেবিলে রেখে একটা চেয়ারে বসল সে, রানার উল্টোদিকে।

'ধন্যবাদ, জেনি।'

'রাত জেগে কি করছ তুমি, রানা?' জানতে চাইল জেনি। 'কি চাঁচছ?'

'মুক্তো। ঠিক মুক্তো বলা যায় না, প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল বলতে পারো জিনিসটাকে। প্র্যাকটিসের জন্যে মন্দ নয়।'

'কি প্র্যাকটিস করছ?'

'বেশিরভাগ মুক্তোর জন্যে একজন বিউটি স্পেশ্যালিস্ট দরকার, বুঝলে—তা সেটা দেখতে যতই চটকদার, গোল বা ফোঁটা আকৃতির হোক। কোনটা হয়তো টোল খাওয়া, কোনটা ফুলে আছে, কিংবা হয়তো রঙ সব জায়গায় এক রকম নয়। তবে মুক্তো আসলে রসুনের মত, কয়েক স্তর চামড়া আছে। তুমি হয়তো পঁয়তাল্লিশ গ্রেন ওজনের একটা মুক্তো পেলে, কিন্তু দেখতে সুন্দর নয়। ঘষে চেঁচে যখন ওটার ওজন দাঁড়াল ত্রিশ গ্রেন, দেখা গেল ভারি সুন্দর হয়েছে দেখতে। যদিও কাজটা জটিল। কোথাও যদি সামান্য ভুল করো, হাজার ডলার হারালে,

হাতে থাকল খানিকটা খড়িমাটি।'

'আবার বলো, হাজার ডলার।'

'কেন?'

'শুনতে ভাল লাগল। বলো না!' আবদার ধরল জেনি।

'কেন, হাজার ডলার কেন, বরং লাখ ডলার বলি, শুনতে আরও ভাল লাগবে।'

'টাকাটা নয়, শুনতে ভাল লাগল তোমার উচ্চারণটা। বেশ, তারমানে, মুক্তো তুমি খুব ভালবাস?'

'বাসি। পাথরের চেয়ে ভাল লাগে। মুক্তোর মধ্যে জ্যান্ত একটা ব্যাপার আছে না!'

'তুমি বুঝি সংগ্রহ করো?'

'মাঝে মধ্যে, যদি সময় পাই। পালোটায় গিয়েছিলাম বিশেষ ধরনের কিছু পাবার আশায়। চল্লিশ গ্রেনের এখনও একটা দরকার আমার।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল জেনি, রানার কাজ করার শব্দ শুনছে। অলস একটা চিন্তা এল মাথায়, ইতিমধ্যে যদি জুলির লাশ বা ওদের খালি বোটটা পুলিস পেয়ে থাকে তাহলে ধরে নেয়া হয়েছে, সে-ও মারা গেছে। শুধু রানা আর ওর বান্ধবী সোহানা জানে যে সে বেঁচে আছে। না, জার্কাও জানে। সে অবশ্য মুখ খুলবে না। আর জানে পেনিফিদার।

তার মনে হলো, অদ্ভুত, অবাস্তব একটা চরিত্র এই পেনিফিদার, অবাস্তব কিন্তু ভীতিকর। পেনিফিদারকে কোন সুযোগ দিতে চাইছে না রানা, এটা বুঝতে পেরে আরও আতঙ্কবোধ করছে সে। পেনিফিদার কেন তাকে চায়, এই চিন্তাটা এখন আর তার মাথায় ঘন ঘন আসে না। তাকে ভয়-করে বটে, কিন্তু এ-ও জানে যে তার উদ্ধার কর্তা ও আশ্রয়দাতা তাকে প্রাণ দিয়ে হলেও রক্ষা করবে। হঠাৎ করে তার জীবন ও জগৎটা এই ছোট্ট কটেজের ভেতর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, যেখানে সে আর মাসুদ রানা ছাড়া তৃতীয় কোন প্রাণী নেই। কেন যেন নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী মনে হলো তার। গোটা অস্তিত্ব জুড়ে অদ্ভুত একটা তৃপ্তিবোধ ছড়িয়ে রয়েছে। প্রচণ্ড আঘাত, আতঙ্ক ও শোকের পরও শান্তচিত্তে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে সে, সময় যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সোহানা চৌধুরী এসে লন্ডনে নিয়ে যাবে তাকে। রানা বলেছে, তার জন্যে সেটাই সবদিক থেকে ভাল হবে, কাজেই রাজি হয়েছে সে। পাসপোর্টটা হারিয়ে গেছে, তবে রানা বলেছে এ-ব্যাপারে তাকে চিন্তা করতে হবে না।

'সোহানা চৌধুরী কি তোমার গার্লফ্রেন্ড?' হঠাৎ জানতে চাইল জেনি।

গলার স্বর বদলে গেলে জেনি বুঝতে পারে হাসছে রানা, এই যেমন এখন। রানা বলল, 'গার্ল অ্যান্ড ফ্রেন্ড, হ্যাঁ। গার্লফ্রেন্ড, না। আমরা একসঙ্গে কাজ করি।'

'কি কাজ?'

'সে অনেক লম্বা কাহিনী, জেনি। না জানাই তোমার জন্যে নিরাপদ।'

'তবু আমি শুনতে চাই।'

'বেশ, পরে কোন এক সময়।'

'আজ রাতে?'

'রাত অনেক হয়েছে, জেনি। তুমি শোবে না?'

'তাহলে কাল?'

'ঠিক আছে, কাল। তুমি শোবে না?'

'না। আমার ঘুম আসবে না।'

জেনির দিকে তাকিয়ে রানা দেখল, কোঁচকানো ভুরু ধীরে ধীরে নিভাঁজ হলো। জেদের ভাবটাও অদৃশ্য হলো চেহারা থেকে। কৌতুক বোধ করল ও। মেয়েটা রোগা-পাতলা, সুন্দরী, বয়স কম, অন্ধ এবং নানা দিক থেকে অসহায় ও দুর্বল, কিন্তু তাসত্ত্বেও আশ্চর্য একটা দৃঢ়তা আছে। একটা ফাইল তুলে নিয়ে হালকাভাবে কাজ শুরু করল ও, আঙুলের মাথায় ধরা মুক্তোটা ঘষছে।

'তারমানে কি তোমার কোন গার্লফ্রেন্ড নেই, রেগুলার গার্লফ্রেন্ড?' আবার জানতে চাইল জেনি।

'না। ইররেগুলার হয়তো আছে, রেগুলার নেই।'

'আমিও তাই ধারণা করেছি।'

'কেন, কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা, তারপর প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'আহ্-হা!'

'কি ব্যাপার?' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল জেনি।

'ঠিক বুঝতে পারছি না। মুক্তোটা ফেটে গেল।' লেন্সটা তুলে চোখে ঠেকাল রানা। মুক্তোর কর্কশ গায়ে চুলের মত সরু রেখাটা পরিষ্কার দেখা গেল। ওটা আসলে একটা ফাটল। ফাইলটা আলতো-ভাবে ছোঁয়াল একবার, ফাটলটা সামান্য চওড়া হলো। এবার ছুরিটা তুলে নিল রানা, ফলার ডগাটা সতর্কতার সঙ্গে ফাটলের মাঝখানে ঠেকাল। হঠাৎ করে দু'ফাঁক হয়ে গেল জিনিসটা, ভেতর থেকে কি যেন একটা খসে পড়ল। খপ করে ধরে ফেলল রানা, তা না হলে পড়ে যেত মেঝেতে। আবার যখন কথা বলল, ওর গলা থেকে নিখাদ উল্লাস ঝরে পড়ল। 'গড। ইট'স আ পার্ল! অদ্ভুত সুন্দর একটা মুক্তো, জেনি। কোথাও কোন ত্রুটি নেই। বাজে একটা মুক্তোর ভেতর থেকে অমূল্য একটা রত্ন বেরিয়ে এসেছে!'

'কিভাবে?' জেনি বিস্মিত।

'আমি যেটার ওপর কাজ করছিলাম সেটার ভেতর ছিল।' জেনি শুনতে পেল চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা, টেবিল ঘুরে এগিয়ে আসছে। 'নাও, ধরে দেখো।' জেনির হাতটা তুলে নিয়ে তালুর ভেতর গুঁজে দিল জিনিসটা। অপর হাতে আঙুল দিয়ে অনুভব করল জেনি। 'মুক্তো সম্পর্কে আমি কিছু জানি না, তবে বেশ বড়ই তো মনে হচ্ছে, রানা।'

'চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ গ্রেন। অনেস্ট টু গড, ঠিক এই জিনিসটাই খুঁজছিলাম আমি।'

'খুব দামী বুঝি?'

'অমূল্য কিছু নয়। সাড়ে সাতশো থেকে হাজার ডলার হতে পারে। তবে ঠিক এই রকম একটা কিছুই খুঁজছিলাম আমি।' রানার গলায় উত্তেজনা, লক্ষ করে জেনিও উল্লাস বোধ করছে।

'আমার ভারি ভাল লাগছে, রানা। নাও।' মুঠো খুলে হাতটা রানার দিকে লম্বা করল জেনি। 'ভাল লাগল, আবার তুমি হাজার ডলার উচ্চারণ করায়।'

'যতবার চাইবে ততবার উচ্চারণ করব, জেনি। তুমি আমার জন্যে সৌভাগ্য বয়ে এনেছ।'

'খুশি লাগছে। তোমাকে যে ঝামেলার মধ্যে ফেলেছি···।'

জেনির কাঁধে হাত রাখল রানা। 'এ-ধরনের ঝামেলা কাঁধে নেয়া আমার শুধু পেশা নয়, জেনি, নেশাও। এ-যাত্রায় তোমার মত সুন্দর একটা ঝামেলা ঘাড়ে চাপায় আমি বরং নিয়তির ওপর কৃতজ্ঞ।'

'সত্যি বলছ? সুন্দর?' রানার গলার দিকে মাথাটা ঘোরাল জেনি।

'না, শুধু সুন্দর বললে তোমার ওপর অবিচার করা হবে। তুমি একটা ফুল, জেনি। আমি চাই নিদ্রাদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে ফুলটা যেন তাজা থাকে। গো অন, অফফ্ ইউ গো।'

লক্ষ্মী মেয়ের মত চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল জেনি, বেডরুমের খোলা দরজার দিকে এগোল। 'নিদ্রাদেবীর আশীর্বাদ বুঝি তোমার দরকার নেই?'

'কাপগুলো ধুয়ে টেবিলটা পরিষ্কার করব, তারপর আমিও শুয়ে পড়ব।' কিচেন থেকে ফিরে এসে রানা দেখল, এখনও দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনি, মগ্ন হয়ে কি যেন চিন্তা করছে। রানার সাড়া পেয়ে বলল, 'রানা, এদিকে একটু আসবে?'

'কি ব্যাপার?'

'কিছু না। এসো না! এখনও তোমার কোন মুখ নেই।'

'আমার···কি নেই?' সাবধানে এগোল রানা।

'তুমি বেশ লম্বা চওড়া, জানি আমি; তোমার ভেতরটা কেমন, তা-ও আমি জেনেছি। কিন্তু এখনও আমি তোমার কোন ছবি তৈরি করিনি—করিনি, কারণ ভেবেছিলাম যখন ছবিটা তৈরি করব, তাতে কোন খুঁত থাকবে না। এসো, আমার সামনে এক মিনিট দাঁড়াও।'

জেনির হাত দুটো রানার বুক ছুঁলো, তারপর দ্রুত উঠে এল ওপর দিকে। রানা কোন কথা বলল না। মুখের ওপর প্রজাপতির কোমল স্পর্শ, আঙুলগুলো নড়ছে, সরছে। অপ্রতিভ ও বিব্রত বোধ করল ও। আঙুলের ডগা দিয়ে চোয়ালের কিনারা, ভুরু, কান, নাক, ঠোঁট, একে একে সবই স্পর্শ করল জেনি। চোখ বুজে আছে সে, চেহারায় গভীর মনোযোগের ছাপ।

'কি মনে হয়, নিদ্রাদেবীর আশীর্বাদ পেলে এর কোন উন্নতি হবে?' আড়ষ্ট হেসে জিজ্ঞেস করল রানা। 'নাকি প্লাস্টিক সার্জারি দরকার?'

হাত দুটো নিচে নামাল জেনি। 'কালো চোখ, কালো চুল?'

'ঠিক ধরেছ। বুঝলে কিভাবে?'

'আমার অনুমান প্রায়-সময় ঠিক হয়।' চোখ খুলে মাথাটা একটু তুলল জেনি, তারপর আবার হাত দুটো উঁচু করে ওর ঘাড়ের পিছনে আটকাল। শান্ত অথচ আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলল সে, 'আমাকে ভালবাসো, রানা।'

এভাবে কখনও চমকায়নি রানা। হতভম্ব হয়ে পড়ল ও, জেনির দৃষ্টিহীন

চোখের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেল, কারণ ওর হার্টবিট বেড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হলো!'

'আপত্তি কিসের? কোন শর্ত তো নেই। নেই কোন বাঁধন।'

'প্রশ্ন সেটা নয়...'

'তাহলে আপত্তি কিসের? অন্য কোন মেয়ের অধিকার চুরি করছি আমি?'

'না...।'

'তাহলে বুঝি ভাবছ, আনাড়ি মেয়ে, ব্যাপারটা আনন্দময় হবে না? তা হয়তো হবে না, কারণ সত্যিই আমি আনাড়ি। কিংবা তুমি আসলে সাংঘাতিক দয়ালু হয়ে পড়েছিলে আমাকে সুন্দর একটা ফুল বলার সময়?'

'না, তা সত্যি নয়।'

'তাহলে কি? ভাবছ, একটা সুযোগ নেয়া হবে? অন্ধ, অসহায় একটা মেয়ের কাছ থেকে কিছু চুরি করা হবে?'

'তা-ও নয়, জেনি। আসলে, আমি কোন কারণ দেখাতে পারব না। আমার শুধু মনে হচ্ছে, এটা উচিত নয়। পবিত্র যে-কোন একটা জিনিসের কথা কল্পনা করো—সেটার প্রতি তুমি মুগ্ধ হতে পারো, সেটাকে ভালবাসতে পারো, শ্রদ্ধা করতে পারো, কিন্তু উপভোগ করতে পারো না। তোমাকে আমার পবিত্র বলে মনে হয়েছে, জেনি। বলিনি—ফুল?'

'কিন্তু আমি যদি বলি, তোমার কাছে পবিত্র থাকার কোন ইচ্ছে আমার নেই?'

'সেটা হবে তোমার ছেলেমানুষি, আমার মনোভাবের প্রতি গুরুত্ব না দেয়া। চলো, জেনি, তোমাকে আমি শুইয়ে দিয়ে আসি।'

'সত্যি তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করছ?' জেনির গলায় রাগ নয়, বিস্ময়।

'তোমাকে নয়, জেনি, নিজেকে।'

'নিজেকে তোমার বঞ্চিত মনে হচ্ছে না?'

'হচ্ছে না বললে মিথ্যে বলা হবে, তবে তারচেয়ে বেশি নিজেকে নিয়ে আমার গর্ব হচ্ছে।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল জেনি, তারপর বলল, 'আশ্চর্য স্বার্থপর লোক তো তুমি। এ আমি কাকে সাধছিলাম! আশা করছ তোমার মনোভাবের প্রতি গুরুত্ব দেব আমি, কিন্তু আমার মনোভাবের কথা ভাবতে রাজি নও! একটা মেয়ে নিজেকে অফার করছে, ইডিয়েট ছাড়া কেউ তা প্রত্যাখ্যান করে?'

'রাগ করার ষোলো আনা অধিকার তোমার আছে,' বলল রানা। 'তোমার রাগটাকে আমি অসঙ্গতও বলতে পারি না। কিন্তু সত্যি আমি অক্ষম।'

'আক্ষরিক অর্থে?' জেনির গলায় তীব্র ব্যঙ্গ।

'আমি ক্ষমা চাই,' বলল রানা। 'তোমার সাথে কথায় পারব না।'

'মনে রেখো, তুমি আমাকে অপমান করেছ। আমার নারীত্বের অসম্মান করেছ।' প্রায় কেঁদে ফেলল জেনি।

অসহায়বোধ করল রানা, কি বলবে ভেবে পেল না। ইচ্ছে হলো জেনির মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনার সুরে কিছু বলে, কিন্তু সাহস হলো না, সহানুভূতি দেখালে জেনি হয়তো কেঁদেই ফেলবে।

রানার ঘাড় থেকে হাত দুটো নামিয়ে ওর দিকে পিছন ফিরল জেনি। 'আমি একাই শুতে পারব,' বলে বেডরুমের ভেতর ঢুকল সে, দরজাটা ভেতর থেকে ঠেলে দিল। রানার মুখের সামনে আধ খোলা হয়ে থাকল কবাট দুটো। দেখল, সোজা এগিয়ে গিয়ে বিছানায় উঠল জেনি। শুয়ে পড়ল। দরজার দিকে মুখ। চোখ বন্ধ।

তাকিয়ে থাকতে পারল না, দরজার সামনে থেকে পালিয়ে এল রানা।

বিছানায় শুয়ে থাকল ও, ঘুম আসছে না। বেশ কিছুক্ষণ আগে বেডরুমের আলো নিভিয়ে দিয়েছে জেনি। তবে তার নড়াচড়ার আওয়াজ পাচ্ছে ও, সে-ও ঘুমাতে পারছে না। ওর একবার ইচ্ছে হলো তার বিছানার পাশে গিয়ে বসে, কিছু বলে শান্ত করে আসে। কিন্তু সাহস হলো না, এবার অবশ্য অন্য কারণে–পুরুষমানুষ, অনেক সময় নিজেকেও বিশ্বাস করতে নেই, জানে রানা।

হঠাৎ সংবিৎ ফিরল পায়ের শব্দে। বেডরুম থেকে বেরিয়ে সোজা ওর ক্যাম্প খাটের পাশে এসে দাঁড়াল জেনি। 'তাহলে বলে দাও তোমার ঋণ আমি শোধ করব কিভাবে!' স্পষ্ট কণ্ঠে, সরাসরি জানতে চাইল সে। 'আমি কারও কাছে ঋণী থাকতে পছন্দ করি না।'

মনে মনে পরম স্বস্তিবোধ করল রানা। ওর অনুমান তাহলে মিথ্যে নয়। নিজেকে জেনি ওর হাতে তুলে দিতে চাইছিল প্রতিদান হিসেবে। শারীরিক চাহিদা নয়, আকস্মিক উথলে ওঠা প্রেমও নয়, কারণটা ছিল ঋণ শোধের চেষ্টা।

'ঋণ তোমার হলো কখন যে শোধ করতে চাইছ?'

'আমাকে তাহলে ওদের হাত থেকে কে বাঁচাল?'

'যে বাঁচিয়েছে সে মানুষ বলে বাঁচিয়েছে, বাঁচিয়েছে নিজের স্বার্থে–তা না হলে তার বিবেক তাকে ক্ষমা করত না!'

'বাপরে-বাপ! মানুষ কত রকমই না স্বার্থপর হয়! তারমানে আমাকে রক্ষা করাটা বড় কথা ছিল না? বড় কথা ছিল নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী হতে না চাওয়াটা?'

হেসে ফেলল রানা, উঠে বসল বিছানার ওপর। 'আমি তো আগেই বলেছি, কথায় তোমার সাথে আমি পারব না।'

অন্ধকার কামরা, রানা অনুভব করল জেনি ওর একটা হাত ধরল। 'এসো, রানা।'

হাতটা ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা। 'কোথায়?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল ও।

'আমার বেডে,' বলল জেনি। 'ভয় নেই–না আমার, না তোমার।'

'মানে?'

'তোমার দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হবার কোনই সম্ভাবনা নেই, এ-কথা জানার পর কেন তোমাকে আমি এই ক্যাম্প বেডে কষ্ট করতে দেব? এসো, তুমি আমার সাথে শোবে। দু'জনেই ঘুমাতে পারছি না, দেখা যাক পরস্পরকে আমরা এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি কিনা। নাকি তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না?'

রানা চুপ করে থাকল। কি করবে বা কি বলবে ভাবছে।

'আমি মেনে নিয়েছি, রানা,' মৃদুকণ্ঠে বলল জেনি। 'মানুষ সম্পর্কে আমার

ধারণা তুমি বদলে দিয়েছ। বিশ্বাস করো, তুমি ফিরিয়ে দেয়ায় আমি দুঃখ পাইনি। এ সম্পূর্ণ নতুন একটা অভিজ্ঞতা, আমি উপভোগ করছি—এমন পুরুষও দুনিয়ায় আছে, যার কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ আমি। এসো!'

বাধ্য ছেলের মত জেনির সাথে বেডরুমে চলে এল রানা। পাশাপাশি শুয়ে গল্প করে কাটিয়ে দিল অনেকক্ষণ। তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল দু'জনেই

ঝকঝকে ক্রোম পিলারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে কালো কাঁচে মোড়া হোটেল অ্যামব্যাসাডর। পানামা সিটির পুব প্রান্তে, শহরের শেষ মাথায় হোটেলটা, বছরের এই সময় অতিথির সংখ্যা খুবই কম। পাঁচতলার একটা স্যুইটে রয়েছে ওরা, কান থেকে ফোনের রিসিভার নামিয়ে লিভিংরুমে চলে এল ক্রনেল ম্যাকার্থি

একটা আর্ম চেয়ারে বসে রয়েছে টমাস পেনিফিদার, পরস্পরকে জড়িয়ে থাকা দশটা আঙুলের ওপর চিবুক। নিস্তেজ গলায় বলল সে, 'পরিস্থিতি।'

পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করল ক্রনেল, বহুল ব্যবহারে চামড়ার কভারটা নরম হয়ে গেছে। নোটবুকের পাতা ওল্টাল সে। 'প্রেসকে কাল সকালে জানানো হয়েছে, একজন জেলে খালি বোট, আরেকজন জেলে লাশটা দেখতে পেয়েছে। তার অন্ধ বোনকে পাওয়া যায়নি, কাজেই ধরে নেয়া হয়েছে ডুবে মারা গেছে সে, লাশটা ভেসে গেছে স্রোতে। পানামা থেকে বেরিয়ে যাবার সমস্ত পথে আমাদের লোক রাখা হয়েছে, ভাড়াটে লোকদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মেয়েটাকে খুঁজে বের করার। আজ পর্যন্ত খরচ হয়েছে সাতচল্লিশ হাজার সাতশো ছাপ্পান্ন ডলার, পেমেন্ট বাকি আছে এগারো হাজার দুশো ডলার···।'

'রানার ও মেয়েটার, দু'জনের চেহারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে ওদেরকে?'

'হ্যাঁ। বস্, এখনও আপনি বিশ্বাস করেন যে রানাই···?'

'শুধু বিশ্বাস করি না, জানি।' নিষ্প্রাণ চোখ ঘুরিয়ে ক্রনেলের দিকে তাকাল পেনিফিদার। 'রানাও জানে যে এটার পিছনে আমরা কাজ করছি। ইয়টে আমাদেরকে নিশ্চয়ই দেখেছে সে। প্রতিপক্ষ আমরা বলেই মেয়েটাকে নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।'

গম্ভীর হলো ক্রনেল। 'আপনার কি ধারণা, আমাদের পিছু নিয়ে ওখানে গিয়েছিল রানা?'

'না। যোগাযোগটা এমনিই ঘটে গেছে বলে আমার ধারণা,' বলে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল পেনিফিদার। 'তবে এ এক সময় ঘটতই।'

তাকিয়ে থাকল ক্রনেল, চোখে কৌতূহল, ভাবছে। ভাগ্যে বিশ্বাস করে না পেনিফিদার, অথচ রানা ও সোহানার ব্যাপারে তার অন্ধ বিশ্বাস, ওদের সাথে আবার একবার বাধবে, নিজেদের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্যে তার কাছে ছুটে আসতে হবে ওদেরকে। ওদের প্রতি তার সীমাহীন ঘৃণাই নিয়ন্ত্রিত করবে ভাগ্যের চাকাকে।

বসের এই বিশ্বাসের কোন মূল্য এতদিন ক্রনেল দেয়নি, কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, ইচ্ছেটা বোধহয় পূরণ হবে। ক্রনেল নিজেও ওদের দু'জনকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। আজ হঠাৎ করে সেটা যেন উথলে উঠল, মনের চোখ দিয়ে দেখতে পেল

ভাঙা হাড়গোড় নিয়ে পড়ে আছে মাসুদ রানা, একটা লাশ। আর সোহানা, ক্ষতবিক্ষত, শুয়ে আছে রক্তের পুকুরে...

ভাবনার সূত্র ধরে কথাটা মনে পড়ে গেল ক্রনেলের। মুখ খোলার আগে জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল সে, চোখ থাকল পেনিফিদারের ওপর। 'এইমাত্র যে ফোনটা এল। লন্ডন থেকে, বস্। দৈত্য। ড. জিমসনের সাথে দেখা করেছে সে।'

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিচের পার্ক ও পার্কিং লটের দিকে তাকিয়ে আছে পেনিফিদার। পার্কিং লট প্রায় ফাঁকা, রাস্তাতেও কোন গাড়ি বা মানুষজন নেই। 'তাকে তুমি জানিয়েছ, মেয়েটাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল ক্রনেল, তারপর বলল, 'হাসল।'

'তার হাসারই কথা।' জানালার দিকে পিছন ফিরল পেনিফিদার, ম্লান চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে আকস্মিক তিক্ততায় জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'কারণ সে একটা পাগল। তার কাছে গোটা ব্যাপারটাই যেন একটা খেলা। তবে পরিস্থিতি সব সময় তার অনুকূলে থাকে, কিভাবে বলতে পারব না। পাগল, তবে লাকি।'

ক্রনেলের গলার ভেতর থেকে গম্ভীর একটা আওয়াজ বেরুল, যেন সমর্থন করল পেনিফিদারকে। 'বলছিল, শেষ পর্যন্ত বোধহয় তাকে এসেই কাজটা করতে হবে। আমি বলেছি—না।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল পেনিফিদার। 'আর কিছু?'

'আপনি বলছেন পানামায় রানার উপস্থিতি কাকতালীয় ব্যাপার। আরেকটা ঘটনা ঘটেছে। জিমসনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে খুব মজা পায় আমাদের দৈত্য, কারণ বেরুতেই তার সাথে সোহানা আর বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলোর দেখা হয়ে যায়।'

'হোয়াট!'

'হ্যাঁ, শুনে আমিও চমকে উঠেছিলাম।' নোটবুকের পাতা ওল্টাতে শুরু করল ক্রনেল। 'জিমসন' লেখা একটা পৃষ্ঠায় চোখ রাখল সে। 'জিমসন মারভিন লংফেলোর পুরানো বন্ধু ছিল। আমরা জানতাম, জিমসন খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, সেজন্যেই তাকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ভিক্টর ক্যানিং যদি তার কথায় কান না-ও দিয়ে থাকে, মারভিন লংফেলো নিশ্চয়ই দিত।'

'আর সোহানা?'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্রনেল। 'ওরা অনেক দেরি করে পৌঁছায়। কিছু জানতে পেরেছে বলে মনে হয় না। আর যদি অনুমান করে নেয়, সমস্যাটা দৈত্যের, আমাদের নয়।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' পেনিফিদারকে সন্তুষ্ট মনে হলো ক্রনেলের। 'ভাল কথা, ইন্টারন্যাশনাল কলগুলো চেক করছ তো?'

'লোক মারফত চেক করা হচ্ছে। রানা কল করেনি তা বলছি না, তবে লগে আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই।'

'তুমি একটা গাধা, ক্রনেল। গাধা আমিও। রানার কলে আমাদের জন্যে

গুরুত্বপূর্ণ কিছু থাকবে না, এ তো জানা কথা। নিশ্চয়ই সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করেছে সে। সে জানে, মেয়েটাকে আমরা চাইছি; জানে, তাকে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা হাল ছাড়ব না। এ-ও জানে, পানামা থেকে বেরিয়ে যেতে হলে কারও সাহায্য দরকার তার, একার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ক্রনেলের দিকে তাকিয়ে থাকল পেনিফিদার।

'কাজেই···?' শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যে শব্দ খুঁজছে ক্রনেল।

'কাজেই তাকে সাহায্য করার জন্যে পানামায় আসছে সোহানা। তোমাকে আমি আগেও বলেছি, আমার সন্দেহ ওরা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট—আন্ডারকাভার এজেন্ট।'

'হ্যাঁ, বলেছেন। কিন্তু এখন তাহলে···।'

'আমরা নজর রাখব এয়ারপোর্টের ওপর, গাধা। সোহানা আমাদেরকে রানার কাছে নিয়ে যাবে।' পেনিফিদারের চোখে উল্লাস। 'তোমার লোকদের বলো, আরও কড়া নজর রাখুক এয়ারপোর্টের ওপর।'

ক্রনেলের মুখে হাসি ফুটল, নিষ্ঠুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। নোটবুক বন্ধ করে দরজার দিকে ছুটল সে।

পাঁচ

কাস্টমস হল থেকে বেরিয়ে এসে আশরাফ চৌধুরী দেখল সূর্য অস্ত যাচ্ছে, কোথাও লাল কোথাও গোলাপী হয়ে আছে আকাশ। ঘামে চটচট করছে তার গা। ভ্যাপসা গরমে দম বন্ধ হবার জোগাড়। দুটো সুটকেস তার, পোর্টার বহন করছে। ঘাড় ফিরিয়ে জানতে চাইল লোকটা, 'কোন হোটেলে উঠছেন, স্যার?'

'সান্তা মারিয়া, ক্যালে টোরেলা।'

'ভেরি গুড, স্যার।'

ওদের সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। সুটকেস দুটো ভেতরে তুলে দিল পোর্টার। তার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে ট্যাক্সিতে উঠতে যাবে আশরাফ, এক সেকেন্ড ইতস্তত করল, ভাবল পিছন দিকে একবার তাকাবে কিনা।

তার পিছনে কোথাও আছে সোহানা, অন্তত থাকার কথা। কিন্তু তাকে নিষেধ করে দিয়েছে, ভুলেও যেন ওর দিকে না তাকায় সে। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে এক সঙ্গে বেরোয়নি ওরা, হিথরো এয়ারপোর্টে পৌঁচেছে আলাদাভাবে। একই প্লেনে, বোয়িং সাতশো-সাত-এ চড়ে সাত ঘণ্টা উড়ে এসেছে ওরা। তবে বসেছিল আলাদা জায়গায়। আশরাফ ট্যুরিস্ট ক্লাসে, সোহানা ফার্স্ট ক্লাসে।

আশরাফের খুশিও লাগছে না, আবার মনে কোন আশঙ্কাও নেই। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে অবাস্তব লাগছে। ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল সে, পিছন ফিরে তাকাল না। বিশ ফুট সামনে একটা পুলিস কার দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভেতরে ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোক, একজনকে অফিসার বলে মনে হলো। এয়ারপোর্টের বাইরে

পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। প্রচুর গাড়ি আসছে যাচ্ছে, লোকজন সবাই খুব ব্যস্ত। এমন কোন লক্ষণ নেই যা দেখে সন্দেহ হবে এখানে কারও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। অবশ্য ব্যস্ত লোকজনের মধ্যে ভদ্রবেশী সশস্ত্র গুণ্ডারা থাকলে চেনা সম্ভব নয়। আছেও তাই। পুলিস কার-এর আশপাশেই চারজন লোক রয়েছে, দু'দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে তারা। মাসুদ রানা, সোহানা চৌধুরী ও অন্ধ জেনি উডহাউস কি রকম দেখতে, তারা জানে।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল, ব্যাকসীটে হেলান দিল আশরাফ, ভাবছে কে জানে আবার কবে এয়ারপোর্টে ফেরত আসতে পারবে সে। কাল? এক হপ্তা পর?

সোহানা অবশ্য তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে না। 'ওখানে তোমার কাজ, শিক্ষা দফতরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তোমার লেখা অঙ্ক বই নিয়ে আলোচনা। তবে পৌঁছুবার পরপরই পেটের অসুখ বাধিয়ে ফেলবে, যাতে হোটেল ছেড়ে কোথাও বেরুতে না হয়। হয়তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে, কিংবা হয়তো অল্প ক'টা দিন।'

ট্যাক্সির গতি বাড়ছে। রিহার্সেল হিসেবে মুখটা বিকৃত করল আশরাফ, পেটের দিকে একটা আঙুল তাক করল।

আরও প্রায় সাত মিনিট পর এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল সোহানা, পিছনে ট্রলি নিয়ে একজন পোর্টার রয়েছে। জিনস্ আর জ্যাকেট পরে আছে সে, হাতে বড়সড় হ্যান্ডব্যাগ। ফুটপাথে পা দিয়েছে মাত্র, পুলিস কার-এর দরজা খুলে গেল, দীর্ঘদেহী একজন অফিসার বেরিয়ে এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। অফিসারের পরনে লাইটওয়েট অলিভ-গ্রীন ইউনিফর্ম, কোমরে হোলস্টার। মুখটা সরু, চোখ দুটো মাছের মত ঠাণ্ডা, ঠোঁটের নিচে গোঁফ যেন ঠিক একজোড়া শুঁয়োপোকা। পথরোধ করে দাঁড়ালেও, গম্ভীরভাবে সোহানাকে স্যালুট করল সে। বলল, 'মিস সোহানা চৌধুরী?'

'ইয়েস।'

'আপনি আমার সঙ্গে এলে খুশি হব, প্লীজ,' বলল অফিসার, ইংরেজিটা ভালই বলে। 'আমি ক্যাপ্টেন মিগুয়েল হার্মিটেজ, পানামা সিটি পুলিস।'

তাকিয়ে থাকল সোহানা, চেহারায় সামান্য রাগ। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার সঙ্গে আমাকে যেতে হবে কেন?'

'এর আগেও আপনি পানামায় এসেছেন, তাই না, মিস সোহানা?'

'হ্যাঁ, এসেছি—চার কি পাঁচ বছর আগে।'

'হ্যাঁ, আমাদের রেকর্ডও তাই বলে, মিস সোহানা। সেবার এখানে আপনি থাকার সময় কিছু একটা ঘটেছিল, কিছু অনিয়ম হয়েছিল। আবার যখন আপনাকে পাওয়া গেছে, ব্যাপারগুলো আমরা তদন্ত করে দেখতে চাই।'

'আই সী।' কয়েক মুহূর্ত অনড় দাঁড়িয়ে থাকল সোহানা, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'খানিক পরে গেলে হয় না, আমি হোটেলে ওঠার পর? হিলটনে উঠছি আমি…।'

'আপনাকে এখুনি আমাদের সঙ্গে যেতে হবে, মিস সোহানা, প্লীজ। হোটেলে ওঠার ব্যাপারটা…,' কাঁধ ঝাঁকাল পুলিস অফিসার। 'তদন্ত শেষ হতে বেশ ক'টা

দিন সময় লাগতে পারে।'

সোহানা বলল, 'আমি একটা ফোন করতে চাই।'

'দুঃখিত। সম্ভবত পরে কোন এক সময়। গাড়িতে উঠুন, প্লীজ।'

রিপোর্ট করার জন্যে পেনিফিদারের বেডরুমে আসছে ক্রনেল, ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে তার।

জ্যাকেট খুলে বিছানায় শুয়ে রয়েছে পেনিফিদার, হাত দুটো মাথার পিছনে, চোখদুটো আধবোজা।

'সোহানা পৌঁচেছে,' ক্রনেল বলল, 'কিন্তু পুলিস তাকে এয়ারপোর্ট থেকে গ্রেফতার করেছে। কয়েক বছর আগে এখানে কি যেন করে গিয়েছিল, সেজন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অভিযোগ নিশ্চয়ই খুব গুরুতর, তা না হলে গ্রেফতার করত না। পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে কখন তাকে ছাড়বে বলা কঠিন। ওখানে একজন লোককে দাঁড় করিয়ে রেখেছি আমি।'

বালিশের ওপর কনুই রেখে মাথাটা উঁচু করল পেনিফিদার। 'সোহানা আমাদেরকে পথ দেখাবে, কাজেই তাকে আমাদের দরকার। খানিকটা তেল ঢালো, বের করে আনো তাকে।'

'ও শালার নাম মিগুয়েল হার্মিটেজ, বানচোতকে কেনা যাবে না,' বলল ক্রনেল। 'আমরা আরও বড় কোন অফিসারকে ধরতে পারি, কিন্তু হার্মিটেজ মহা বজ্জাত, এভাবে সময় লাগবে অনেক বেশি।'

বিছানার পাশে এক্সটেনশন ফোনটা বেজে উঠল। পেনিফিদার মাথা ঝাঁকাতে রিসিভারটা তুলল ক্রনেল। অপরপ্রান্ত থেকে আমেরিকান উচ্চারণে কথা বলল কেউ। ক্রনেল বলল, 'হ্যাঁ, বলো, নিকেল।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে শুনল সে, তারপর বলল, 'অপেক্ষা করো।' তাকাল পেনিফিদারের দিকে, হাতচাপা দিল মাউথপিসে। উত্তেজনায় চকচক করছে চেহারা। 'নিকেল একটা সূত্র পেয়েছে, নেহাতই ভাগ্যগুণে। কোস্ট-এর একটা বোর্ডইয়ার্ডে ইয়ট নিয়ে গিয়েছিল সে। সেদিন রাতে বালিতে ঘষা খেয়েছে ইয়টের খোল, কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা দেখতে চেয়েছিল সে। ওখানে একটা লোকের সঙ্গে কথা হয় তার। লোকটা এক বিদেশীর গল্প শোনায়। পোয়ের্টো দে কোরেরার পিছন দিকে একটা কটেজে থাকছে বিদেশী। দেখে মনে হয়, ভারতীয়।'

'পানামায় কয়েক হাজার ভারতীয় বসবাস করছে,' বলল পেনিফিদার।

'এই লোকটা বেশ লম্বা, একহারা গড়ন, গায়ের রঙ প্রায় ফর্সা—হাতের উল্টোদিকে একটা কাটা দাগ আছে, দেখতে অনেকটা এস হরফের মত।' ক্রনেল দেখল, ধীরে ধীরে বিছানার ওপর উঠে বসছে পেনিফিদার। 'লোকটা গা-ঢাকা দিয়ে আছে, বস্। তার একটা গাড়ি আছে, তবু পানামা সিটিতে যাওয়ার জন্যে বোটইয়ার্ড থেকে একটা ভ্যান ভাড়া করে সে। কয়েকদিন আগের ঘটনা, বস্। লোকটা আদিবাসীদের মত কাপড় পরে।'

পেনিফিদারের চোখের রঙ দ্রুত কয়েকবার বদলাল। 'নিকেলকে বলো, ভালভাবে চেক করে দেখুক। কটেজটা কোথায় জানতে হবে, নজর রাখতে হবে

করে নিয়ে যেতে এসেছি আমি। আমরা চলে গেলে মি. রানাও চলে যাবেন। মি. রানার পিছু পিছু পেনিফিদারও চলে যাবে।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ। 'অফিসের সময় অনুসারে, আমার ডিউটি শেষ হয়ে গেছে। এখন যদি কোন কাজ করে দিই আপনার, সেটা হবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে।' ইঙ্গিতে ফোনটা দেখাল সে। 'নিন, ফোন করুন।'

ফোন বেজে উঠতেই স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে রানা বলল, 'সোহানা!' শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল জেনির। জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন সময়টার ইতি ঘটতে যাচ্ছে। সময়টা খুব বেশি নয়, আটচল্লিশ ঘণ্টার কিছু বেশি, কিন্তু এরই ভেতর আনন্দের যে প্রাচুর্য ছিল তা আর জীবনে কখনও পাবে বলে বিশ্বাস হয় না, কারণ এই একই পরিবেশ আর কোন দিন ফিরে আসতে পারে না।

পরিবেশ। প্রথমে আতঙ্ক ও শোক, তারপর নিরাপত্তা ও বিশ্বাস। জেনি উপলব্ধি করেছে, মাসুদ রানা মানে হলো পরম নির্ভরতা ও দুর্ভাবনাহীন নিরাপত্তা। রানা ওর কোমলস্বভাব ও ভদ্র আচরণ দিয়ে জয় করে নিয়েছে জেনির মন। তার অন্ধকার জগতে এমন একটা আলো জ্বেলে দিয়েছে ও, যে আলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না। এই আলো তাকে সারা জীবন পথ দেখাবে।

ফোনের রিসিভার তুলে অপেক্ষা করছে রানা, অপরপ্রান্ত থেকে কে কথা বলে শুনতে চায়। তারপর ওর গলা পেল জেনি, 'হ্যাঁ, সোহানা।' থামল একটু, তারপর বলল, 'হ্যাঁ। না, এখন পর্যন্ত কোন লক্ষণ দেখছি না।' পরের বিরতিটা দীর্ঘ হলো। একবার মৃদু শব্দে হাসল ও। সবশেষে বলল, 'ঠিক আছে, আমরা তৈরি হয়ে থাকব।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে রানা দেখল, ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে জেনি। কাছে এল ও, লম্বা কাউচের ওপর জেনি যেখানে বসে রয়েছে। তার একটা হাত ধরল ও। 'আমরা আজ রাতেই রওনা হব, জেনি।'

জোর করে হাসার চেষ্টা করল জেনি। 'সোহানা ফোন করেছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ।' বসল রানা, জেনির কাঁধে একটা হাত রাখল। রানা যে মাত্রা ছাড়িয়ে খুশি হয়ে উঠেছে, বুঝতে পারছে জেনি। খানিকটা ঈর্ষা বোধ করছে সে। 'একটা গাড়ি নিয়ে ঠিক সাড়ে ন'টায় আসবে ও। তারমানে আর দু'ঘণ্টা পর।'

'তাহলে তোমার গাড়িটার কি হবে?'

'শহরের গ্যারেজে পেনিফিদার খোঁজ নিয়ে থাকতে পারে, হয়তো জেনে ফেলেছে ওটা আমি কোত্থেকে কিনেছি। গাড়ির নাম, মডেল, নাম্বার ইত্যাদি জানা থাকলে তার লোকেরা ওটা খুঁজবে।' মৃদু স্বরে হাসল রানা। 'একটু ভয় ছিল, ওরা হয়তো এয়ারপোর্ট থেকে সোহানার পিছু নেবে। কিন্তু সোহানা বুদ্ধি করে সরাসরি এখানে আসেনি, উঠেছে পুলিস স্টেশনে—এমনভাবে সাজানো হয়েছে ব্যাপারটা, দেখে মনে হবে ওকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

'সোহানা আসার পর কি ঘটবে?' জানতে চাইল জেনি।

'ক্যালে টোরেলার একটা হোটেলে নিয়ে যাওয়া হবে তোমাকে। আশরাফ

চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক দুটো কামরা ভাড়া করেছে ওখানে—একটা নিজের জন্যে, অপরটা তার বন্ধুর জন্যে। তার বন্ধু পরে উঠবে হোটেলে, নাম বব রিগ্যান। মানে তুমি।'

'আমি? বব রিগ্যান? কিভাবে?'

'ছেলে হিসেবে চালানো হবে তোমাকে,' বলে হাসল রানা। 'প্যান্ট-শার্ট আর টুপি আগেই কিনে এনেছি আমি।'

'তুমি জানলে কিভাবে সোহানা আমাকে ছেলে বানিয়ে···'.

'ধারণাটা আমার, সোহানার নয়। ফোনে আগেই তাকে জানিয়ে-ছিলাম আমি।'

'কিন্তু আমার পাসপোর্টের কি হবে?'

'ফর্ম আর স্ট্যাম্প সাথে করে এনেছে সোহানা। এখন দরকার শুধু একটা ফটো, সেজন্যে ক্যামেরাও কিনে রেখেছি। তোমাকে প্যান্ট-শার্ট পরিয়ে ছবিটা তুলে ফেলব এবার। হোটেলে ঢুকে খাতায় সই করতে পারবে তো, কাউকে বুঝতে না দিয়ে যে তুমি অন্ধ?'

'খানিকটা সাহায্য করলে পারব। লবিতে ঢোকার সময় কেউ হাত ধরে থাকলেই হবে, সই করার সময় রেজিস্টারে একটা আঙুল থাকলে ভাল হয়। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে না?'

'না। গাড়ি থামলে তোমার সঙ্গে আশরাফের দেখা হবে। সে-ই তোমাকে নিয়ে হোটেলের ভেতর ঢুকবে।'

ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল জেনি, তারপর বলল, 'তুমি থাকো, রানা। তুমি আমাকে বোঝো। আশরাফ চৌধুরীর অভিনয় মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে, আমি জানি। অন্ধ কাউকে সাহায্য করতে এলে সব মানুষই বাড়াবাড়ি করে ফেলে।'

'প্রতিপক্ষ আমাকে চেনে, জেনি। ওরা আমাকে খুঁজছে। আশরাফ সাথে থাকলে তোমার কোন ভয় নেই। খুব বুদ্ধিমান লোক সে। রাডার অ্যান্টেনার মত সেনসিটিভ।'

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল জেনি। 'ঠিক আছে। তারপর কি ঘটবে?'

'দু'জনেই তোমরা ঘরের ভেতর থাকবে। খাওয়াদাওয়া, নাস্তা, সব ভেতরে। কামরা দুটোর মাঝখানে দরজা থাকবে, কাজেই গল্প করতে পারবে তোমরা।'

'আমি জানতে চাইছি তোমার কি হবে? তোমার আর সোহানার।'

'সেটা ঠিক এখুনি বলা যাচ্ছে না,' বলল রানা। জেনি অনুভব করল, রানা হাসছে। নিশ্চিত হবার জন্যে একটা হাত তুলে পরীক্ষা করল সে। নিজের ঠোঁটের ওপর জেনির আঙুলগুলোকে স্পর্শ করতে দিল রানা। ব্যাপারটায় ইতিমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ও।

'কেন, বলা যাচ্ছে না কেন?' জেনির গলায় খানিকটা অভিমান, খানিকটা জেদ।

'এমন হতে পারে শহরের এখানে-সেখানে মুখ দেখাব আমি। পেনিফিদারের লোকজন আমার পিছু নেবে। হয়তো আটক করারও চেষ্টা করব। তবে আমার ওপর নজর থাকবে সোহানার। কাজটা সহজ, কারণ তারা জানে সোহানা এখনও

পুলিস স্টেশনে আটকে আছে। উই প্লে কাউন্টার-টাইম···

'মানে?'

'সরি। ফেনসিং টার্ম। প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার জন্যে প্ররোচিত করবে তুমি, যাতে ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা আঘাত হানার সুযোগ পাও। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পেনিফিদারের লোকজনকে পাগল বানিয়ে ছাড়ব আমরা, বেশ কয়েকজনকে অচল করে দেব। পরিস্থিতি শান্ত হলে আশরাফকে ফোন করব। বন্ধুকে নিয়ে হোটেল ছাড়বে সে, এয়ারপোর্টে গিয়ে পরবর্তী প্লেন ধরবে। আগামী চারদিনের প্রতিটি ফ্লাইটে একজোড়া করে সীট বুক করা হয়েছে। তোমরা চলে যাবার পর বাকি কাজটুকু শেষ করার জন্যে এখানে আরও দু'চারদিন থেকে যেতে পারি আমরা।'

'কিন্তু সব যদি সুষ্ঠুভাবে না ঘটে? ওরা যদি তোমাকে গুলি করে?'

'গুলি তো করতেই পারে, তবে আমরা সাবধান থাকব।' দাঁড়াল রানা, জেনির হাত ধরে দাঁড় করাল। 'চলো, বাথরুমে ঢুকি। তোমার চুল নিয়ে ঝামেলা আছে।'

'আমার চুল? মানে?'

'কেটে ছোট করতে হবে।'

'সর্বনাশ! আমার এত সুন্দর চুল কেটে ফেলতে হবে?'

'ছোট করতে হবে।'

'কে ছোট করবে, তুমি? এত কিছু জানো?'

'জানতে হয়েছে। সোহানা আমাকে শিখিয়েছে।'

এক সেকেন্ড চুপ করে থাকল জেনি, তারপর বলল, 'রানা···আমার ওপর রাগ কোরো না। জানি, তোমার সোহানার প্রতি আমার কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত। কিন্তু কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, তাকে আমি ঠিক পছন্দ করতে পারব না।'

'পছন্দ করতেই হবে, এমন কোন কথা তো নেই,' অমায়িক হেসে বলল রানা। 'আগে তাকে দেখো, তারপর নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ো। চলো এবার।'

আধ ঘণ্টা পর পিঠ উঁচু একটা চেয়ারে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসল জেনি, চোখ খোলা, ঝলসে উঠল ফ্ল্যাশ, কয়েকটা ফটো তুলল রানা। জেনির চুল ছেলেদের মত করে কেটেছে ও, পরিপাটি করে আঁচড়েও দিয়েছে। ফোম রাবারের দুটো টুকরো ছিল মুখের ভেতর ফটো তোলার সময়, ফলে মুখের আকৃতি বদলে যায়। তৃতীয় প্রিন্টটা নিখুঁত হলো, একটা এনভেলাপে ভরে রাখল রানা।

'প্যাডগুলো বের করে ফেলো,' বলল রানা। 'নিজের কাছে রেখে দাও, হোটেলে ঢোকার সময় আবার লাগবে।'

পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ মিনিট জিনিসপত্র গোছগাছের কাজে ব্যস্ত থাকল রানা। জেনির জিনিসপত্র একটা সুটকেসে ভরে তালা লাগাচ্ছে, হঠাৎ কান দুটো সজাগ হয়ে উঠল। পরিষ্কার কিছু শুনতে পেয়েছে, তা নয়। তবু কেন যেন খুঁতখুঁত করে উঠল মনটা। ছোট অফিস কামরায় ঢুকল ও, আলো নিভিয়ে জানালার সামনে দাঁড়াল, পর্দাটা আধ ইঞ্চি সরিয়ে উঁকি দিল বাইরে। গাছপালার ভেতর দিয়ে চলে গেছে সরু পথটা, অন্ধকার গ্রাস করে রেখেছে। কোথাও কিছু নড়তে দেখা গেল না।

কিচেনে চলে এল রানা। বাইরে উঁকি দিল। বাড়ির পিছন দিকেও দেখার কিছু নেই। লিভিংরুমে ফিরে এসে দেখল, দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনি, ওর দিকে মুখ। চাপা গলায় জানতে চাইল সে, 'কি ব্যাপার, রানা?'

'সম্ভবত কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। 'তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ?'

সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে শোনার চেষ্টা করল জেনি। প্রায় এক মিনিট পর বলল, 'না। প্রতিটি শব্দ স্বাভাবিক লাগছে। তবে আমার ধারণা কাছাকাছি মানুষ আছে। খুঁতখুঁত করছে মনটা।'

'আমারও।'

'সোহানা নয়তো?'

'সময়ের অনেক আগে হয়ে যায়। আমার ধারণা, ওরা আমাদেরকে খুঁজে পেয়েছে। চিন্তা কোরো না, জেনি।' ঝাড়া দশ সেকেন্ড নড়ল না রানা, চিন্তা করল কি করবে। 'এখানে শান্ত হয়ে বসো তুমি,' অবশেষে বলল ও। 'গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বের করে সামনের উঠানে আনছি আমি।'

'না, রানা! তোমাকে আমি বেরুতে দেব না! ওরা তোমাকে গুলি করবে!'

'এখুনি করবে না, জেনি। আমি এখানে আছি, ওরা জানে। কিন্তু জানে না যে তুমিও এখানে আছ। আমাকে খুন করার আগে নিশ্চিত হতে চাইবে ওরা।'

'ওরা...ওরা তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে!'

'পড়বে না। পেনিফিদারের লোক হলে পড়বে না।' শার্টের বোতাম খুলল রানা।

'কেন?'

'কারণ আমাকে ওরা চেনে,' সহজ সুরে বলল রানা, কোন গর্ব নেই। শার্টের ভেতর, সুন্দর দেখতে ছোট্ট দুটো ছুরি খাপসহ বুকের বামদিকে সেঁটে রয়েছে। রানার বোতাম খোলার সূক্ষ্ম শব্দ ঠিকই শুনতে পেয়েছে জেনি। ছুরি দুটোর অস্তিত্ব সম্পর্কে আগে থেকেই সচেতন সে, এই মুহূর্তে শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে এল। 'তাছাড়া,' বলল রানা, 'আরও সহজ একটা সুযোগ দিচ্ছি ওদেরকে আমি। কি করতে হবে মন দিয়ে শোনো।'

দু'মিনিট পর, বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে জেনির, দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে সে। গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বের করে কটেজের সামনে আনল রানা, মৃদু শিস দিচ্ছে, শান্তভাবে বারান্দা হয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। নিজের ব্যাগ দুটো তুলে নিল ও, আবার বেরিয়ে এল। গাড়ির পিছনে রাখল ওগুলো। গাড়ির অফ-সাইড কটেজের দিকে, দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট বারান্দার কাছাকাছি। হেডলাইট জ্বলছে, এঞ্জিন সচল, সামনের দুটো দরজা সম্পূর্ণ খুলে রেখেছে রানা বারান্দায় হলুদ একটা আলো জ্বলছে, আলোকিত করে রেখেছে উঠানটা।

কটেজের ভেতর ফিরে এল রানা, আলো নেভাল, জেনির হাত ধরে বেরিয়ে এল হলে। বারান্দায় বেরুবার আগে বারান্দার আলোটা নেভাল। হঠাৎ করে অন্ধকার হয়ে গেল কটেজের সামনেটা। বারান্দায় বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগাল রানা। স্বাভাবিক গলায় বলল, 'চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।'

শরীরটা কাঁপছে জেনির, তাকে নিয়ে গাড়ির অপর দিকে চলে এল রানা, ফিসফিস করে বলল, 'কোন ভয় নেই। ওরা অন্তত তোমার কোন ক্ষতি করবে না।'

প্যাসেঞ্জার সীটে জেনি উঠে বসতেই দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা, তারপর অত্যন্ত দ্রুত অফ-সাইড দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। সীটের ওপর দিয়ে সাপের মত দরজা দিয়ে বেরিয়ে রানার পায়ের ওপর চলে এল জেনি গাড়ির ভেতর তাকিয়ে রানা বলল, 'সব ঠিক আছে?' ইতিমধ্যে গাড়ি ও কটেজের মধ্যবর্তী ছোট্ট জায়গাটা পেরুতে শুরু করেছে জেনি।

ছোট্ট, অন্ধকার বারান্দার এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে থাকল মেয়েটা। ইতিমধ্যে গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করেছে রানা।

দ্রুত ছুটল রানার পন্টিয়াক, কাঁকর ছড়ানো পথে একবার হড়কে গেল চাকা। গাড়ি-পথের সামনে হঠাৎ করে লাফ দিয়ে পড়ল একটা মূর্তি, গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। হাতে একটা টর্চ, গাড়ি থামাবার জন্যে এদিক ওদিক নাড়ছে আলোটা। গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিল রানা। একেবারে শেষ মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠে আরেক লাফে পথ থেকে সরে গেল মূর্তিটা। তিন সেকেন্ড পর চওড়া রাস্তার ওপর উঠে এল পন্টিয়াক।

অন্ধকার বারান্দায় এখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে জেনি, হাতের ভাঁজে মুখটা ঢাকা, ঠিক যেভাবে ঢেকে রাখতে বলেছে তাকে রানা। কটেজের চাবিটা তার ডান হাতের মুঠোর ভেতর। পন্টিয়াকের গর্জন শুনতে পেল সে, তারপর বিভিন্ন দিক থেকে নানারকম শব্দ ভেসে এল। কাঁকর ও ঘাসের ওপর ছুটন্ত পদশব্দ। তার মাত্র কয়েক ফুট দূর দিয়ে কে যেন ছুটে গেল। দাঁতে দাঁত চাপল কেউ, অশ্রাব্য একটা গালি দিল আরেকজন। আরেকটা গলা পেল জেনি, উচ্চারণ শুনে মনে হলো আমেরিকান। লোকটা হাসল, তারপর বলল, 'গাড়ির ভেতর নিজেই আটকা পড়েছে বাছাধন, আমার জানামতে সঙ্গে কোন আর্মস নেই!' পায়ের আওয়াজ ও গলার শব্দ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল। কাছাকাছি কোথাও থেকে একটা গাড়ি স্টার্ট নিল। এঞ্জিনের জোরাল আওয়াজ শুনে জেনি বুঝল, পন্টিয়াককে ধাওয়া করে ধরে ফেলবে ওরা। রানার জন্যে আতঙ্কবোধ করল সে। কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়াল, চাবি ঢোকাল কী হোলে।

ছয়

'ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না,' বললেন মারভিন লংফেলো, ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা আইডেনটিকিট ছবিটার ওপর আরেকবার চোখ বুলালেন। ড. জিমসনের দরজায় যে দৈত্যাকার লোকটাকে দেখা গিয়েছিল, যে-রাতে উনি মারা গেলেন, এ তারই ছবি—আঁকা হয়েছে, মিলটা সহজেই ধরা পড়ে চোখে।

রাত প্রায় দেড়টা, ঘুমিয়ে আছে লন্ডন শহর। নিজের ক্লাবে একটা পর্যন্ত ব্রিজ

খেলেছেন বিএসএস চীফ, তারপর বাড়ি ফেরার পথে হোয়াইট হল অফিসে একবার ঢুঁ মারতে এসেছেন। তাঁর সহকারী, রবার্ট নেলসন, আজ রাতের ডিউটি অফিসার। 'মোটেও ভাল ঠেকছে না,' আবার বললেন মারভিন লংফেলো।

'ডান কেগানকে আপনি সন্দেহ করছেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করল নেলসন, কোন রকম উদ্বেগ তাকে স্পর্শ করেনি।

'ডান কেগান নামে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কেউ নেই।'

'বলছেন লোকটা প্রকাণ্ড। আপনার ধারণা ড. জিমসন সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যাননি, এই প্রকাণ্ড লোকটা তার ঘাড় মটকে দিয়েছে?'

'মেট্রোপলিটান পুলিস বলছে অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ।' হেঁটে জানালার সামনে চলে এলেন মারভিন লংফেলো, হোয়াইটহলের দিকে তাকালেন। 'ফ্রেজার আমাকে দিয়ে আইডেনটিকিট ছবিটা তৈরি করাল, বলল লোকটাকে খুঁজে বের করা হবে। কিন্তু মুখে যাই বলুক, তাকে খুব সিরিয়াস বলে মনে হয়নি।'

'তাহলে কি করার আছে আমাদের?'

'কেসটা আমাদের নয়, পুলিসের,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'কিন্তু পুলিস যদি আগ্রহ না দেখায়? এদিকে পানামা থেকে সোহানা চৌধুরীর ফিরতে এখনও দেরি আছে।'

'উনি বোধহয় পেনিফিদারের একটা ব্যবস্থা না করে ফিরবেন না,' বলল নেলসন। 'বিশেষ করে ওঁর সঙ্গে যখন মি. রানার দেখা হচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো, নেলসন কি বলছে সেদিকে তেমন খেয়াল নেই। আপনমনে চিন্তা করছেন তিনি। চিন্তা করছেন একটা লোকের কথা। কেমন লোক সে, যার শরীরটা হাতির মত? তার নার্ভ কি ইস্পাত? ঠাণ্ডা মাথায় একজন মানুষকে খুন করল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করছে, এই সময় দেখল একটা গাড়ি এসে থামল, তবু এতটুকু নার্ভাস হল না! অপ্রত্যাশিত বিপদের মধ্যে হাসল লোকটা। সকৌতুকে হাসল। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। ভীতিকর রকম অস্বাভাবিক। 'তুমি ঠিকই বলেছ, পানামা থেকে আগে ওরা ফিরে আসুক, তারপর সিদ্ধান্ত নেব কি করা যায়,' অন্যমনস্কভাবে বললেন তিনি।

কটেজের পিছন দিকে, ছায়ার ভেতর, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা নারীমূর্তি। সোহানা।

ভাড়া করা টয়োটা চোখের আড়ালে, রাস্তায় রেখে এসেছে ও। কটেজের কোন জানালায় আলো নেই দেখে বুঝতে পারছে খারাপ কিছু ঘটেছে।

কালো শোল্ডার ব্যাগ থেকে এমএবি অটোমেটিকটা বের করল সোহানা, সাবধানে সামনে বাড়ল। ক্যাপ্টেন হার্মিটেজের অফিসে কাপড় বদলেছে ও। কোঁকড়ানো সুতি কাপড়ের কালো শার্ট পরেছে, সঙ্গে ফুলে থাকা গাঢ় রঙের স্কার্ট ও মোকাসিন। স্কার্টের এক দিকে চেইন লাগানো, টান দিলেই ফাঁক হয়ে যাবে।

কটেজের পিছন দিকের দরজায় এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল সোহানা, অন্ধকার পরিবেশটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে নিজেকে, অনুভূতি দিয়ে বুঝতে চাইছে আশপাশে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। বিপদের কোন আভাস পেল না। ঠোঁট সরু

করে মৃদু শিস দিল একবার। প্রথমবার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আবার শিস দিল ও। এবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা শিস ভেসে এল কটেজের ভেতর থেকে।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থাকল সোহানা। দশ সেকেন্ড পর দরজায় টোকা পড়ল মৃদু। প্রথমে তিনবার, তারপর দু'বার। অটোমেটিকের বাঁট দিয়ে প্রথমে একবার, তারপর ঘন ঘন দু'বার টোকা দিল সোহানা। দরজায় চাবি ঢোকাবার আওয়াজ হলো। এক মুহূর্ত পর খুলে গেল কবাট।

রানা নয়, একটা মেয়ে। দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল, উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে সে।

'কোন ভয় নেই। আমি সোহানা চৌধুরী,' বলল ও। একপাশে সরে দাঁড়াল মেয়েটা, কিচেনে ঢুকল সোহানা, ঢুকেই ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। প্রায় গাঢ় অন্ধকার ভেতরে। কোন রকমে শুধু মেয়েটার আকৃতি দেখতে পাচ্ছে।

'কিছু লোক এসেছিল...,' গলাটা কাঁপা কাঁপা হলেও শান্ত রাখার চেষ্টায় আছে জেনি। 'রানা তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।'

খুশি হলো সোহানা। মেয়েটা প্রলাপ বকছে না। প্রথমেই কাজের কথা বলছে। সন্দেহ নেই, এ সাধারণ মেয়ে নয়। 'তারমানে বাড়িটার ওপর ওদের নজর নেই,' বলল ও পেন্সিল টর্চ জেলে আলোর সুইচটা খুঁজে নিয়ে টিপে দিল। 'রেডিওতে রানা আমাকে তোমার নাম বলেনি।'

'জেনি। জেনি উডহাউস।'

একহারা গড়ন, দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। চুল এভাবে কাটা না হলে, চেহারায় ভয়ের ছাপ না থাকলে, আরও সুন্দর লাগত। চোখ দুটো পুরোপুরি খোলা, জানা না থাকলে ধরা প্রায় অসম্ভব যে মেয়েটা অন্ধ, কারণ চোখ দুটো জ্যান্ত, নিষ্প্রাণ নয়। শুধু তাকানোর ভঙ্গির মধ্যে আভাস পাওয়া যায়। তার কাঁধে একটা হাত রেখে সোহানা বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, জেনি। তোমার ওপর দিয়ে অনেক বিপদ গেছে, জানি আমি। তবে এখন আর ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা নিরাপদে বের করে নিয়ে যাব তোমাকে।'

'আমি রানার জন্যে চিন্তিত,' স্পষ্ট ভাষায়, সরাসরি বলল জেনি, তার গলায় উদ্বেগের চেয়ে রাগই বেশি।

মনে মনে মেয়েটার প্রশংসা করল সোহানা। সরল, স্পষ্টবাদী। 'চিন্তিত আমিও, জেনি। তবে বিপদে আগেও পড়েছে ও, নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় জানে। রানা তোমার ছবি তুলেছে?'

'তুলেছে। ছেলের ছবি।' ব্যাগে হাত ভরে এনভেলাপটা বের করল জেনি। 'নাও।'

হেসে ফেলল সোহানা। 'বুড়ি সাজার চেয়ে ভাল নয়? এসো, কাজটা সেরে ফেলি।' শোল্ডার-ব্যাগটা কিচেনের একটা শেলফে নামিয়ে রাখল ও, ভেতর থেকে একে একে বের করল পাসপোর্ট, কলম, মেটাল স্ট্যাম্প, অ্যাডহেসিভ-এর ছোট একটা টিউব। 'মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে।'

অন্ধকারে যে কোমল স্বরটা শুনতে পাচ্ছে জেনি, শুধু আওয়াজটাতেই সীমাহীন স্বস্তিবোধ করছে সে। গলাটা মিষ্টি বলে কি? রানার গলার সঙ্গে তুলনা

চলে না, কারণ এটা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের কণ্ঠস্বর, তবু কোথায় যেন একটা অদ্ভুত মিল আছে বলে মনে হলো জেনির। মনটা শান্ত হয়ে আসছে তার, নিরাপদ বোধ করছে, ঠিক রানা উপস্থিত থাকলে যেমন করত। সমস্ত ভয় ও উদ্বেগ কোথায় উধাও হলো বলতে পারবে না সে। ইচ্ছে হলে সোহানার সঙ্গে গল্প করে। 'তুমি ফোন করার পর আমার চুল কাটল রানা, ফটো তুলল। সুটকেস গোছাল—তারপর বুঝতে পারল, বিপদ হতে যাচ্ছে। আমিও বুঝতে পারলাম, ওরা আমাদেরকে পেয়ে গেছে…,' ধীরে ধীরে সব কথা বলে গেল জেনি। 'আরেকটা গাড়ি নিয়ে রানাকে অনুসরণ করল ওরা, শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম আমি। আওয়াজ শুনে মনে হলো, রানার চেয়ে ওদের গাড়িটা আরও জোরে ছুটতে পারে।'

'শুধু গাড়ি ভাল হলে হবে না, রানার মত ড্রাইভারের সঙ্গে জিততে হলে আরও অনেক কিছু দরকার হবে ওদের,' শান্তভাবে বলল সোহানা। 'এবার তুমি সই করবে। পারবে তো? যেখানে যা লেখার সব আমি লিখে ফেলেছি। তোমার নাম বব রিগ্যান।'

'শুধু আঙুল রেখে দেখিয়ে দাও কোত্থেকে শুরু করব।' কলমটা নিয়ে সই করল জেনি। 'ঠিক হয়েছে?'

'চমৎকার। তাহলে সবাই ওরা রানার পিছনে ছুটল। তারপর?'

'সব যখন শান্ত হয়ে এল, ঘরে ঢুকে তোমার অপেক্ষায় বসে থাকলাম। রানা আমার সুটকেসটা রেখে গেছে, যেটা আমাকে কিনে দিয়েছিল। প্যান্ট-শার্ট বের করে পরে ফেললাম, হ্যাটটা রাখলাম টেবিলের ওপর। ও আমাকে বলে গেছে, তুমি সাড়ে ন'টার সময় আসবে। এসে আশরাফ চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে যাবে। আলো নিভিয়ে রাখতে বলল, তুমি যাতে ধারণা করো খারাপ কিছু ঘটেছে। তুমি শিস দেবে, টোকা দেবে দরজায়, এসবও বলে গেছে রানা।'

'কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছ তুমি, জেনি?'

'প্রায় আধ ঘণ্টা।'

'লাফ দিয়ো না, সীল মারছি পাসপোর্টে। হয়েছে।'

'ধন্যবাদ। খুব কম মানুষই আমাকে সাবধান করার কথা ভাবে।'

'রানা ভাবত।'

'হ্যাঁ।' কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস ছাড়ল জেনি। 'ওর জন্যে আমি খুব চিন্তায় আছি!'

শান্ত হলো রানা। মনে কোন সন্দেহ নেই, ওদেরকে খসাতে পেরেছে ও। হাইওয়েতে যতক্ষণ ছিল, প্যান-আমেরিকানায়, ওর পন্টিয়াককে ধাওয়া করছিল একটা গাড়ি। হাইওয়ে ছেড়ে আরেক রাস্তায় চলে আসার পর সেটাকে আর পিছনে দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার এই অংশটা পুরানো, ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটছে পন্টিয়াক, যাচ্ছে পানামা সিটির দিকে। পিছনে একটা গাড়ি রয়েছে, তবে এটা সেটা নয়। এটার জোড়া হেডলাইটের মাঝখানে ব্যবধান অনেক বেশি।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, শহরতলির কোথাও থামবে ও, পুলিস স্টেশনে ফোন করে ক্যাপ্টেন মিগুয়েল হার্মিটেজের সঙ্গে কথা বলবে। হোটেল সান্তা মারিয়ায় নয়, সোহানা আশা করবে ওখানেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে ও। জেনিকে হোটেলে

পৌঁছে দেয়ার পর ওখানে আর এক সেকেন্ডও থাকবে না সে।

পকেট হাতড়ে দেখে নিল রানা ফোন করার জন্যে খুচরো পাঁচ সেন্টাভো আছে কিনা। তারপর আয়নার দিকে তাকাল। পিছনের গাড়িটা কাছে চলে এসেছে, চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল হেডলাইটের আলোর ওপর এবার আরেকটা আলো দেখতে পেল ও, অনবরত ঘুরছে সেটা। তারমানে ওটা পুলিসের একটা পেট্রল কার। রাস্তা খারাপ, আগেই স্পীড কমিয়ে এনেছে রানা। নিজের ওপর খুশি হলো ও।

দ্রুত পন্টিয়াকের পাশে চলে এল পুলিস কার। পাশে এল, তারপর আর সামনে বাড়ল না। ওটা ডজ ইউটিলিটি ট্রাক, রঙটা খয়েরি, দরজায় বড় করে হলুদ নাম্বার লেখা রয়েছে। ক্যাপ পরা দু'জন লোককে দেখল রানা, সামনে বসে আছে। জানালা দিয়ে একটা হাত বেরিয়ে এল, থামতে বলছে ওকে। মনে মনে বিরক্ত হলেও স্পীড কমাল রানা, রাস্তার ধারে দাঁড় করাল পন্টিয়াক। পিছনে থামল ডজ। এঞ্জিন বন্ধ করে জানালার কাচ নামাল রানা। অপেক্ষা করছে। স্প্যানিশ ভাষাটা ভালই জানে ও, অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতে অসুবিধে হবে না। হাইওয়ে ছাড়ার পরও দু'একবার স্পীড লিমিট লঙ্ঘন করেছে ও, ভাগ্য ভাল হলে ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দেবে ওকে।

আয়নায় চোখ রেখে রানা দেখল, কার থেকে নেমে অলসভঙ্গিতে হেলেদুলে এগিয়ে আসছে পুলিস দু'জন। একসঙ্গে নয়, আলাদাভাবে এল তারা, পন্টিয়াকের দু'দিক দিয়ে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে তাকাতে যাবে রানা, দেখল চোখ থেকে বারো ইঞ্চি দূরে লোমশ হাতে ধরা রয়েছে কুৎসিতদর্শন একটা অটোমেটিক।

নিজের ওপর খুব রাগ হলো মাসুদ রানার। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন ডাবল-অ্যাকশন নাইন এমএম অটোমেটিক-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, হোলস্টার থেকে বের করে ট্রিগার টিপতে সময় লাগে অত্যন্ত কম, কারণ চেম্বার লোড করা ও হ্যামার নামানো অবস্থায় নিরাপদে বহন করা যায় ওটা। পানামানিয়ান পুলিস বাহিনী এ-ধরনের একটা সাইড-আর্ম ব্যবহার করবে বলে মনে হয় না। অটোমেটিক থেকে রানার দৃষ্টি ওপরে উঠে গেল। ভরাট, ভারী একটা মুখ। এরকম মুখ আগেও দেখেছে রানা, শেষবার মাত্র ক'দিন আগে একটা দ্বীপে। এগুলোর কাজই ত্রাস ও আতঙ্ক ছড়ানো। প্রফেশনাল ক্রিমিনালের মুখ। রানার পিছনের দরজাটা খুলে গেল। কর্কশ আওয়াজ পেল ও। 'নড়বে না!' পিছনের সীটে কিছু আছে কিনা দেখছে লোকটা। সামনের লোকটার পুলিস ক্যাপ ও জ্যাকেট আরও ছোটখাট কারও জন্যে তৈরি করা হয়েছে,ট্রাউজারটা ইউনিফর্ম নয়, খয়েরি স্যুটের অংশ।

অটোমেটিকের কালো চোখের দিকে তাকাল রানা, বুঝল ওর কিছু করার নেই। পিছনের লোকটা প্রচণ্ড রাগে গর্জে উঠল, 'ছুঁড়িটা গাড়িতে নেই!'

সামনের লোকটা খানিক ঝুঁকল, রানাকে ছাড়িয়ে গাড়ির ভেতর চলে গেল তার দৃষ্টি। তারপর মাথা ঝাঁকাল সে। সাবধান হবার সুযোগ পেল না রানা। দ্বিতীয় অটোমেটিকের বাঁটটা সবেগে নেমে এল মাথার উপর।

*

ফোনের রিসিভার তুলে ক্যাপ্টেন বলল, 'হার্মিটেজ।' ডিউটি অনেক আগেই শেষ হয়েছে তার, শুধু সোহানার অনুরোধে এখনও পুলিস স্টেশনে বসে আছে।

'ক্যালে ফরটিসিক্স-এর মোড় থেকে বলছি,' বলল সোহানা। 'মি. রানা আপনাকে ফোন করেছেন?'

'এখানে? না। আমার ধারণা ছিল তিনি আপনার সঙ্গে আছেন।'

'ওরা ওঁকে খুঁজে পায়, ওদেরকে কটেজ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন তিনি। মেয়েটাকে আমি নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছি, কিন্তু মি. রানা ওখানে যাবেন না। তিনি ফোন করবেন আপনাকে।'

'এখনও করেননি।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে গম্ভীর হলো ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ। 'পরিস্থিতি ঘোলাটে লাগছে। আমি চাই না আমার এলাকায় কোন খুন-খারাবি হোক।'

'সে তো আমিও চাই না,' বলল সোহানা। 'আমি ফিরছি। আপনি আমাকে নিতে আসবেন?'

'তার দরকার নেই। স্টেশনের ওপর দু'জন লোক নজর রাখছিল। দশ মিনিট আগে তাদের আমি আটক করেছি। গাড়ি নিয়ে সোজা ঢুকে পড়তে পারেন।'

পনেরো মিনিট পর ক্যাপ্টেন হার্মিটেজের অফিসে ঢুকল সোহানা। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন, বলল, 'আমাদের জন্যে খাবার আনতে দিয়েছি, আপনাকে রেখে আমার তো আর বাড়ি ফেরা হচ্ছে না।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন।' একটা চেয়ার টেনে বসল সোহানা।

'কি করবেন বলে ভাবছেন?'

'অপেক্ষা।'

'তাতে মি. রানার কোন উপকার হবে কি?'

'এখনও আমি জানি না ওঁর কোন সাহায্য দরকার আছে কিনা।'

'তিনি যদি ওদের হাতে ধরা পড়ে থাকেন?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ।

'প্রথমে ওরা জানার চেষ্টা করবে মেয়েটা কোথায় আছে। মি. রানা যদি বলে দেন, ওরা ওঁকে খুন করবে।'

এক সেকেন্ড চুপ করে থাকল ক্যাপ্টেন, তারপর বলল, 'আপনাকে তেমন উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে না।'

'মনে না হলেও আমি উদ্বিগ্ন,' শান্ত গলায় বলল সোহানা, তবু ওর বলার ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু আছে, হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল ক্যাপ্টেন। নিজেকে নিয়ে গর্ব করার মানুষ নয় সে, তবু জানে সাহসের কোন অভাব নেই তার মধ্যে—শহরটাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে গিয়ে সারা শরীরে অসংখ্য দাগ পড়ে গেছে। তবে এই মুহূর্তে একটা কথা ভেবে খুশি লাগল তার, মাসুদ রানার প্রতিপক্ষ নয় সে, সে তাকে কথা বলাবার বা খুন করার চেষ্টা করছে না। ক্যাপ্টেন বলল, 'আমার বিশ্বাস, মি. রানাকে ওরা ধরে ফেলেছে।'

'আপনার বিশ্বাসের কারণ?'

'এক ঘণ্টা আগে একটা পুলিস কার চুরি গেছে আমাদের এখান থেকে কোরেরো-র মাঝখানে একটা রাস্তায়। ড্রাইভার আর তার সঙ্গীকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েছি আমরা। জ্ঞান ফেরার পর শুধু বলতে পেরেছে, যারা হামলা করেছিল তারা আমেরিকান। ওদের জখম গুরুতর।'

'পুলিস কার,' বিড়বিড় করল সোহানা, ক্যাপ্টেনের মনে হলো সম্ভাব্য তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা করছে ও। 'আর কিছু?'

'হ্যাঁ। খানিক পর পুলিস কারটা পাওয়া গেছে। ওখান থেকে এক মাইল দূরে। পুরানো এক রাস্তায় পাওয়া গেছে খালি একটা পন্টিয়াক। মালিককে চেনার মত কোন কাগজ-পত্র পাওয়া যায়নি, তবে গ্যারেজগুলোয় খবর নিচ্ছি আমরা। গাড়িটায় একটা রেডিও পাওয়া গেছে, ড্যাশের নিচে।'

নিচের ঠোঁটটা একবার কামড়াল সোহানা। 'ওটা মি. রানার গাড়ি,' বলল ও। 'ওঁকে ধরার জন্যে পুলিস কার ব্যবহার করেছে ওরা।'

কয়েক সেকেন্ড কেউ কিছু বলল না।

তারপর ক্যাপ্টেন নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'পেনিফিদারকে খুঁজছি আমরা। কিন্তু ওপরমহল থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কোন অ্যাকশন নেয়া যাবে না, শুধু রিপোর্ট করতে হবে। আমার নিজস্ব কিছু লোক হোটেলগুলোতে খবর নিচ্ছে।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন,' বলল সোহানা। 'ভাল হয় যদি পোর্টগুলোর ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন। পেনিফিদারের ইয়ট আছে।' এক মুহূর্ত পর আবার বলল, 'আমার নিজের কোন বিশ্বস্ত কনট্যাক্ট নেই, কাজেই আপনার ওপরই ভরসা।'

'পোর্টেও লোক পাঠিয়েছি। কাজটা কঠিন। আমরা জানি না কি নাম নিয়ে পানামায় ঢুকেছে সে, তার কোন ছবিও আমাদের কাছে নেই। তবে আপনার দেয়া বর্ণনা সবাইকে আমি জানিয়ে দিয়েছি। দু'ভাবে কাজ শুরু করেছি আমি।'

কথা না বলে মুখ তুলে শুধু তাকাল সোহানা।

নক হলো দরজায়। উঠে গিয়ে দরজা খুলল ক্যাপ্টেন, তবে অফিসে কাউকে ঢুকতে দিল না। টেবিলে আবার ফিরে এল সে, খাবারের ট্রেটা নামিয়ে রাখল। 'আপনি আমাকে জানিয়েছেন, পেনিফিদারের সঙ্গে যারা আছে তারা সবাই আমেরিকান, একজন বাদে—সে স্কটল্যান্ডের লোক। এদেরকে দেখতে পেলে আমার লোকজন শুধু আমার কাছে রিপোর্ট করবে।' ট্রের ওপর চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন, 'গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নিলে হত না?'

'আগে আপনার কথা শেষ হোক।'

'আরেক লাইনে তদন্ত শুরু করেছি আমি। পানামানিয়ান গুণ্ডাদের ব্যবহার করছে পেনিফিদার। তারমানে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে তাকে। দু'জনকে আমরা ধরেছি তারা চুনোপুটি হলেও দু'একটা তথ্য পাওয়া গেছে। সেগুলো চেক করে দেখা হচ্ছে। তারমানে এই মুহূর্তে অপেক্ষা করা ছাড়া আমারও কিছু করার নেই।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন।'

'খাওয়ার পর তাহলে আমাদের সময় কাটবে কিভাবে?' চোখে কৌতুক, সোহানার চেহারার ওপর সপ্রশংস দৃষ্টি বুলাল ক্যাপ্টেন।

'আপনার কোন প্রস্তাব আছে?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'আছে,' বলে হাসল ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ। 'আপনি সুন্দরী, ভেরি ডিসটার্বিং। আমি আপনার ওপর থেকে মনটাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখতে চাই। আপনি দাবা খেলেন, মিস সোহানা?'

'খেলি,' শান্ত গলায় বলল সোহানা।

'সময় কাটানোটা তাহলে কোন সমস্যা হবে না।' আড়ষ্ট হাসি দেখা গেল ক্যাপ্টেনের মুখে। ট্রের দিকে সোহানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। 'নিন, শুরু করুন।'

•

হেসে উঠে কর্নেল বলল, 'রানা, তুমি এক নাম্বার মিথ্যুক!'

'তাহলে অন্য একটা গল্প বলি, বিশ্বাসযোগ্য?' খুলির ব্যথাটা ভুলে থাকার চেষ্টা করছে রানা। 'ভুলটা আমারই হয়েছে, বিশ্বাসযোগ্য অথচ মিথ্যে গল্পটাই প্রথমে বলা উচিত ছিল। আমার জায়গায় সোহানা হলে এই ভুল করত না।'

'মানে?'

'দু'জনের কাজের ধারা দু'রকম,' শান্তভাবে বলল রানা। 'ফাঁদে পড়লে আমি কখনও প্রলাপ বকি না, যা বলার সত্যি বলি। কারণ আসল কথাগুলো আগে বা পরে প্রতিপক্ষ ঠিকই জানতে পারবে। বলতে চাইছি, পায়ের তলায় মোমবাতি ধরলে কারও পক্ষেই বেশিক্ষণ মিথ্যে কথা বলা সম্ভব নয়।'

'মোমবাতি, কেমন?' কর্নেলের চোখ দুটো ঝিক করে উঠল। 'ভাল একটা আইডিয়া পাওয়া গেল।'

'দু'মিনিট, খুব বেশি হলে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'তারপরই হড়হড় করে বেরিয়ে আসবে সব। কাজেই পা পুড়িয়ে লাভ কি? আগেভাগে সব বলে ফেলা ভাল নয়?'

'তারপরও পা পোড়ানো যেতে পারে, পুরানো বন্ধুত্বের খাতিরে।'

'হোটেলে বসে কাজটা করা বোকামি হবে,' রানার গলায় সন্দেহ। 'চাইলেও আমি চুপ করে থাকতে পারব না, আমার চিৎকারে ছুটে আসবে সবাই।'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে,' স্বীকার করল কর্নেল। 'তবে হোটেলটায় লোক প্রায় নেই বললেই চলে। মালপানি ঢালা হয়েছে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে। বলতে পারো গোটা হোটেলটাই ভাড়া করেছি আমরা। তাছাড়া কি করে ভাবলে আমাদের কাছে টেপ নেই? যখন দেখব পা দুটো বেশ ভালমত পুড়েছে, তখন জিজ্ঞেস করব, সত্যি কথা বলবে কিনা। আমার ধারণা এরপর তুমি মিথ্যে বলার ঝুঁকি নেবে না।'

'ঝুঁকি আমি প্রথমবারই নিইনি। যা বলেছি সত্যি বলেছি।'

'তবু মোমবাতি ব্যবহার করে দেখতে পারি আমরা, সত্যি তুমি সত্যি কথা বলেছ কিনা—মানে, দ্বিতীয় গল্পটা প্রথমটার সঙ্গে হুবহু মেলে কিনা।'

মাথা নাড়ল রানা। 'দ্বিতীয় গল্পটা প্রথমটার সঙ্গে মিলবে না,' শান্ত বিনয়ের

সঙ্গে বলল রানা, প্রায় ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে। 'তুমি অন্য কিছু শোনার জন্যে আমার পা সেদ্ধ করবে, কষ্ট কম পাবার জন্যে তাড়াতাড়ি করে নতুন একটা গল্প বানাব আমি। সেটা সত্যি কিনা চেক করতে হবে তোমাকে। তারচেয়ে প্রথমবার যেটা বলেছি সেটাই চেক করে দেখো না কেন? আরে গাধা, মাত্র পনেরো মিনিট লাগবে।'

রানার সামনে পায়চারি শুরু করল ক্রনেল, হাত দুটো পিছনে। মুখটা হাসিহাসি করে রাখল সে। যদিও গম্ভীরভাবে চিন্তা করছে।

রানা চোখ খোলার পর এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। জ্ঞান ফেরার পর দেখল, মেঝেতে পড়ে আছে ও, মাথার ভেতরটা ব্যথায় দপদপ করছে। ওর একটা হাত মুক্ত, অপরটা একটা রেডিয়েটর-এর মাথা থেকে বেরিয়ে আসা পাইপের সঙ্গে হ্যান্ডকাফ দিয়ে আটকানো। হ্যান্ডকাফটা ব্যারেল-লক টাইপের। একা হলে খুলে ফেলা কঠিন নয়, যদি ওর ডান পায়ের জুতোয় লুকানো ইস্পাতের কাঠিটা হাতে পায়। কিন্তু ওর পায়ের জুতো জোড়া আগেই খুলে নিয়েছে ক্রনেল। কামরার এক কোণে পড়ে রয়েছে ওগুলো। জুতোর পাশেই দেখা যাচ্ছে ওর জ্যাকেট আর শার্ট।

ক্রনেল এ-পর্যন্ত তিনবার মেরেছে ওকে। প্রথম দু'বার যখন ওর জ্ঞান ফিরছিল, তৃতীয়বার দাঁড়াতে দেরি করায়। ঘুসিগুলো যে খুব ব্যথা দিয়েছে তা নয়, কারণ ক্রনেলকে ঠিক পেশীবহুল বলা যায় না। তার আঙুলে একটা আঙটি আছে, রানার মুখের দু'এক জায়গা কেটে দিয়েছে ওটা। ঘুসিগুলো তেমন জোরাল না হলেও, ওগুলো খেয়ে মাথার ব্যথাটা আরও বেড়ে গেছে।

এখন পর্যন্ত নিজেকে ভাগ্যবান বলেই মনে করছে রানা, সেই সঙ্গে জানে ভাগ্যের এই সহায়তা খুব বেশিক্ষণ পাবে না ও। প্রতিপক্ষের ফাঁদে ধরা পড়ে সময় পাবার চেষ্টা করা অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার, শেষ পর্যন্ত তেমন কোন উপকারেও আসে না। তবে আর কোন অবলম্বন নেই ওর। আশার আলো দেখা দিতে পারে, ওদেরকে যদি দেরি করিয়ে দেয়া যায়। ও জানে, পেনিফিদারকে খুঁজছে সোহানা। সময়মত তাকে পেয়েও যেতে পারে ও।

রানা ও ক্রনেল ছাড়াও বেডরুমে আরও দু'জন লোক রয়েছে। পেনিফিদার ও নিকেল। নিকেল দরজার পাশে, দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার মুখটা সরু, ভেতর দিকে তোবড়ানো, দেখে মনে হয় ঠোঁট বলে কিছু নেই। একটা চেয়ারে বসে আছে পেনিফিদার, ভঙ্গিটা শুয়ে থাকার মত, মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। সরু একটা লেদার হারনেস নাড়াচাড়া করছে সে, হারনেসে আটকানো রয়েছে রানার ছুরি দুটো।

ক্রনেল বলল, 'আবার শুরু করা যাক। তুমি জানতে তোমার বান্ধবী আজ সন্ধের ফ্লাইটে আসবে, কেমন?'

'জানতাম।'

'কিভাবে?'

'আমার পন্টিয়াক সার্চ করার জন্যে লোক পাঠাও,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'ড্যাশবোর্ডের নিচটা দেখতে বলবে। একটা রেডিও আছে ওখানে—কেডব্লিউ

২০০০।'

'তা আছে,' নিঃশব্দে হাসল ক্রনেল। 'তোমাকে বের করে আনার পর চেক করে দেখেছে ওরা। তাহলে কথা ছিল তোমাকে আর মেয়েটাকে কটেজ থেকে উদ্ধার করবে সোহানা, উদ্ধার করে নিয়ে যাবে...কোথায় নিয়ে যাবে?'

'পানামা হিলটনে। এক রাতের জন্যে দুটো কামরা ভাড়া করা হয়েছে। একটা ডাবল রূম, সোহানা আর মেয়েটার জন্যে। একটা সিঙ্গেল, আমার জন্যে।'

চট করে একবার নিকেলের দিকে তাকাল ক্রনেল, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল নিকেল।

'এ-পর্যন্ত সব ঠিকই আছে,' বলল ক্রনেল। 'এয়ারপোর্টের পোর্টার রিপোর্ট করেছে, তোমার বান্ধবী হিলটনে উঠেছে। নিকেল কনফার্ম করছে। বলে যাও, রানা।'

'একবার তো বলেছি। কটেজে পৌছুতে দেরি করে ফেলে সোহানা। কারণটা আমার জানা নেই। রাত ন'টার দিকে আমি টের পাই, তোমাদের বাঁদরগুলো ঘিরে ফেলেছে আমাদেরকে। সান ফ্র্যান্সিসকো বা শিকাগোয় দক্ষ হতে পারে, কিন্তু পানামার জঙ্গলের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই, জানে না কিভাবে সামনে বাড়তে হয়।'

'তো?'

'কাজেই ওদেরকে আমি দূরে সরিয়ে আনি। মেয়েটাকে গাড়িতে তুলি, তারপর বের করে দিই। কটেজ থেকে দূরে সরে আসি আমি একা। ওরা আমাকে ফলো করে।'

'মেয়েটা ঘরে ফিরে গেল?'

'গেল। ঘরে ঢুকে সোহানার জন্যে অপেক্ষা করার কথা তার।' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'তবে এখন আর ওরা হিলটনে উঠবে না, আমি যেহেতু নিখোঁজ হয়ে গেছি।'

একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে আছে ক্রনেল, লম্বা চিবুকটা আঙুল দিয়ে ঘষছে। 'সোহানা জেনিকে কটেজ থেকে আনতে যায়নি,' ধীরে ধীরে বলল সে।

হেসে উঠল রানা। 'বেশ, যায়নি। তোমরা যাও, তুলে আনো।'

'বলছি, সোহানা জেনিকে তুলে আনতে পারবে না,' বলল ক্রনেল। 'এয়ারপোর্ট থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার বান্ধবীকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। অসমাপ্ত তদন্ত সমাপ্ত করতে চায় ওরা। এখনও পুলিস স্টেশনে আছে সোহানা। কটেজে যাবার সুযোগ পায়নি সে।'

রানার মুখের হাসি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড ক্রনেলের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, উপলব্ধি করল ক্রনেল ধাপ্পা দিচ্ছে না। 'তাহলে জেনিকে তোমরা পেয়েছ,' বেসুরো গলায় অবশেষে বলল ও। 'সেক্ষেত্রে এত নাটক করার কি দরকার ছিল?'

'আমরা তাকে পাইনি। কটেজটা খালি।'

তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'খুব ভয় পেয়েছিল মেয়েটা। একা হয়ে যাওয়ায় ভয়টা আরও হয়তো বাড়ে। হয়তো...,' থেমে গেল

ও।

'হয়তো, রানা?' তাগাদা দিল ক্রুনেল। 'বলো, বলো, চুপ করে থেকে কোন লাভ নেই। মোমবাতির আইডিয়াটা তোমার হলেও, আমাদেরও খুব পছন্দ হয়েছে। হয়তো?'

আরও দু'সেকেণ্ড ইতস্তত করল রানা, তারপর ক্লান্তস্বরে বলল, 'চারদিক অন্ধকার। যাদের চোখ আছে, অন্ধকারে তাদের চেয়ে ভালভাবে নড়াচড়া করতে পারে জেনি। সোহানা আসছে না দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সে, একাই বেরিয়ে পড়ে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটতে শুরু করে।'

'কোথায় যাবে সে?'

'বোকার মত প্রশ্ন কোরো না! পালাবার জন্যে ছুটছে, কোথায় কে জানে। সে জানে তার বোনকে খুন করা হয়েছে, যারা খুন করেছে তারা তাকেও ধরতে আসবে। সোহানা না আসায় পালাবার সিদ্ধান্ত নিল সে। ভাল কথা, তাকে তোমরা চাইছ কেন?'

উত্তর দিল পেনিফিদার, মুখ না তুলেই। 'রিসার্চের জন্যে। আর্কিওলজিক্যাল রিসার্চ।' খাপের ভেতর একটা ছুরি ভরে হাসল সে, কোন শব্দ হলো না। মুখ তুলল, তাকাল ক্রুনেলের দিকে। 'ওই কটেজের চারপাশে তল্লাশি চালাও। অনেক লোক লাগাও, যতগুলোকে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোক হতে হবে। এলাকাটা দুর্গম, খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি সে। দিনের আলো ফোটার পর এক ঘণ্টার মধ্যে পাওয়া যাবে তাকে। আরেকটা কাজ করতে হবে, ইয়টটা তৈরি অবস্থায় আছে কিনা দেখে রাখো।'

নিচের ঠোঁটটা দু'আঙুলে টিপে ধরে কি যেন ভাবল ক্রুনেল, তারপর বলল, 'বেশি লোক লাগালে কোরেরার চারদিকে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হবে। পুলিস যদি কিছু সন্দেহ করে...।'

'ওদেরকে ব্যস্ত রাখার জন্যে আমি একটা ব্যবস্থা করছি। হয়তো একটা নয়, দুটো ব্যবস্থা করব।' নিকেলের দিকে তাকাল পেনিফিদার। 'তোমার ডাণ্ডা দিয়ে সোহানাকে যদি দু'টুকরো করার সুযোগ পাও, খুশি হবে?'

'বেজায় খুশি হব, বস্!' মাংসের ফাঁকটা খুলে গেল, আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ল নিকেলের হলুদ দাঁতগুলো। আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় চোখ দুটো আধবোজা হয়ে এল তার। কালো কেসটা মেঝে থেকে তুলে খুলল সে, নিচু করে ভেতরের জিনিসগুলো দেখাল সবাইকে।

খানিক আগে রানার মুখের হাসি নিভে গেলেও, মনে মনে হাসছিল ও। কারণ ওর গল্প বিশ্বাস করেছে ওরা, ওদের বেশিরভাগ লোক কটেজের পিছনে সময় নষ্ট করতে চলে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর মন থেকেও উধাও হলো হাসি। নিকেলের কালো কেসটার ভেতর ওটা চেক এম সিক্সটিওয়ান সাবমেশিনগান। স্টকটা ঠিক যেন ইস্পাতের চুলের কাঁটা, ভাঁজ করে হাত থেকে গুলি ছোঁড়া যায়, ভাঁজ না করে কাঁধ বা নিতম্ব থেকে। দেখল, ওটার সঙ্গে লম্বা একটা ম্যাগাজিন রয়েছে, বিশ রাউন্ড ৭·৬৫-এম এম ব্রাউনিং শর্ট কার্টিজ সহ। স্টক ভাঁজ করা অবস্থায় দৈর্ঘ্যে অস্ত্রটা মাত্র এগারো ইঞ্চি। অটোমেটিক বা সেমিঅটোমেটিক, দু'ভাবেই গুলি করা

যায়। অটোমেটিকে থাকলে এমসিক্সটিওয়ান দু'সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে বিশ রাউন্ড গুলির সবক'টা টার্গেটের গায়ে ঢুকিয়ে দেবে। মাযল ভেলোসিটি এক হাজার এফপিএস-এর একটু বেশি হওয়ায় ওটাতে সাইলেন্সারও লাগানো যায়। কালো কেসটার ভেতর ও-জিনিস একটা রয়েওছে।'

নিকেলের চেহারাটাই এমন, দেখে মনে হয় মানুষ খুন করার জন্যেই যেন জন্মেছে সে। এ-ধরনের একটা মারাত্মক অস্ত্র শুধু তার হাতেই মানায়।

'আপনি আসলে কি ভাবছেন বলুন তো, বস্?' কুনেল কৌতূহল প্রকাশ করল।

'ধরে নিচ্ছি, জেনি উডহাউসকে পেয়ে গেছি আমরা।' দাঁড়াল পেনিফিদার, হারনেস ও ছুরিগুলো কামরার এক কোণে ছুঁড়ে দিল সে। 'কাজেই রানা আর সোহানাকে আমাদের আর দরকার নেই। আমি চাই রানা মারা যাবার আগে ঘামবে। আর সোহানার মৃত্যুটা হতে হবে দ্রুত ও কুৎসিত।'

'কিন্তু সে তো এখনও পুলিসের কাছে।'

'এখনও।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল পেনিফিদার। 'কথার মারপ্যাচে অথবা ঘুষ দিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে আসবে সে। তা যদি না পারে, তার নাম সোহানা নয়।' লিভিংরূমের দরজার দিকে এগোল সে। 'রোজিনাকে খবর দাও। তাকে বলো, আমি চাইছি সে একটা পার্সেল তৈরি করুক। তারপর পুলিস স্টেশনে ফোন করে সোহানাকে চাইতে পারে সে।'

সাত

'রাত কিন্তু অনেক হলো,' বলল আশরাফ। 'তুমি শোবে না?'

'না,' মাথা নেড়ে বলল জেনি। 'ঘুম আমার আসবে না। তবে তুমি যদি ক্লান্ত বোধ করো, বসে থেকো না।'

'আমাকে ঘুমাতে নিষেধ করা হয়েছে,' ব্যাখ্যা করল আশরাফ। 'অস্ত্র ও ট্র্যাংকুলাইজার, দুটোই দিয়ে গেছে সোহানা। অস্ত্রটা দিয়েছে তোমাকে পাহারা দিয়ে রাখার জন্যে, আর ট্র্যাংকুলাইজার দিয়েছে নিজের বা তোমার পায়ে যাতে গুলি করে না বসি।' আশরাফ দেখল, জেনির চেহারা থেকে উদ্বেগের রেখাগুলো ঝরে পড়ছে, ছোট্ট করে হাসল সে।

'বিনয়, না কৌতুক? কোন্টা?' জানতে চাইল জেনি।

'বিনয় বলে আসলে কিছু নেই। তোমার যখন মনে হয় একজন মানুষ তার মূল্য কম করে ধরছে, আসলে তারচেয়েও অনেক কম মূল্য তার। আর কৌতুক হলো জীবনের মৌলিক উপকরণ, এটার গুরুত্ব অপরিসীম।'

'কিন্তু আমি শুনেছি তুমি অঙ্ক শাস্ত্রে পণ্ডিত! দার্শনিকও, তা তো কেউ বলেনি!'

'কেন, তুমি জানো না? অঙ্ক আর দর্শন, দুটো তো একই জিনিস!'

'ওমা, কি বলে!'

'উত্তেজিত হয়ো না,' সাবধান করল আশরাফ। 'বলো তো একটা ট্র্যাংক্যুইলাইজার দিই?'

'না, ধন্যবাদ, এখুনি নয়।'

'তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত আমি। খানিকটা কেমিক্যাল আমাকে শান্ত থাকতে বলবে, উত্তেজনায় বা উদ্বেগে যখন আঙুল কামড়াবার সঙ্গত কারণ আছে আমার—আইডিয়াটা অপমানকর। আরও ভাল উপায় জানা আছে আমার। সিগারেট?'

'প্লীজ।'

আশরাফের রুমে রয়েছে ওরা। দু'ঘণ্টা আগে ওয়েটার খাবার ও এক বোতল ওয়াইন দিয়ে গেছে ওদেরকে। ওয়েটার দেখে গেছে, বিছানায় শুয়ে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে জেনি ওরফে বব রিগ্যান। হোটেলটা পুরানো, পরিবেশটা শান্ত। শুধু শার্ট আর ট্রাউজার পরে আছে আশরাফ। জেনির পরনেও তাই।

জেনির সিগারেটটা ধরিয়ে দিল আশরাফ।

'লবিতে দাঁড় করিয়ে আমাকে যেভাবে খাতায় সই করালে, তারপর তুলে আনলে কামরায়, সত্যি দারুণ দেখিয়েছ,' বলল জেনি। 'রানা বলছিল নিজেকে যতটা ভাব, তারচেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান তুমি।'

'রানা আর সোহানা, ওদের দু'জনের কথা আর বোলো না। ওরা আসলে নিখুঁত হতে বাধ্য করে লোককে। একটা কাজ দিয়ে এমন ভাব দেখায়, যেন বদ্ধ মাতাল ছাড়া এ-কাজে কারও ভুল হতে পারে না। কাজেই যেভাবে হোক তোমাকে ম্যানেজ করে নিতেই হয়।'

'ওরা না জেনে কারও ওপর আস্থা রাখবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না,' বলল জেনি। 'ওরা জানত, তুমি সামলে নিতে পারবে। তবে সত্যি আমি দুঃখিত, তোমাকে যদি বিপদে ফেলে থাকি। তোমাকে বোধহয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই অভিযানে আনা হয়েছে, তাই না?'

'ভাব দেখিয়েছি আমার খুব উৎসাহ,' বলল আশরাফ। 'এরকম ভাব দেখাতে বাধ্য হয়েছি আমি। কারণ তা না হলে আমাকে কাপুরুষ মনে করা হত। তবে এসেছি বলে এখন আমি খুশি।' সত্যি খুশি সে। মারামারি কাটাকাটি ঘৃণা করে আশরাফ, হিংস্র মানুষকে ভয় পায়। এই একই ঘৃণা ও ভয় জেনির মধ্যেও আবিষ্কার করেছে সে।

'এর আগে কখনও রানা বা সোহানার সঙ্গে কোন অভিযানে ছিলে তুমি? ওরা কে, ওদের পেশা কি, এ-সব আমি জানতে চাইছি না। ওদেরকে জিজ্ঞেস করে স্পষ্ট কোন উত্তর পাইনি যখন, তোমাকে জিজ্ঞেস করাটা অন্যায় হবে।'

'না, ছিলাম না। তবে একবার অন্তত ওদের সঙ্গে থাকার খুব ইচ্ছে হয়। সে-কথা ভেবেই মস্কো থেকে লন্ডনে সোহানার কাছে ছুটি কাটাতে আসা এবার।'

'সোহানা তোমার কাজিন, আমি জানি। কিন্তু জানি না তার সঙ্গে কতটুকু ঘনিষ্ঠ তুমি।' বলার পর ক্ষীণ, আড়ষ্ট হাসি দেখা গেল জেনির ঠোঁটে। 'ইচ্ছে হলে বোকা কানাডিয়ান মেয়েটিকে চুপ থাকতে বলতে পারো।'

'দ্যাট'স অল রাইট। হ্যাঁ, আমরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।'

'ও, আচ্ছা,' ম্লান সুরে বলল জেনি। 'আমার ধারণা ছিল, সোহানার সঙ্গে রানার সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।'

'তা-ও সত্যি। তোমার ধারণা ঠিকই আছে। তবে দুটো সম্পর্ক সম্পূর্ণ আলাদা কোয়ালিটির।'

'কি রকম?'

'রানা আর সোহানার সম্পর্কটাকে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়,' বলল আশরাফ। 'ওরা পরস্পরকে ভালবাসলেও বাসতে পারে, অন্তত দৃশ্যত কোন বাধা নেই। কিন্তু আমার আর সোহানার সম্পর্কটা সহজে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।'

বিস্মিত দেখাল জেনিকে। 'কেন?'

'কারণ, সোহানা হলো আমার হিরোইন। আমি তার একজন অন্ধ ভক্ত। স্টার অ্যান্ড ফ্যান। ব্যাপারটা ভারি জটিল, জেনি। ফ্যান আর স্টার-এর মধ্যে যে ব্যবধান, তা কখনও ঘুচবার নয়। এমনিতে দেখলে মনে হতে পারে, সোহানা আর আমার মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। আমরা বন্ধু নই। আবার গুরু-শিষ্যও নই। ব্যাপারটা জটিল নয়?'

'অঙ্কে পণ্ডিত, যোগফল মেলাতে পারছ না?'

'যোগফলে কোনকিছু অবশিষ্ট থাকে না, শূন্য।'

হেসে উঠল জেনি। 'তাই যদি হয়, যোগফল যদি শূন্যই হয়, এর মধ্যে আমি কোন জটিলতা দেখছি না।'

'কিছু যদি মনে না করো, এবার আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'আমি মনে করলেও শুনো না, কেমন?'

'রানাকে তোমার কেমন মনে হলো?' মৃদুস্বরে জানতে চাইল আশরাফ।

হঠাৎ স্থির পাথর হয়ে গেল জেনি। কথা বলল না।

'কি হলো, জেনি?' একটু ব্যাকুল শোনাল আশরাফের গলা। 'ইতস্তত করার কিছু নেই, আমি কিছু মনে করব না। অল্প সময়েও অনেক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে পারে।'

আরও কয়েক সেকেন্ড পর বিড়বিড় করল জেনি, 'স্টার অ্যান্ড ফ্যান, আশরাফ।'

'মাই গড, কি বলছ!'

'রানার মত ভদ্রলোক জীবনে আমি দেখিনি, কোনদিন দেখব বলেও বিশ্বাস হয় না। সত্যি আমার হিরো ও। আমি ওর অন্ধ ভক্ত—আক্ষরিক অর্থে।'

হেসে উঠল আশরাফ। 'আমাদের দু'জনের মধ্যে তাহলে দেখা যাচ্ছে অনেক মিল!'

'সেজন্যে তোমার খুশি লাগছে?'

'লাগছে। তোমার?'

হাত বাড়িয়ে আশরাফের কাঁধ ছুঁলো জেনি। 'আমারও। এরকম মিল সাধারণত দেখা যায় না।' খানিক পর বলল সে, 'কি ঘটছে জানার কোন উপায় নেই? সোহানা আছে কিনা জানার জন্যে পুলিস স্টেশনে ফোন করা যায় না?'

'না, জেনি।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল আশরাফ, জেনির পাশে হাঁটু গেড়ে বসল,

একটা হাত ধরল তার। নরম সুরে আবার বলল, 'উদ্বিগ্ন আমিও, জেনি। ওদের দু'জনের জন্যেই। কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই আমাদের। ভাল কোন খবর থাকলে ঠিকই জানাবে সোহানা। আমরা ফোন করে জানার চেষ্টা করলে ওদেরকে বিপদে ফেলা হতে পারে···।'

'তারমানে ভাল কোন খবর এখনও সৃষ্টি হয়নি?'

'তুমি ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই জেনেছ, আমি অপটিমিস্ট নই। তবু তোমার উদ্বেগ দূর করার জন্যে কোন ভান করছি না। বলছি না যে সব ঠিক হয়ে যাবে···।'

মাথা ঝাঁকাল জেনি।

'তবে দু'জনকেই আমি চিনি। যদি কোন বিপদে পড়ে, নিজের চেষ্টায় বেরিয়ে আসতে পারবে রানা, আমার অন্তত তাই বিশ্বাস। আর সোহানা যদি বিপদে পড়ে, সে-ও নিজেকে রক্ষা করতে জানে। তাছাড়া, পরস্পরের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা। এসবই আমার অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস। তবু যে আমার উদ্বেগ কমছে, তা নয়।'

আশরাফের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ল জেনি। 'ঠিক আছে, আমিও তাহলে তোমার মত বিশ্বাস করলাম। তবু বলব, এভাবে অপেক্ষা করাটা সাঙ্ঘাতিক কঠিন।'

'সোহানাও তাই বলে, সাঙ্ঘাতিক কঠিন।' সিধে হলো আশরাফ। 'তুমি রামি খেলতে পারো, ব্রেইল কার্ড দিয়ে?'

ঝট করে আশরাফের দিকে মাথা ফেরাল জেনি, চেহারায় বিস্ময়। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। জুলির সঙ্গে প্রায়ই খেলতাম। কিন্তু কার্ড নেই।'

'লন্ডনে প্লেনে চড়ার আগে দু'প্যাকেট তাস কোনরকমে জোগাড় করেছি,' বলল আশরাফ। 'আমার সুটকেসে আছে।' সরে এল সে।

সুটকেস খুলছে আশরাফ, শব্দগুলো মন দিয়ে শুনছে জেনি। তার চেহারায় অদ্ভুত একটা ভাব ফুটে উঠল। 'যে লোক অনিচ্ছাসত্ত্বেও লন্ডন থেকে এখানে এসেছে,' খানিক পর বলল সে, 'তার সুটকেসে ব্রেইল তাস? মন্দ নয়, সত্যি মন্দ নয়!'

রোজিনার মত মহিলা জীবনে কখনও দেখেনি রানা। বেশ লম্বা ও মোটাসোটা, ব্রণ আর আঁচিলের দাগে ভরা হলদেটে মুখ। মাথায় লালচে চুল, মাঝখানে সিঁথি, খুলির পিছনে শক্ত খোঁপা করা। ধূসর রঙের একটা কোট আর পুরানো জুতো পরে আছে। তবে রানার বিমূঢ় বোধ করার কারণ তার কাপড়চোপড় বা চেহারা নয়।

সস্তাদরের ছোট একটা সুটকেস খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে বিছানার ওপর। পাশেই বসে রয়েছে রোজিনা, কোলের ওপর একটা গ্রেনেড, হাতে একখানা ওয়্যার-কাটার। ব্যবহার করার জন্যে এখনও তৈরি করা হয়নি গ্রেনেডটাকে। পিন বের করে নিল সে, কেটে আলাদা করল রিঙটা, তারপর সুটকেস থেকে ছোট একটা ফাইল বের করে হালকাভাবে ঘষতে শুরু করল পিনে, ওটা যাতে ঢিলেভাবে ফিট করে।

মাত্র পাঁচ মিনিট আগে পৌঁচেছে সে। লিভিংরুমে পেনিফিদারের সঙ্গে চাপাস্বরে আলাপ হয়েছে তার, তারপরই সুটকেস নিয়ে বেডরুমে ঢুকেছে। ভেতরে ঢুকে ক্রনেল ও নিকেলের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেছে সে, ভঙ্গিটা ছিল গম্ভীর আত্মমর্যাদায় ভরপুর। তারপর মন দিয়েছে নিজের কাজে।

পিনের ওপর কাজ শেষ করল সে, চেহারা দেখে মনে হলো সন্তুষ্ট হয়েছে। সরু তারের একটা রীল তুলে নিল হাতে, তারের প্রান্তটা আধ ইঞ্চি লম্বা কপার টিউবের ভেতর ঢুকিয়ে আরেক দিক থেকে বের করে আনল। এরপর প্লায়ার্স-এর সাহায্যে তারের প্রান্তটা পিনের বাঁট-এর চারধারে শক্ত করে পেঁচাল।

মনে নিদারুণ অস্বস্তি,একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। রোজিনা কাজ করছে, তার বিশ্রী চেহারায় বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে আছে, তবে তার হাত চলছে অভ্যস্ত দক্ষতার সঙ্গে, বোঝা যায় এ-ধরনের কাজ আগেও বহুবার করেছে সে। সুটকেস থেকে বড়সড় টিন বের করল, মাথায় স্ক্রু ক্যাপ পরানো, তারপর অয়েলস্কিনে মোড়া হলুদ পুটিং-এর মত দেখতে কি যেন একটা তুলে নিল সুটকেস থেকে। অয়েলস্কিন থেকে জিনিসটা বেরুতেই চিনতে পারল রানা, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ।

অয়েলস্কিন থেকে খানিকটা করে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ নিয়ে টিনের তলায় চেপে ধরছে রোজিনা, মুখ হাঁড়ি করে তার কাজকর্ম দেখছে নিকেল। নিকেলের দিকে একবার তাকাল রোজিনা, ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় তার নাকের ফুটো কুঁচকে উঠল, আবার কাজ শুরু করে বিড়বিড় করে কি যেন বলল। নিকেল ও রোজিনা পরস্পরকে সহ্য করতে পারে না, কারণ তাদের মানুষ মারার পদ্ধতি এক নয়।

সরু ইস্পাতের ডগা দিয়ে টিনের ঢাকনিতে একটা ফুটো তৈরি করল রোজিনা, ফুটোর ভেতর ঢুকিয়ে দিল টিউবটা। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল পেনিফিদার, পিছনে ক্রনেল। মুখ তুলে ওপরদিকে তাকাল রোজিনা, ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'ওখানে একটা স্ক্রু-আই লাগানো দরকার।' সিলিঙের একদিকে হাত তুলল সে, দেয়াল থেকে ছ'ফুট দূরে, রেডিয়েটরের সঙ্গে হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় রানা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'আপনার লোককে তাড়াতাড়ি করতে বলুন।'

নিকেলের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল পেনিফিদার। ছোট একটা টেবিল টেনে এনে সেটার ওপর একটা চেয়ার বসাল নিকেল। তার হাতে এক ইঞ্চি আকারের স্ক্রু-আই ও তুরপুন ধরিয়ে দিল রোজিনা, চেয়ারের ওপর দাঁড়াল সে।

'কড়িকাঠে আটকাও, নিকেল,' নির্দেশ দিল পেনিফিদার।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে রোজিনা বলল, 'কড়িকাঠে আটকাবে না তো কি আমার মাথায় আটকাবে?' এবার গ্রেনেডের ভেতর একটা প্রাইমার ঢোকাল সে। পাঁচ মিনিট পর সমস্ত জিনিস সুটকেসে ভরে ঢাকনি বন্ধ করল।

মাথা ঝাঁকাল পেনিফিদার। 'গুড। এবার ফোন কল।'

প্রথম দুটো খেলা ড্র হলো। দাবার ছকে আবার নতুন করে ঘুঁটি সাজাচ্ছে, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ, তারপর স্প্যানিশ ভাষায় বলল, 'দিন।' মাউথপীসে হাতচাপা দিল সে, টেবিলের উল্টোদিকে বসা সোহানার দিকে তাকাল। 'একটা মেয়ে জানতে চাইছে, এখনও

আমরা আপনাকে আটকে রেখেছি কিনা।'

হাতের হাতির দিকে তাকিয়ে থাকল সোহানা, এক সেকেন্ড পর বলল, 'বলুন এইমাত্র আমাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। জিজ্ঞেস করুন কি চায় সে।'

ফোনে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলল ক্যাপ্টেন। বেশ কিছুক্ষণ সওয়াল-জবাব চলল, তারপর আবার মাউথপীসে হাতচাপা দিল সে। 'আপনার জন্যে একটা মেসেজ আছে। মেয়েটি হিলটনে ফোন করেছিল, এইমাত্র জানতে পেরেছে যে আপনাকে এখানে আনা হয়েছে। মেসেজটা শুধু আপনাকে দেবে সে।'

সোহানার চোখ দুটো ঝিক করে উঠল। 'কিছুক্ষণ ইতস্তত করুন, অফিশিয়াল নিয়মের কথা তুলুন, তারপর রাজি হোন।'

নিঃশব্দে হাসল ক্যাপ্টেন, তারপর মাউথপীস থেকে হাত সরাল। দু'মিনিট পর টেবিলের ওপর দিয়ে রিসিভারটা সোহানার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পেল সোহানা। 'আপনি কি মিস সোহানা চৌধুরী?'

'হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?'

'আমার পরিচয় জানার দরকার নেই আপনার। আমি যে বার-এ কাজ করি সেখানে এক এশিয়ান এসেছিল। আমাকে বিশটা ডলার দিয়ে বলল আপনাকে একটা মেসেজ পৌঁছে দিতে হবে। বলেই চলে গেল। তার পিছনে লোক লেগেছে।'

'মেসেজটা কি?'

'হোটেল অ্যামব্যাসাডর। লবি। ওখানে রাত দুটোর সময় থাকবে সে। আরেকটা কথা বলেছে সে, কিন্তু কথাটার অর্থ বুঝতে পারছি না...।'

হাতঘড়ির দিকে তাকাল সোহানা। দেড়টা বাজে। 'কথাটা কি?'

'সে যদি ওদেরকে ধোঁকা দিতে পারে। ঠিক এই কথাটা বলল সে। ওখানে সে থাকবে, সে যদি ওদেরকে ধোঁকা দিতে পারে।'

'আর কিছু?'

'না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।' অপরপ্রান্তে ক্লিক করে আওয়াজ হলো, রিসিভারটা ক্যাপ্টেনের দিকে বাড়িয়ে ধরল সোহানা।

মেয়েটি কি বলল শোনার পর ক্যাপ্টেন মন্তব্য করল, 'সন্দেহ নেই, এটা একটা ফাঁদ।'

'হ্যাঁ। আমার খোঁজে হিলটনে কাউকে ফোন করতে বলবে না রানা। ও জানে, ওখানে আমি যাইইনি।'

'পেনিফিদার তাহলে অ্যামব্যাসাডরে আছে।'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে চেয়ার ছাড়ল সোহানা, শার্টের প্রথম তিনটে বোতাম খুলে ফেলল। ওর শার্টের বাটনহোল-হেম কড়া বকরম-এর সাহায্যে শক্ত করা হয়েছে, ফলে বুক থেকে অনেকটা সরে আছে। বলল, 'পেনিফিদার কিনা জানি না। তবে কেউ না কেউ অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। কাজেই যেতে হবে। হোটেলটা কোন দিকে বলুন তো?'

'শহরের প্রায় বাইরেই বলা যায়। কিন্তু সত্যি যাবেন নাকি? আপনি জানেন

এটা একটা ফাঁদ।'

'ফাঁদ বলেই তো যাওয়া দরকার। রানার কাছে পৌঁছুবার আর কোন উপায় আছে?' সম্পূর্ণ শান্ত সোহানা।

ঝাড়া তিন সেকেন্ড সোহানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ, তারপর ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল 'তা নেই। অ্যামব্যাসাডর হোটেলটা নির্জন এলাকায়, পেনিফিদারের ঘাঁটি হিসেবে আদর্শ জায়গা। শহরের বাইরে বলে বছরের এই সময়টায় ওখানে কেউ ওঠেও না।' চেয়ার ছেড়ে সে-ও দাঁড়াল। 'আপনার সঙ্গে যাব আমি।'

'পুলিস কার বাদ, ক্যাপ্টেন। হানা দেয়াও চলবে না,' তাড়াতাড়ি বলল সোহানা।

'কেন?'

'আমার বিশ্বাস, মি. রানা এখনও বেঁচে আছেন। আমি এমন কিছু করব না, যাতে ওর জীবন বিপন্ন হয়।'

'আপনার বিশ্বাস সত্যি না-ও হতে পারে।'

'সত্যি হবারই বেশি সম্ভাবনা। ওরা ওঁকে কথা বলাবার চেষ্টা করবে। কথা তিনি বলবেনও। আর কথা বলার সময় মাথা খাটাবেন।' দরজার দিকে ঘুরল সোহানা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে গানবেল্টটা তুলে নিল ক্যাপ্টেন। 'আপনার যা খুশি,' হাল ছেড়ে দিয়ে বলল সে। 'তবে ফাঁদ পাতা হয়েছে জানলে আমি সেখানে যাই না।'

মৃদু হাসল সোহানা। বলল, 'কিন্তু টোপটাকে যদি আপনি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসেন?'

হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে পেনিফিদার বলল, 'আর পনেরো মিনিট পর এখানে পৌঁছুবে সোহানা। আমাদের এবার বেরিয়ে পড়া দরকার।'

'দেখার খুব ইচ্ছে ছিল আমার,' কাতর কণ্ঠে বলল ক্রনেল।

'পরে নিকেলের মুখ থেকে শুনব আমরা,' বলে হাসল পেনিফিদার। 'যাও, তুমি নিজের জায়গায় পজিশন নাও। যেদিক থেকেই আসুক সোহানা, সিঁড়ি বা এলিভেটরের দিকে যেতে হলে লবিতে তাকে ঢুকতেই হবে। দেরি কোরো না, দেখামাত্র উড়িয়ে দেবে। সাইড ডোর দিয়ে বেরিয়ে গাড়ির কাছে চলে যেয়ো। স্টার্ট দিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে আব্রাহাম। বেলা ভিস্টায় গাড়ি বদল করবে তোমরা।'

'ঠিক আছে, বস্।' এমসিক্সটিওয়ান কোটের ভেতর নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল নিকেল। দরজার কাছে পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে একবার তাকাল সে। বড় এক টুকরো অ্যাডহেসিভ প্লাস্টার দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে রানার মুখ। 'খরচের খাতায় তোমার নাম ওঠার আগেই বান্ধবীর বিদায় নেয়ার শব্দ শুনতে পাবে তুমি, বন্ধু,' বলল নিকেল। 'তুমি যাতে শুনতে পাও, শুধু সেজন্যেই আমি সাইলেন্সার ব্যবহার করছি না।' দরজা পেরিয়ে লিভিংরুমে ঢুকল সে।

জিভ ও টাকরা সহযোগে টট্ টট্ আওয়াজ করল ক্রনেল। 'আমার বিশ্বাস

তুমি ধরতে পেরেছ এইমাত্র নিকেল সোহানার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল,' রানার দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বলল সে।

'সোহানার মৃত্যুটা হবে দ্রুত, কিন্তু কুৎসিত,' নিচু গলায় ধীরে ধীরে গম্ভীর সন্তুষ্টির সঙ্গে বলল পেনিফিদার। 'আর তুমি মরবে ঘাম ঝরিয়ে।' রোজিনার দিকে তাকাল সে। 'ব্যাখ্যা করে শোনাও ওকে, তারপর বাকি কাজটুকু শেষ করো।'

রাজি হওয়ার ভঙ্গিতে মাথাটা একদিকে কাত করল রোজিনা, তারপর কোটের পকেট থেকে একটা ব্রাউনিং ·২৫ অটোমেটিক বের করল। কামরা থেকে বেরিয়ে গেল পেনিফিদার ও ক্রুনেল। রানা শুনতে পেল লিভিংরুমের বাইরের দিকের দরজা ওদের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল। সমস্ত লাগেজ আগেই নিচে নামিয়ে নিয়ে গেছে ওরা। সুইটে এখন শুধু রানা ও রোজিনা রয়েছে। মেঝের দিকে তাকাল রানা। হলুদ গোল টিনটা মেঝেতে খাড়া করা রয়েছে, মাথার ফুটো থেকে বেরিয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে সরু তার। তারটা সিলিঙে লাগানো স্ক্রু আই-এর ভেতর দিয়ে শিথিল ও তির্যকভাবে নেমে এসেছে দরজার দিকে।

রোজিনার গলায় অসন্তোষ, 'ডিভাইসটা অগোছাল। এরকম ব্যস্ততার সঙ্গে কিছু করতে একদম পছন্দ করি না আমি। তবে কাজ করবে।'

দ্রুত মাথাটা ঝাঁকাল রানা, মুক্ত হাতটা মুখের প্লাস্টারের দিকে তুলল।

হাতের রিভলভার রানার দিকে তাক করল রোজিনা, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'না!'

হাতটা নিচু করল রানা। অস্ত্রধারীর চেহারা দেখেই বলে দিতে পারে ও, ব্যবহার করবে কিনা। রোজিনা করবে।

'গ্রেনেডের চারধারে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ঠাসা হয়েছে, তবে পিন বেরিয়ে আসার পর লিভারটা যাতে নড়তে পারে তারজন্যে ফাঁক রাখা আছে,' বলল রোজিনা। 'ওয়ান-সেকেণ্ড ফিউজ। তারে টান পড়লেই বেরিয়ে আসবে পিন। তারটা যাতে অনায়াসে সরতে পারে সেটা নিশ্চিত করবে টিউবিং, বুঝতে পারছ তো?'

একদৃষ্টে রোজিনার দিকে তাকিয়ে আছে রানা, বোকার মত মাথা ঝাঁকাল। সামান্য আচ্ছন্ন বোধ করছে ও। এরকম জটিল ও কিম্ভূতকিমাকার বোমা জীবনে দেখেনি। তবে কোন সন্দেহ নেই যে কাজ করবে। বোমাটা যখন ফাটবে, কামরার একটা পিঁপড়েও বাঁচবে না।

দরজার দিকে পিছু হটল রোজিনা। তারের শেষ প্রান্তটা তুলে নিল সে; দরজার চৌকাঠে, কজার কাছাকাছি ফিট করা দ্বিতীয় স্ক্রু-আইয়ের ভেতর ঢোকাল সেটা, বের করে আবার ঢোকাল কী-হোলে। বিছানা থেকে সুটকেসটা তুলে বাইরে, লিভিংরুমে নিয়ে গেল।

নিজের সঙ্গে তর্ক করছে রানা। এক ঝটকায় মুখের প্লাস্টার খুলে রোজিনাকে ঘুষ দেয়ার প্রস্তাব দিলে কেমন হয়? তর্কটা জমল না, কারণ ওর প্রতিপক্ষ মনের একটা অংশ জানিয়ে দিল, ওকে নড়তে দেখলেই গুলি করবে রোজিনা—তার ওপর সেই নির্দেশই আছে। ঘুষের প্রস্তাবে রাজি হবার তার কোন কারণও নেই। সে জানে, এই মুহূর্তে ওর পকেট খালি। ঘুষের টাকা কেউ বাকি রাখতে চায় না। সে যে পেনিফিদারের প্রতি অনুগত, তার আচরণ থেকে ইতিমধ্যে সেটা পরিষ্কার হয়ে

গেছে। আরও ব্যাপার আছে। রানার কাছ থেকে ঘুষ খেলে পেনিকিদার তাকে বাঁচিয়ে রাখবে না। তাছাড়া, বোমাটা তার নিজের হাতে তৈরি, ওটাকে ফাটতেই হবে।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে রোজিনা। কুঁচকে আছে ভুরু, চেহারায় রাজ্যের বিতৃষ্ণা। গোটা দৃশ্যটা সতর্ক দৃষ্টিতে শেষ বার দেখে নিচ্ছে। এক সময় আপনমনে মাথা ঝাঁকাল সে। তাকাল রানার দিকে। কথা বলল এমন সুরে, যেন পুরুষ মানুষের ওপর তার আজন্ম আক্রোশ। 'ডিভাইসটা খুব বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবে বলে মনে করি না, তবে আশা করব অন্তত আমি হোটেল ছেড়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ধরে রাখতে চেষ্টা করবে। জোরাল শব্দ আমি আবার সহ্য করতে পারি না।'

পিছু হটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে, দরজাটা এমনভাবে বন্ধ করল যাতে মাত্র ছ'ইঞ্চির মত ফাঁক হয়ে থাকে, তারপর কী-হোলে ঢোকানো তারটা ধরে টান দিল, যতক্ষণ না প্রায় টান টান হলো সেটা। 'শুভরাত্রি, সিনর। ডিভাইসটা এবার তুলে নিলে নিজের উপকার করা হবে।'

তাড়াতাড়ি হাঁটু ভাঁজ করে নিচের দিকে ঝুঁকল রানা, দরজা বন্ধ হচ্ছে এই সময় টিনের চারধারে আঙুল জড়াল। এক সেকেন্ড পর আবার টান পড়ায় কী-হোলের ভেতর ধীরে ধীরে ঢুকে যেতে শুরু করল তার। সিধে হলো রানা, মুক্ত হাতটা লম্বা করল, তালুর ওপর বোমা। ভুরুতে ঘাম জমে গেছে এরইমধ্যে। ভাবল, খোদা, কোথায় থামতে হবে মেয়েটা জানে তো!

ডান হাতটা ঠিক যখন দিগন্তরেখার মত সোজা ও সরল হলো, স্থির হয়ে গেল তার। রানা দাঁড়িয়ে আছে অপর হাতটা রেডিয়েটরের দিকে লম্বা করে, কব্জিতে হ্যান্ডকাফ আটকানো। ওর ডান হাত, বোমা সহ, সিলিঙে আটকানো স্ক্রু আই-এর সরাসরি নিচে পর্যন্ত লম্বা হয়ে আছে; হাতটা যদি মাত্র কয়েক ইঞ্চি নামায়, গ্রেনেডের পিনটা বেরিয়ে আসবে। বিস্ফোরণ ঘটলে দরজাটা উড়ে যাবে, হয়তো রোজিনাও আহত হবে; কিন্তু রানা অবশ্যই বাঁচবে না।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তারটা কাটল রোজিনা, প্রান্তটা একটা ছোট স্ক্রুতে শক্ত করে জড়াল, তারপর কী-হোলে স্ক্রুটা এমনভাবে ঢুকিয়ে দিল যাতে কেউ দেখতে না পায়। সুটকেস তুলে নিয়ে সুইটের দরজার দিকে এগোল সে, বেরিয়ে এল করিডরে, চেহারা দেখে মনে হলো এইমাত্র কেউ যেন তাকে চরম অপমান করেছে।

রানা শুনতে পেল আলোর সুইচ অফ করা হলো, বন্ধ হলো পাশের কামরার দরজা। লম্বা করা হাতে ধরা বোমাটার দিকে তাকাল ও। অনুভব করল শরীরের ভেতর মাথাচাড়া দিয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে আতঙ্ক, গলা টিপে মারল সেটাকে। আর দশ মিনিট। তারপর সোহানা আসবে। নিকেল ওর জন্যে অপেক্ষা করবে লবিতে।

মনটাকে শান্ত রাখতে হবে। আড়ষ্ট হতে শুরু করেছে হাতটা। শরীরের সমস্ত পেশী শিথিল করল ও, শুধু ডান হাতটা শক্ত রাখল, যাতে বোমাটা ধরে রাখতে পারে। সময় মাত্র দশ মিনিট। এবার মাথা খাটিয়ে বের করতে হবে সোহানাকে

কিভাবে বাঁচানো যায়।

তার আগে নিজেকে বাঁচানো দরকার। ও বাঁচলে সোহানার বাঁচার একটা উপায় করা যাবে। বোমাটাকে যদি ঘোরাতে শুরু করে ও, টিন থেকে বেরিয়ে থাকা এক ইঞ্চি টিউবে আটকে যাবে তারটা···না, তা সম্ভব নয়, কারণ তারটা প্রায় টান টান হয়ে আছে। মুখে প্লাস্টার থাকায় চিৎকার করাও সম্ভব নয়। তবে আওয়াজ করা সম্ভব, ভোঁতা গোঙানির মত শোনাবে। মেঝেতে পা ঠুকেও শব্দ করা যায়। আওয়াজ শুনে কেউ যদি আসে, তারা বেডরুমের দরজাটা খুলবে—টান পড়বে তারে, গ্রেনেড থেকে বেরিয়ে যাবে পিনটা। দরজার কবাট মাত্র তিন ইঞ্চি ফাঁক হলেই বিস্ফোরণ ঘটবে।

না, আওয়াজ করেও কোন লাভ নেই। বিকল্প আর কি আছে? বোমা ধরা হাতটায় প্রচণ্ড ঝাঁকি দিতে পারে, হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলতে পারে তার, বিরতি না নিয়ে বিস্ফোরিত হবার আগেই জানালা দিয়ে ফেলে দিতে পারে বোমাটা।

মাত্র এক সেকেন্ডের ফিউজ। জানালা বন্ধ। সুপারম্যানও পারবে না।

সোহানা যদি নিকেলকে ফাঁকি দিয়ে উঠে আসতে পারে তাহলেও পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটবে না। সুইটে ঢুকে বেডরূমের দরজা খুলবে ও। সেটাই ওর জীবনের সর্বশেষ কাজ হবে।

হ্যান্ডকাফ। চাবি ছাড়া হ্যান্ডকাফ খোলার প্রশ্নই ওঠে না। চাবি থাকলেও প্রশ্ন ওঠে না, কারণ ডান হাতে বোমা থাকায় সেটাকে বাম হাতের কাছে আনতে পারবে না ও। তবে···।

বাম পাটা সাবধানে তুলল রানা, রেডিয়েটরের গায়ে আটকাল ওটাকে, তারপর টান দিল—হ্যান্ডকাফের রিঙের ভেতর কব্জিটাকে মোচড়াতে শুরু করল। দু'মিনিট পর, রক্তে পিচ্ছিল হয়ে গেছে কব্জি, হাল ছেড়ে দিল ও। মাংস হার মানতে পারে, কিন্তু হাড় ভাঙবে না। ওর হাত এত বড় যে রিঙ থেকে বেরুবে না।

সর্বনাশ! ওর ডান হাত খানিকটা ঝুলে পড়েছে। টান টান হয়ে রয়েছে তার। সাবধানে, ধীরে ধীরে, বোমাটা এক ইঞ্চি উঁচু করল রানা। তারপর আবার মন থেকে সমস্ত চিন্তা বের করে দিয়ে পেশীগুলোকে শিথিল করার চেষ্টা করল।

কোন না কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে। বোমাটার দিকে তাকিয়ে থাকল, বিশ্বাস করতে পারল না যে জিনিসটা ওর হাতে রয়েছে অথচ সম্পূর্ণ অসহায় ও। বাহুটা এবার ব্যথা করছে।

বেশ, বোঝা গেল নিজেকে রক্ষা করার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না ও। নিজেকে যদি রক্ষা করা না যায়, চিন্তা করো সোহানাকে কিভাবে বাঁচানো যায়। বোমাটা ফাটিয়ে দিতে পারে ও। কামরাটা ধসে পড়বে। চেঁচামেচি, ছুটোছুটি শুরু হয়ে যাবে গোটা হোটেলে। পুলিসকে ফোন করা হবে। কিন্তু সোহানার আগে পুলিস পৌঁছুবে না। তাছাড়া, যা-ই ঘটুক, নিকেলকে বোকা বানানো সম্ভব নয়। এমনিতেই সন্দেহ আছে তার, সোহানা এসে পৌঁছুনো পর্যন্ত রানা টিকবে কিনা। কাজেই বোমা ফাটলেও নিজের জায়গা ছেড়ে নড়বে না সে, টেবিলের নিচে সাবমেশিনগান লুকিয়ে লবিতে অপেক্ষা করবে—সোহানার জন্যে। না, বোমা ফাটিয়ে নিকেলকে তার জায়গা থেকে নড়ানো সম্ভব নয়। বরং হৈ-হট্টগোলের

মধ্যে কাজ সেরে সহজেই পালাতে পারবে সে।

ভুরু থেকে গড়িয়ে চোখে পড়ছে ঘামের ধারাগুলো। ভয়ে কুঁকড়ে গেছে রানার মন। নিজেকে তিরস্কার করল ও। রোজিনা যখন বোমাটা সাজাচ্ছিল তখনই কিছু একটা করা উচিত ছিল। তাতে যদি বিপদ হত, তাতেও একটা সান্ত্বনা থাকত—অন্তত ঝুঁকি নিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এখন তো চেষ্টা করারও কোন সুযোগ নেই।

নিচের লবিতে কোন শব্দ নেই, কেউ নড়ছে না। দু'জন মাত্র লোক রয়েছে এখানে, একজন নিকেল, অপরজন নাইট পোর্টার। খানিক আগে রিসেপশন ডেস্কে বসে ঝিমুচ্ছিল নাইট পোর্টার, এই মুহূর্তে ডেস্কের পিছনের মেঝেতে, নিকেলের পায়ের পাশে পড়ে রয়েছে সে, মাথার পিছন থেকে এখনও রক্ত গড়াচ্ছে। পোর্টারের জ্যাকেটটা পরে নিয়েছে নিকেল, গায়ে ভালই ফিট করেছে সেটা। তার সামনে এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে একটা দৈনিক পত্রিকা, কাগজগুলোর নিচে থাকায় বাইরে থেকে সাবমেশিগানটা দেখা যাচ্ছে না।

ডান হাত দিয়ে সাবমেশিনগানের গ্রিপ শক্ত করে ধরে আছে নিকেল। ভারি উৎফুল্ল বোধ করছে সে। অনেক দিন হলো জ্যান্ত কোন টার্গেটকে বুলেট দিয়ে ফুটো করার সুযোগ হয়নি তার। এটাকে নিকেল বলে, সেলাই করা। ছোট ছোট কালো ফুটো তৈরি হবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী সোহানার শরীরে, নাভীর নিচে থেকে ক্রমশ সেলাই করে ওপর দিকে উঠে যাবে ফুটোগুলো, গলা পর্যন্ত, তারপর আড়াআড়ি-ভাবে বুকের মাঝখানে সেলাই পড়বে, ফুটোগুলো দেখতে হবে ক্রশ-এর মত। কালো গর্তগুলো ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠবে। তার আরও উল্লাস বোধ করার কারণ হলো, এবারই প্রথম একটা নারীদেহকে টার্গেট হিসেবে পেতে যাচ্ছে সে। দুর্লভ একটা অভিজ্ঞতা, সন্দেহ নেই।

সুইংডোর ঠেলে লবিতে ঢুকবে সোহানা। হয় সিঁড়ির দিকে এগোবে সে, কিংবা পাশের এলিভেটরের দিকে। বলা যায় না, সে হয়তো সাইড ডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকবে, তারপর করিডর হয়ে লবিতে আসবে। তাতে কিছু আসে যায় না। এলিভেটর বা সিঁড়ির দিকে আসতে হলে তির্যক একটা পথ ধরে তার দিকে হাঁটতে হবে সোহানাকে। ট্রিগার টানার আগে ভাল করে দেখে নেয়ার প্রচুর সময় পাবে নিকেল। উপভোগ্য সময় হলো ওটা, যখন তুমি জানো আর দু'সেকেন্ড পর জ্যান্ত টার্গেট ছিন্নভিন্ন হতে যাচ্ছে, কিন্তু সে জানে না। মজাটা আসলে ঠিক তখনই পাওয়া যায়।

নিকেল চায় রানা যেন অন্তত কিছুক্ষণ টিকে থাকে। সোহানা আসার আগেই যদি ফেটে যায় বোমাটা, সেট-আপ খানিক বদলাতে হবে তাকে। সেটা অবশ্য কোন ব্যাপার না। তবে সে চায়, বান্ধবীর চিরবিদায় নেয়ার শব্দটা রানা যেন শুনতে পায়। ওদের দু'জনকেই ঘৃণা করে সে। তারা সবাই, পেনিফিদারের স্যাঙাৎরা, রানা আর সোহানাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। পেনিফিদারের কাছ থেকে দু'বছর আগে বিশ লাখ ডলারের হীরে কেড়ে নিয়েছিল ওরা দু'জন, ফলে নিকেল তার লাভের বখরা তিন লাখ ডলার পায়নি। তার ইচ্ছে ছিল ওই টাকাটা পেলে

নিজের একটা দল গড়ে তুলবে। এতদিনে তার নতুন দল দাঁড়িয়ে যেত। অথচ টাকার অভাবে শুরুই করতে পারেনি সে। কাজেই প্রতিশোধ নেয়ার এই সুযোগ পেয়ে ভারি খুশি লাগছে তার। রানা ও সোহানা, দু'জনেই মূর্তিমান আতঙ্ক, এরা বেঁচে থাকলে ওদের দলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সাইলেন্সার ব্যবহার করার কোন দরকার নেই। বাইরে স্টার্ট দেয়া অবস্থায় অপেক্ষা করছে গাড়ি, পালানো কোন সমস্যা নয়। সাইলেন্সার ব্যবহার করলে শব্দ হবে না, কিন্তু শব্দটাই তো আসল মজা।

আর বেশি দেরি নেই।

হোটেল অ্যামব্যাসাডর থেকে আর মাত্র দুশো গজ দূরে ওরা, রিয়্যার-ভিউ মিররে চোখ রেখে পিছনটা দেখে নিল ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ। না, কেউ ওদেরকে অনুসরণ করে আসেনি। পিছনে একটাই মাত্র গাড়ি, ওটায় চারজন পুলিস আছে। আগেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাই ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে ওটা। সন্তুষ্ট বোধ করল ক্যাপ্টেন, গাড়ি চালাচ্ছে ধীর গতিতে। গতি আরও একটু কমিয়ে বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল হোটেলের সামনের চত্বরে। 'আপনি চান, সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকি আমি?' জানতে চাইল সে। 'ইচ্ছে করলে আপনি সাইড ডোর দিয়ে ঢুকতে পারেন।'

'না। মি. রানাকে টোপ বানিয়ে ফাঁদটা আমার জন্যে পাতা হয়েছে। কাজেই এটা আমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব। ওরা আশাও করবে আমাকে, আপনাকে নয়। না, সামনের দরজা দিয়ে আমাকেই যেতে হবে,' বলল সোহানা।

'কিন্তু...,' কথাটা শেষ করার সুযোগ পেল না ক্যাপ্টেন। টেরেসের নিচে ছোট ধাপ তিনটের পাশে এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে গাড়ি, সামনেই সুইংডোর। গাড়ি থামেনি, তার আগেই দরজা খুলে নেমে গেল সোহানা, এক লাফে ধাপ তিনটে টপকাল। ছুটছে ও।

আঁতকে উঠল ক্যাপ্টেন, এঞ্জিন বন্ধ করল, তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পিছু নিল।

রিসেপশন ডেস্কের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে নিকেল, সুইং ডোরের স্লো-ক্লোজিং মেকানিজমের আওয়াজ শুনতে পেল। দু'সেকেন্ড পর দেয়ালের কোণ ঘুরে দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল একটি নারীমূর্তি, ঠিক যেখানটায় চওড়া হতে শুরু করেছে লবি।

পকেট বহুল একটা কালো শার্ট পরে আছে সোহানা, ম্যাচ করা স্কার্ট। গাঢ় রঙের নাইলন মোজা, মোকাসিন জুতো। খাসা মাল, ভাবল নিকেল। পা দুটো লম্বা আর নিরেট। আহা, কি সুন্দর রে মুখটা! বোকা মেয়ে, হাত দুটো খালি কেন তোর? তারপর লক্ষ করল নিকেল, ওর শার্টের বোতাম প্রায় কোমর পর্যন্ত খোলা।

বাঁক ঘুরেই হাঁটার গতি কমে গেল সোহানার, মাথা না নেড়ে শুধু চোখ ঘুরিয়ে পলকের মধ্যে পুরো লবিটা দেখে নিল।

ট্রিগারে আঙুল পেঁচিয়ে এক দুই করে গুনছে নিকেল। ব্যাপারটা উপভোগ

করছে সে। এই সময়টাই তো মজা। সোহানার দৃষ্টি এখন তার ওপর। দাঁড়িয়ে পড়েছে ও।

গাঢ় চোখ, ঠিক যেন মধ্যরাতের কালো এক জোড়া নক্ষত্র। নিকেলের ওপর গেঁথে আছে, হিমশীতল, মমতাহীন। আত্মরক্ষার বা আক্রমণের কোন লক্ষণ নেই, তবু শুধু ওর শারীরিক উপস্থিতিটাই বিরাট একটা হুমকি ও মারাত্মক অস্ত্র বলে মনে হলো, হাসি ও উল্লাস নিঃশেষে মুছে দিল নিকেলের মন থেকে। অকস্মাৎ নিদারুণ ভয় পেল সে, তার বাম হাতটা সাপের মত এগোল ব্যারেলটাকে সিধে করে ধরে রাখার জন্যে। দৈনিক কাগজটা খসে পড়ল, বেরিয়ে এল সাবমেশিনগান। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে ট্রিগারে টান দিল সে।

উঁচু মানের কমব্যাট-এ একটা রহস্য আছে। একজন জুডোকার নড়াচড়া মন্থর লাগে চোখে, আক্রমণ পুরোপুরি শুরু হবার আগে প্রতিপক্ষ যেন বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায়। এ এক অদ্ভুত ভ্রম বা মায়া। নিকেলও সেই ভ্রম বা মায়ার শিকার হলো, তার মনে হলো সোহানার ডান হাতটা অস্বাভাবিক ধীরগতিতে নড়ে উঠল, অথচ হঠাৎ করে সেখানে বেরিয়ে এল কালো একটা জিনিস। জিনিসটা প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠল, মাত্র একবার, সেই সঙ্গে একপাশে পড়ে যেতে শুরু করল সোহানা। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে মারা গেছে নিকেল, নাকের ঠিক ওপরে দুই ভুরু যেখানে এক হয়েছে সেখানে কালো একটা গর্ত তৈরি হলো, আধ সেকেন্ডেরও কম সময়ের ভেতর ছ'রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে থেমে গেল সাবমেশিনগানটা।

দ্রুত লবিতে ঢুকল ক্যাপ্টেন, হাতে একটা ·৪৫ রিভলভার। প্রথমে সোহানাকে দেখতে পেল সে, মেঝে থেকে সিধে হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে ছোট্ট ফ্রেঞ্চ এমএবি ·২৫ অটোমেটিকের মাযল থেকে। তারপর দেখল নিকেলকে, দুই ভুরুর মাঝখানে গাঢ় লাল একটা গর্ত, কাউন্টারে পড়ে থাকা সাবমেশিনগানের ওপর নেতিয়ে পড়ছে শরীরটা। সোহানার পেছনে, ওপর দিকের দেয়ালের প্লাস্টার ফাটল ধরেছে, খানিকটা খসেও পড়েছে মেঝেতে। মারা যাবার আগে নিকেলের ছিল ওটা সর্বশেষ কৃতিত্ব।

'পাশের গলিতে নিশ্চয়ই ওদের কোন গাড়ি আছে, পালাবার জন্যে,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল সোহানা। 'আপনি ওর জ্যাকেটটা গায়ে চড়ান, ক্যাপ্টেন।'

দশ সেকেন্ড পর সাইড ডোর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ, মাথাটা নিচু করে আছে। পোর্টারের জ্যাকেটটা বাতাসে উড়ছে শরীরের দু'পাশে, বোতাম লাগায়নি। সরু গলিতে সত্যি একটা গাড়ি রয়েছে, দেখল সে। কালো একটা পুরানো মার্সিডিজ। ভেতরে একজনই মাত্র লোক।

হাতলটা ধরল ক্যাপ্টেন, হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। হুইল ধরে আছে লোকটা, রিভলভারের ব্যারেল দিয়ে তার হাতের ওপর বাড়ি মারল সে, তারপর লোকটার মুখের ওপর চেপে ধরল মাযলটা। 'মি. রানা কোথায়?' হিসহিস করে জানতে চাইল সে, তার পিছনে উদয় হলো সোহানা।

হুইল ধরা হাতের দুটো আঙুল ভেঙে গেছে, ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে লোকটা, তা সত্ত্বেও ঠোঁট দুটো পরস্পরের সঙ্গে শক্তভাবে চেপে রাখল, চেহারায়

জেদ। রিভলভারের ব্যারেলটা এবার তার মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিল ক্যাপ্টেন। 'জবাব দাও!'

গুঙিয়ে উঠে পিছন দিকে সরে যাবার চেষ্টা করল লোকটা, থেঁতলানো জিভ আর ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে চিঁচিঁ করে বলল, 'ফোর ওয়ান ফাইভ···রুম ফোর ওয়ান ফাইভ।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন, রিভলভারের বাঁট দিয়ে লোকটার খুলির মাঝখানে বাড়ি মারল সজোরে, তারপর পিছিয়ে এল গাড়ির ভেতর থেকে। হোটেলের দিকে ছুটল দু'জন। প্রথমবার সোহানার লবিতে ঢোকার পর ষাট সেকেন্ড পেরিয়েছে। 'প্রাইভেট' লেখা একটা কামরা থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত এক লোক বেরিয়ে এল প্যাসেজে, পরনে ড্রেসিং গাউন। কোথাও একটা বেল বাজছে।

ধমক দিল ক্যাপ্টেন, 'ম্যানেজার?'

লোকটা মাথা ঝাঁকাল। 'গুলির শব্দ শুনলাম···!'

'ডাকাত পড়েছে। আপনার গেস্টদের বলুন তারা যেন রুম থেকে না বেরোয়। চিন্তার কিছু নেই, পৌঁছে গেছে পুলিস।'

লোকটাকে পাশ কাটিয়ে প্যাসেজ ধরে আবার ছুটল ওরা। সোহানা বলল, 'সিঁড়ি। এলিভেটর মাঝপথে থেমে যেতে পারে।' ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। সোহানার মুখে কোন রেখা বা ভাঁজ নেই, মসৃণ পাথরের মত। শুধু ঠোঁটের চারপাশে দৃঢ় প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসের একটা ভাব ফুটে আছে।

'আপনার ধারণা ওরা···মি. রানার জন্যে দেরি করে ফেলেছি আমরা?'

তিনটে করে ধাপ টপকে উঠে যাচ্ছে সোহানা। 'কি করে বলি। শুধু জানি এত সহজে ব্যাপারটা মিটবে না। নিশ্চয়ই আরও কিছু করে রেখেছে ওরা।'

অনেক নিচে থেকে ভেসে আসায় ভোঁতা শোনাল সাবমেশিনগানের আওয়াজ। স্থির দাঁড়িয়ে আছে রানা, ভাবছে শব্দটা শুরু হতে না হতে থেমে গেল কেন। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে ও। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে। চেষ্টা করেও এখন আর স্থির রাখতে পারছে না ডান হাতটা, থরথর করে কাঁপছে ওটা। ওটার সঙ্গে কাঁপছে বোমাটাও।

তবে সাবমেশিনগানের শব্দ বদলে দিল সব কিছু। সারা শরীরের ঘাম হঠাৎ করে বরফের মত ঠাণ্ডা লাগল। ব্যথাটা কমতে কমতে এক সময় মনে হলো, ওটা যেন এখন আর ওর শরীরের কোন অংশ নয়। প্লাস্টার ঢিলে করার জন্যে ঠোঁট দুটো ঘন ঘন নাড়ছিল, থেমে গেল রানা। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে একবার তাকাল বোমাটার দিকে, তারপর হ্যান্ডকাফ পরা কব্জিটা। ওর মনের একটা অংশ অসাড় হয়ে গেছে, বাকিটা অস্বাভাবিক পরিষ্কার।

দুটো কাফ-এর মাঝখানে ইস্পাতের চেইন, চেইনে ছ'টা লিঙ্ক। কব্জি বাঁকা করে মোচড়াল ও, নিচে নামিয়ে ওপরে তুলল। ওর কব্জির ওপর ঘুরে গেল কাফ, চেইনটা মোচড় খেল।

বোমা ধরা হাতটা অল্প অল্প কাঁপছে। সমস্ত মনোযোগ ওটার ওপর টেনে আনল রানা। কোন ভুল করা চলবে না। সোহানা নেই, তারমানে ওর কাঁধে অনেক

দায়িত্ব চে'পছে। অনেক লোককে খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে হবে। অটোসাজেশনে কাজ হলো, খানিক পর স্থির হলো ডান হাত। এরপর আবার মনোযোগ ফিরিয়ে আনল হ্যান্ডকাফের ওপর, চেইনের চারধারে ঘোরাতে শুরু করল কজি ও হাত।

একটু পর দৈর্ঘ্যে এক-দেড় ইঞ্চি ছোট হয়ে চেইন-লিঙ্কগুলো মোচড় খেয়ে একটার সঙ্গে অপরটা সেঁটে থাকল, ফলে ফ্লেক্সিবল চেইন হয়ে উঠল শক্ত একটা রড। হাতটা আর ঘোরাতে পারছে না রানা, চেষ্টা করলে আর বোধহয় এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ নাড়তে পারবে।

এবার।

মাথাটা ঝুলে পড়তে দিল রানা। ডান হাতটা ছাড়া শরীরের বাকি পেশী শিথিল করে দিল। অটোসাজেশন দিয়ে ইতিমধ্যে ডান হাতটাকে নিজের অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে ও, ওটা যেন ওর নয়। শ্বাস-প্রশ্বাস মন্থর হলো। খোলা চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মখমল অন্ধকারে ভেসে রয়েছে। ঘুমন্ত শক্তিগুলো জমা হচ্ছে একটা হাতে, যে হাতটা ওর নয়।

দু'মিনিট পেরিয়ে গেল।

মাথাটা উঠে এল আবার, নাক দিয়ে বড় করে শ্বাস নিল রানা। পরমুহূর্তে ওর বাম কাঁধ ও বাহুতে বিস্ফোরিত হলো বিপুল শক্তি। একত্রিত করা সমস্ত শক্তি দিয়ে পরস্পরের গায়ে সেঁটে থাকা লিঙ্কগুলোর বিরুদ্ধে হাতটা মোচড়াল রানা।

ব্যথা যেন অনেক দূরে। কাছে চলে আসছে, দাঁত বসাচ্ছে ওর কজিতে। দৃষ্টি ফিরে এল চোখে, নিচের দিকে তাকাল রানা। ওর বাম হাত শরীরের পাশে ঝুলছে। রেডিয়েটরের গায়ে সেঁটে থাকা কাফটা থেকে চেইনের দুটো লিঙ্কও ঝুলছে, ভেঙে গেছে তৃতীয়টা।

বাম হাতটা তুলল রানা। মাংস আগেই ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেই ক্ষতের গভীরে দাঁত বসিয়েছে মেটাল কাফ, তবে আঙুলগুলো নাড়তে পারছে। অত্যন্ত সাবধানে একপাশে সরতে শুরু করল ও, অসাড় ডান হাতটাকে বাঁকা হতে অনুরোধ করছে। তারপর বোমাটার ওপর কাঁপা দুটো হাত রাখল ও, বোমাটা ওর কাঁধের ওপর বসে আছে। দরদর করে ঘামছে মুখ, ভিজে গেছে প্লাস্টারটা।

ব্যস্ত হয়ো না। শান্ত হও। দরজাটা খোলার জন্যে কেউ আসছে না।

একটা পা তুলল রানা, বাম হাত নিচু করে জুতোবিহীন পা'টা থেকে মোজা খুলবে। আঙুলের হাড় পর্যন্ত মাংস কাটতে দেয়াটা বোকামি হবে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হলো রানা, তারটা যাতে যথেষ্ট ঝুলে পড়ে, তারপর তালু ও কজির ওপর পেঁচাল সেটাকে একবার, মোজাটা থাকল প্যাড হিসেবে।

প্রথমে ধীরে ধীরে, বোমাটাকে ধরে রেখে, টান দিল তারে। টান বাড়াল। আরও বাড়াল।

টং করে ছিঁড়ে গেল তার, সিলিঙে আটকানো স্ক্রু আইয়ের কিনারা থেকে। হাত দুটো আবার বোমার ওপর রেখে ধীরে ধীরে হাঁটু ভাঁজ করে বসল রানা, তারপর মেঝের ওপর নামিয়ে রাখল সাবধানে। ওটার ওপর ঝুঁকে থাকল ও, ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত কজির ওপরটা জ্বলছে, চেষ্টা করছে শরীরের কাঁপুনি

থামাতে, ঠিক এই সময় বিস্ফোরিত হলো জানালা।

ঝট করে ঘাড় ফেরাতেই রানা দেখল, একটা শাটার খুলে গেছে। মাটি থেকে পাঁচতলা উঁচু জানালার কার্নিসে উবু হয়ে বসে রয়েছে সোহানা। ওর হাতের একচোখো অটোমেটিক কামরার চারদিকে দৃষ্টি বুলাল। তারপর রানার ওপর স্থির হলো সোহানার দৃষ্টি। রানা অনুভব করল, ওর সমগ্র অস্তিত্ব থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে প্রচণ্ড আনন্দ। অনেক কষ্টে চেপে রাখল সেটাকে, মাথা ঝাঁকিয়ে সোহানার উপস্থিতির প্রতি সম্মান জানাল, তারপর দুর্বল একটা হাত তুলে ওপর দিকে তাক করল।

রানার পাশে চলে এল সোহানা, ওর দু'কাঁধের ওপর হাত রাখল একটা। তীক্ষ্ণ, স্বস্তিকর ব্যথা অনুভব করল রানা, টান দিয়ে মুখ থেকে প্লাস্টারটা খুলে নিয়েছে সোহানা। হাঁটু গেড়ে বসে আছে রানা, হাত দুটোও হাঁটুর ওপর, বিশ্রাম নিচ্ছে, হাঁপানোর মত করে বাতাস ভরছে ফুসফুসে। তারপর বেসুরো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'নিকেল?'

'লবির লোকটা?' এমএবি অটোমেটিকটা তুলে দেখাল সোহানা।

'শালারা!' বলল রানা। 'তারপরও তোমার জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা করা ছিল—দরজাটা যদি খুলতে।'

শার্টের নিচে, সেমি-শোল্ডার হোলস্টারে অস্ত্রটা রেখে দিল সোহানা। 'বিকল্প কিছু একটা থাকবে, এ আমি আন্দাজ করে নিয়েছিলাম, রানা। সেজন্যেই ওপরের একটা কামরা থেকে নেমে আসি। আমার সঙ্গে নাইলন কর্ড ছিল।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, ব্যথা সত্ত্বেও ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটল। 'তুমি নিরাপদে পৌঁছুতে পারবে জানলে কব্জিটা বাঁচাতে পারতাম,' বলল ও, গলাটা খসখসে, তবে আগের চেয়ে কম নিস্তেজ লাগল।

ওর কব্জিটা আলতোভাবে ধরল সোহানা। কাফের নিচে ক্ষতটা গোলাপী, ক্ষতের চার ধারে কালচে দাগ। মুখ নিচু করে ক্ষতটার চারধারে ঠোঁট বুলাল ও। তারপর কামরার চারধারে তাকাল। রেডিয়েটর পাইপের সঙ্গে হ্যান্ডকাফের অপর অংশটা দেখতে পেল। দৃষ্টি উঠে গেল ঝুলে থাকা তার ধরে সিলিঙে। সিলিঙ ও দরজার চৌকাঠে স্ক্রু-আই দুটোও দেখল। দৃষ্টি নেমে এসে স্থির হলো হলদু টিনের ওপর, ছেঁড়া তারটা বেরিয়ে রয়েছে। 'আজ একটা ফাঁড়া গেল, রানা। আমরা বেঁচে আছি, সেজেন্যে সাঙ্ঘাতিক আনন্দ লাগছে আমার।'

'আমারও,' বলল রানা। 'তবে এ আনন্দ কতক্ষণ টিকবে বলতে পারছি না।'

পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে। রানার কব্জি থেকে কাফটা খুলে নিয়েছে সোহানা। বোমাটাকে অকেজো করেছে ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ। এই মুহূর্তে বিছানায় শুয়ে আছে রানা, সিগারেট ফুঁকছে। দু'ঢোক হুইস্কি খাওয়ানো হয়েছে ওকে, সারা শরীরে আরামদায়ক একটা শৈথিল্য অনুভব করছে ও।

ওর কব্জি ভাঙেনি। ক্ষতটায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে সোহানা, বসে আছে বিছানার কিনারায়। ফোন করে একজন ডাক্তার আনিয়েছিল ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ, তাকে বিদায় করে দিয়েছে সোহানা। আশরাফকে ফোন করেছে ও, আকস্মিক

বিরাট স্বস্তিবোধ করায় 'তুমি শালী' বলে ওকে গাল দিয়েছে সে।

কামরাটাকে অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করছে ক্যাপ্টেন। ফোনে কথা বলছে সে, অসম্ভব রেগে আছে। আমেরিকান অপরাধী ও তাদের পদ্ধতি, দুটোই তার অপছন্দ। সে তার নিজের এলাকায় গ্যাংস্টারসুলভ খুন-খারাবি একবারেই সহ্য করবে না।

ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করল সোহানা, রানার মুখ থেকে সিগারেটটা তুলে নিল, ঠোঁটের ওপর আর্লতভাবে চুমো খেল একটা, তারপর আবার ঠোঁটের মাঝখানে গুঁজে দিল সেটা। বলা যায় সোহানার এটা একটা দুর্লভ আচরণ। রানা বুঝল, এটা আসলে ওর স্বস্তির প্রকাশ। ও মারা গেছে বলে ধরে নিয়েছিল সোহানা, এবং সেটা ভুল ছিল।

চোখ বুজে চিন্তা করছে রানা। সোহানা যে মারা গেছে, এ-ব্যাপারে ওর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। ভাবল, সন্দেহ থাকলে নিজেকে মুক্ত করতে পারত কিনা। প্রতিশোধ নেয়ার চরম একটা ব্যাকুলতা ওকে শক্তি যোগায়। ব্যাকুলতাটা এখনও আছে ওর ভেতর।

রিসিভার নামিয়ে রেখে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। 'এখন পর্যন্ত কোন খবর নেই,' গম্ভীর স্বরে বলল সে। 'তবে যত লোক পাওয়া গেছে তাদের সবাইকে এই কাজটায় লাগিয়েছি। আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় অনেক নিরীহ আমেরিকানকেও ভুগতে হবে, কিছু করার নেই।'

'আমরা এখান থেকে যাব কখন, ক্যাপ্টেন?' জানতে চাইল সোহানা।

হাত দুটো দু'দিকে মেলে ধরল ক্যাপ্টেন। 'যখন আপনাদের খুশি। পেনিফিদারের তরফ থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই। পালাতে ব্যস্ত সে, নিজের চামড়া বাঁচাতে পারলে তাকে মনে করতে হবে ভাগ্যবান।'

'খালের তিন মাইলের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারলে তাকে আপনারা ছুঁতে পারবেন না, কারণ ওখানে আপনাদের আইন অচল,' বলল সোহানা। 'খাল এখান থেকে খুব বেশি দূরেও নয়। পানামায় সে নিজের চামড়া বাঁচাতে পারবে, আমরা ধরে নিচ্ছি। তবে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে তাকে, আমাদের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর সময় পাবে না। লবিতে যে লোকটাকে মারলাম, তার ব্যাপারটা কি হবে?'

'লবিতে কোন্ লোক? যে লোকটা সাবমেশিনগান নিয়ে আমাকে হুমকি দিচ্ছিল? তাকে আমি খুন করেছি।'

'পয়েন্ট ফোর-ফাইভ গান থেকে পয়েন্ট টু-ফাইভ বুলেট ছুঁড়ে?'

হাসল ক্যাপ্টেন হার্মিটেজ। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস পুলিস বিভাগের ডাক্তার আমার সঙ্গে তর্ক করবে না।'

'আপনি আইন ভাঙছেন, ক্যাপ্টেন।'

'ভাঙি যদি ভাঙছি। আমার আগ্রহ জাস্টিস সম্পর্কে, ল সম্পর্কে নয়। দুটোর মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক পার্থক্য আছে।'

দাঁড়াল সোহানা, ক্ষীণ হাসল। 'আই লাইক ইউ, ইউ অনেস্ট কপ,' মৃদুকণ্ঠে বলল ও। 'আপনার এই উপকার আমাদের মনে থাকবে।'

'ধন্যবাদ। তবে আমি চাই না, আমার বন্ধুরা নিজেদের ঋণী বলে ভাবুক।'

আট

হেডসেট খুলে রেডিওটা বন্ধ করল দৈত্য। কোন শব্দ না করে হাসতে লাগল সে, ঝাঁকি খেয়ে প্রতিবাদ জানাল ফোল্ডিং চেয়ারটা।

খাকি ড্রিল শার্ট, একই কাপড়ের স্ল্যাকস পরে আছে সে, তার ছোট অথচ অসম্ভব চওড়া পা দুটোকে ঢাকার জন্যে নিশ্চয়ই গলদঘর্ম হতে হয়েছে দর্জিকে। 'ওহ ডিয়ার, ওহ ডিয়ার,' বলল সে। 'বেচারা পেনিফিদার।'

অপর লোকটা প্রায় এক ঘণ্টা হলো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়াচ্ছে। গাঢ় রঙের, সুন্দর ভাঁজ করা, লাইটওয়েট স্ল্যাকস পরে আছে সে, সঙ্গে সাদা একটা জেম ভেস্ট। লোকটা সুদর্শন, চেহারায় গোয়ার্তুমির ভাব, মাথার কালো চুল ছোট করে ছাঁটা। শরীরটা পেশীবহুল, হাঁটাচলা দেখলে মনে হবে সামরিক ট্রেনিং পেয়েছে। ইউনিফর্ম পরিয়ে দিলে হাঙ্গেরিয়ান মেজর বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যায়। তার নাম কোর্সিনেজ, উচ্চারণে খানিকটা নাকি সুর থাকলেও ভালই ইংরেজি বলে।

গভীর উপত্যকায় পাথর ঘেরা জায়গাটার সামনে নিঃসাড় পড়ে আছে মরুভূমি, সূর্যের শান্ত প্রখর উত্তাপে দগ্ধ হচ্ছে। আকাশ ছোঁয়া পাহাড় প্রাচীর ঘিরে রেখেছে উপত্যকাটাকে, এখানেও গরম লাগছে ওদের, তবে অসহ্য নয়। পাথর কেটে তৈরি করা কামরা আর প্যাসেজগুলোর বয়স হয়েছে, যারা তৈরি করেছিল, আজ তারা কেউ বেঁচে নেই।

জগিং থামিয়ে বার কয়েক হাতের পেশী ফোলাল কোর্সিনেজ, তারপর টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। রেডিওটার দিকে একবার তাকাল সে। 'মেয়েটাকে তাহলে ধরেছে ওরা।'

'মেয়েটিকে ধরেনি ওরা,' বলল দৈত্য, নিরেট মাংসে গভীর ভাঁজ তুলে হাসল সে। 'রানা ওদেরকে বোকা বানিয়েছে। ওকে ওরা ধরেছিল, সোহানার জন্যে একটা ফাঁদও পেতেছিল, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। সোহানাকে যার মারার কথা, সে নিজেই সোহানার হাতে মারা গেছে। বেচারা পেনিফিদার ছুটছে, তাকে ধাওয়া করছে পানামা পুলিসের সব ক'জন সদস্য।' কথা শেষ করে হো হো হা হা শুরু করল সে।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল কোর্সিনেজ বলল, 'এটা হাসির কোন ব্যাপার বলে আমার মনে হয় না।'

'না।' দৈত্যের প্রকাণ্ড নীল চোখ দুটো এক মুহূর্তের জন্যে স্থির হলো কোর্সিনেজের ওপর। 'না, তোমার মনে হবে না। আমার ধারণা, কৌতুকের অভাব আর বোকামি হাত ধরাধরি করে থাকে। যার ভেতরে হাসি নেই, তার ভেতর বুদ্ধিও নেই।' কোর্সিনেজ মনে মনে কথাটার তাৎপর্য পরিমাপ করার চেষ্টা করছে, তার দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে আছে দৈত্য, দেখল রাগে লালচে হয়ে উঠল

কোর্সিনেজের চেহারা, তবে সামলে রাখল নিজেকে। অলস একটা চিন্তা খেলে গেল দৈত্যের মাথায়, কোর্সিনেজ খানিকটা ভয় করে তাকে। ভয় করে, তবে খানিকটা, বেশি নয়। এ-ব্যাপারে সময় মত কিছু একটা করা দরকার তার, নিজেকে মনে করিয়ে দিল সে।

কোর্সিনেজ বলল, 'সময় বয়ে যাচ্ছে, অথচ মেয়েটাকে আমাদের দরকার। এখন কি ঘটবে?'

'মেয়েটা সম্ভবত ইংল্যান্ডের পথে রয়েছে এই মুহূর্তে,' প্রকাণ্ডদেহী বলল। 'রানা আর সোহানার নিরাপদ আশ্রয়ে। তুমি জানো, লন্ডন শহরেই শুধু নয়, গ্রামের দিকেও বিরাট একটা কটেজ আছে সোহানার? থাক, এত কথা জানার দরকার নেই তোমার। শুধু এইটুকু বলি, দেখেশুনে মনে হচ্ছে মেয়েটাকে আনার জন্যে আমাকেই যেতে হবে।' নিঃশব্দ হাসিতে আবার তার কাঁধ দুটো কাঁপতে শুরু করল।

'আর পেনিফিদার?'

'চারদিনের মাথায় আলজিয়ার্সে পৌঁছুবে। ইংল্যান্ডে যাবার আগে ওখানে তার সঙ্গে আমার দেখা হবে। ওহ্ ডিয়ার, তার মেজাজটা হবে দেখার মত!'

'এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে,' আবার বলল কোর্সিনেজ।

'আগেও একবার বলেছ।' এখনও হাসছে অতিকায় লোকটা। 'আবার যদি বলো, আমার হয়তো ঝোঁক চাপবে তোমার একটা হাড় ভাঙি, মেজর কোর্সিনেজ। কে জানে, আমি হয়তো তোমার মূল্যবান ডান হাতের হাড়টাকেই বেছে নেব।'

ঠোঁট দুটো শক্ত হয়ে গেল কোর্সিনেজের। 'এ-ধরনের হুমকি আমি পছন্দ করি না।'

'তাহলে এ ধরনের হুমকি আসার পথ খোলা রেখো না। আমাদের লেবার ফোর্স ঠিকঠাক মত কাজ করেছে, আমি যখন ছিলাম না?'

'প্রফেসর হোয়াইটস্টোনের ওয়াইফ পাগলামি শুরু করেছিল। রেস্ট-রুমে নিয়ে গিয়ে দাওয়াই দেয়ায় সেরে গেছে।'

'পাগলামি? মেমসাহেবা স্বয়ং?' একাধারে বিস্ময় ও পুলক অনুভব করল দৈত্য। 'পাগলামিতে পেয়েছিল বুড়িকে? হাত-পা ছুঁড়ছিল? চুল ছিঁড়ছিল মাথার? ছি-ছি, এমন একটা ব্যাপার আমার দেখার সুযোগ হলো না। তবে বুড়ি বোধহয় আবার ওরকম করবে, কি বলো? বাকি সবার খবর কি?'

কাঁধ ঝাঁকাল কোর্সিনেজ। 'আর কোন সমস্যা হয়নি,' এমন সুরে বলল সে, যেন সমস্যা না হওয়ায় হতাশ হয়েছে। 'সমাধির আশপাশের এলাকা অনেকটাই পরিষ্কার করেছে ওরা। তুমি তো দেখেইছ। কাজে একটু ঢিলেমি ছিল, তবে বাধ্য ছিল সবাই। কড়া দাওয়াই দিলে ওদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা যাবে না। তাতে শুধু ক্লান্ত করে তোলা হবে ওদের। কতটুকু দাওয়াই দিলে কাজ হবে, আমি সেটা জেনে ফেলেছি।'

'আর আমাদের প্রিয়পাত্ররা, মানে, আল্লার খাস বান্দারা?'

অর্থটা বোঝার জন্যে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল কোর্সিনেজ। তারপর বলল, 'আমাদের আলজিরিয়ান গার্ডরা কেউ কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনি।'

পাথরের দেয়াল ঘেরা চেম্বারে নিস্তব্ধতা নামল। মাথার ওপর একটা বৈদ্যুতিক ল্যাম্প জ্বলছে, দূর থেকে ভেসে আসছে জেনারেটরের একঘেয়ে শব্দ। পকেট থেকে রূপোর একটা ছোট বাক্স বের করে খুলল দৈত্য। ভেতরে সাদা পাউডার দেখা গেল। আঙুলে কোন রকম আড়ষ্ট ভাব নেই, এক চিমটা পাউডার নিয়ে পালা করে দু'নাকের ফুটোর সামনে ধরে শ্বাস টানল, যেন নস্যি নিচ্ছে। সন্ত্রস্ত ও বিতৃষ্ণার একটা ভাব ফুটে উঠল কোর্সিনেজের চেহারায়, দৈত্যের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'সাপ্লাই প্লেনে করে পাঠাবার জন্যে আমাদের অতিথিরা চিঠিপত্র লিখছে কিনা জানো?' জানতে চাইল প্রকাণ্ডদেহী; রূপোর বাক্সটা রেখে দিল পকেটে।

'লিখছে। সবগুলো চিঠি পরীক্ষা করছি আমি, তুমি জানো।'

'জানি। দেখে যেন মনে হয় সব কিছু স্বাভাবিক।' দৈত্যের ডান চোখে পানি জমতে শুরু করল, রুমাল দিয়ে মুছল সেটা। 'বর্তমান সিস্টেমে কাজটা শেষ করতে কত দিন লাগবে বলে মনে করো, মেজর কোর্সিনেজ?'

'এক মাস থেকে পাঁচ বছর। এত লম্বা সময়ের জন্যে সবকিছুর চেহারা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব নয়।'

'ঠিক। আর যদি মেয়েটাকে পাই?'

'পেনিফিদারের কথামত মেয়েটা সত্যি যদি কাজের হয়, তাহলে অল্প ক'দিনের মধ্যে কাজটা শেষ করতে পারব আমরা।'

'এ-ধরনের ব্যাপারে পেনিফিদার কখনও ভুল করে না। অল্প ক'দিন।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল দৈত্য। 'আপসোস। গোটা ব্যাপারটা সবেমাত্র ভাল লাগতে শুরু করেছে আমার। তবু, অল্প ক'দিনেই যতটুকু পারা যায় মজা করে নিতে হবে। পরিস্থিতি যেভাবে বদলাচ্ছে, আনন্দের খোরাক যথেষ্ট পরিমাণেই পাব মনে হচ্ছে।'

একটা ফোল্ডিং চেয়ার টেনে বসে পড়ল কোর্সিনেজ, তারপর সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকল। 'রানা আর সোহানাকে নিয়ে তুমি উদ্বিগ্ন নও?'

উজ্জ্বল হাসি ফুটল দৈত্যের মুখে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো এলোমেলো কালো চুলের নিচে ঠোঁট-কান-চোখ-নাক-ভুরু-কপাল-চিবুক-গোঁফ ইত্যাদি যতই বেখাপ্পা বা বেঢপ হোক, পরস্পরের সাথে ওগুলোর একটা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। 'উদ্বিগ্ন? খুব ভাল হয় অর্থটা যদি ব্যাখ্যা করতে পারো তুমি, মেজর কোর্সিনেজ। শব্দটা আমার কাছে রীতিমত একটা রহস্য।'

চেয়ারে হেলান দিল কোর্সিনেজ। দৈত্য সত্যি কথা বলছে, জানে সে, কিন্তু উত্তর খুঁজতে গিয়ে হতভম্ব বোধ করল। অবশেষে বলল, 'আমি আসলে বলতে চাইছি, ওদের সম্পর্কে যা শোনা যায় তা থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ওরা দু'জন অত্যন্ত বিপজ্জনক। পেনিফিদারের সবচেয়ে বড় অপারেশনটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল ওরা। শোনা যায়, ব্রিটিশ সরকার ওদেরকে ভাড়া করেছে, ক্রিমিন্যালদের ধরার জন্যে। খুবই নাকি বিপজ্জনক। ভাবছি আমাদের যদি বড় কোন ক্ষতি করে ফেলে?'

'ওহ্ নো! ওহ্ ডিয়্যার, নো!' মৃদু কণ্ঠে বলল বিশালদেহী লোকটা। 'এবার

এখানে আমি আছি না!' ভেজা চোখটা আবার মুছল সে। 'প্রার্থনা করো, সে চেষ্টা যেন করে ওরা, কোর্সিনেজ। আমি নিজে রানার ব্যবস্থা করতে চাই। প্রার্থনা করো, সে যেন সত্যি যোগ্য লোক হয়। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চাই না আমি। আশা করব, অন্তত কিছুক্ষণ যেন লড়তে পারে আমার সঙ্গে। দু'একটা মার খেয়ে পড়ে গেল, তারপর আর উঠল না, এরকম হলে আমার কিন্তু মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। ভাল কথা, মেয়েটাকে কেমন লাগে তোমার? তার আগে বলো, যেমন শুনছি, সত্যিই কি অপরূপ সুন্দরী সে—সোহানা?'

'বিশ্বসুন্দরী হতে পারে,' সহাস্যে বলল কোর্সিনেজ। 'তার ওপর আমার দুর্বলতা আছে।'

'তোমার দুর্বলতার প্রতি সম্মান দেখানো হবে,' কথা দিল দৈত্য। 'রানাকে আমি সামলাব, সোহানাকে তুলে দেয়া হবে তোমার হাতে। কি, খুশি?'

ব্যাকুল আগ্রহ ফুটে উঠল কোর্সিনেজের চেহারায়। 'তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব আমি,' বলল সে। 'খুবই খুশি হব।'

'ব্যাপারটা বেশ জমবে বলে মনে হচ্ছে।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল কোর্সিনেজ, কর্কশ পাথর দিয়ে তৈরি খিলানের দিকে এগোল। খিলানের সামনে একটা প্যাসেজ, এঁকেবেঁকে বেরিয়ে গেছে উপত্যকায়। দৈত্যটা তার দিকে তাকাল না, চেহারা দেখে মনে হতে পারে দিবাস্বপ্ন দেখছে। তাই যদি হয়, স্বপ্নটা নিশ্চয়ই খুব আনন্দদায়ক।

খিলানের নিচে দাঁড়াল কোর্সিনেজ, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। 'রানা কি ছুরি ব্যবহারে ওস্তাদ?'

'শুনেছি সে নাকি অনেক কিছুতেই ওস্তাদ,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল দৈত্য। 'হলেই ভাল। তবে ছুরি তার সবচেয়ে প্রিয় অস্ত্র, এ-কথা ঠিক নয়। আসলে পেনিফিদারের কয়েকজন শিষ্যকে ছুরি মেরে অচল করে দিয়েছিল রানা, সেই থেকে সবাই ধরে নিয়েছে হাতে ছুরি থাকলে ওর সঙ্গে পারা মুশকিল। তবে শুনেছি ছুরি ছুঁড়ে মারার আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে ওর, সেই বৈশিষ্ট্য দেখেই পেনিফিদার প্রথমে সন্দেহ করে, রানা জড়িত।'

'ছুরি,' বলল কোর্সিনেজ, 'কোন অস্ত্র নয়। ওটা কসাইদের হাতিয়ার।'

'প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একজন কসাইকেই তো চাই আমি।' অদম্য হাসিতে প্রকাণ্ড শরীরটা থরথর করে কাঁপতে লাগল, যদিও কোন শব্দ হলো না। 'প্রার্থনা করো সে শুধু কসাই হয়ে নয়, আমার সামনে যেন উদয় হয় জল্লাদ, পাষণ্ড, হিংস্র বাঘ, যম, অসুর হয়ে।' হাসির বেগ ক্রমশ বাড়ছে। 'তা না হলে আমি কিন্তু মজা পাব না!'

'ফর গডস সেক, এরকম কোরো না!' রুদ্ধশ্বাসে বলল আশরাফ। গতি কমিয়ে জেনির ঘোড়া দুলকি চালে ছুটছে, তার পাশে চলে এল সে। তার দিকে মাথা ঘুরিয়ে মুচকি হাসল জেনি। 'চেঁচিয়ো না তো! এদিকে কোন গাছ নেই যে মাথা নিচু করার দরকার আছে আমার। তাছাড়া, দেখেশুনে পা ফেলে জেনি, ভুল করে না।'

'কে বলল তোমার কথা ভাবছি আমি? সেনটর-এর নাম শুনেছ? উত্তমাঙ্গ

মনুষ্যতুল্য, নিম্নাঙ্গ অশ্ববৎ? তুমি তার মত ছুটতে পারো। আমি নিজের কথা ভাবছি। তোমাকে তীরবেগে ছুটতে দেখলে আমার বিটিও তাই ছোটে। সমস্যা হলো, তখন বিটির পিঠে থাকা আমার জন্যে একটা বিকট সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

ঘাস মোড়া ঢাল বেয়ে উঠছে ওরা, পিছনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আস্তাবল ও চাকরবাকরদের কোয়ার্টার। জায়গাটা বেনিলডন গ্রাম থেকে মাইল দুয়েক দূরে। 'তোমাকে হাঁটু ব্যবহার করতে হবে।' বলল জেনি। 'হাঁটু দিয়ে চেপে ধরতে হবে ঘোড়ার পেট।'

'চেপে ধরতে হবে? স্যাডিস্টিক হয়ো না তো! আরেকটু চাপ বাড়ালে হয় বেচারি বিটি ছাতু হয়ে যাবে, নয়তো আমার ঘাড় পর্যন্ত লম্বা একটা কাটল তৈরি হবে। ছন্দ সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই বিটির, আমি ডান দিকে কাত হয়ে পড়ছি দেখলে সে-ও ডান দিকে কাত হতে শুরু করে। বাম দিকে ঘোরো, যদি রেঞ্জে যেতে চাও।' ঢালের মাথা থেকে খানিকটা নামার পর ছোট একটা রেঞ্জে এসে পৌঁছুল ওরা। ছোট একটা মাঠ, আর্চারি রেঞ্জ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পিস্তল, কাদার তৈরি কবুতর, সবই রাখা আছে। তিন দিন হলো সোহানার এই বাড়িতে আছে জেনি, এরইমধ্যে তীর ছুঁড়ে কিভাবে লক্ষ্যভেদ করতে হয় শিখে ফেলেছে। টার্গেটের সাথে একটা বেল বাজাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে সোহানা, বোতাম টিপে অন করতে হয়। 'না,' বলল জেনি। 'চলো ফিরে যাই। আমার গলা শুকিয়ে গেছে, চা খাব।' হঠাৎ হাসল সে। 'কাপ-পিরিচ আর চামচের শব্দ কি যে ভাল লাগে আমার। বাজি ধরে বলতে পারি, কাপগুলো স্বচ্ছ, ওগুলোর ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চলে।'

'সোহানার গ্রামের এই বাড়িটায় বেশিরভাগ তৈজস-পত্রই এক ব্যারনের পারিবারিক সম্পত্তি ছিল,' বলল আশরাফ। 'নিলামে কিনেছে সোহানা। সবই খুব সুন্দর।' ক'টা দিন জেনির সঙ্গে থাকায় নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে, উপলব্ধি করে আশরাফ। আগে যে-সব বিষয়ে কোন আগ্রহ ছিল না তার, এখন সে-সব বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে।

আজ ছ'দিন হলো পানামা থেকে ফিরেছে ওরা। প্রথম তিন দিন ছিল লন্ডনে, সোহানার পেন্টহাউস। জেনিকে দেখেশুনে রাখার গুরুদায়িত্ব চাপানো হয়েছে তার কাঁধে। নিজের কাজে প্রায়ই বাইরে যাচ্ছে সোহানা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে কথা বলছে, জেনিকে সঙ্গ দেয়ার সময় নেই ওর। ইংল্যান্ড ছেড়ে কোথায় যেন গেছে রানা, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা লন্ডনে ছিল।

লন্ডন শহরটা জেনিকে ঘুরিয়ে দেখাবার পর তাকে নিয়ে গ্রামের এই বিশাল বাড়িটায় চলে এসেছে আশরাফ ও সোহানা। আশরাফের সময় কাটে জেনির সঙ্গে ঘোড়া চড়ে, তাস খেলে আর দাবা খেলা শিখিয়ে। জেনি তার জন্যে বোঝা নয়, আনন্দের একটা উৎস হয়ে উঠেছে। সোহানা ওদেরকে জানিয়েছে, পেনিফিদারের তরফ থেকে আপাতত কোন ভয় নেই। বিপদ হয়ে দেখা দেবে সে, তবে এখুনি নয়। তবে তার আগেই তাকে খুঁজে বের করা হবে, জানার চেষ্টা করা হবে ঠিক কি করতে চাইছে সে। সেজন্যেই ইংল্যান্ডের বাইরে গেছে রানা, পেনিফিদার আর তার দল সম্পর্কে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে।

স্কার্ফের বাইরে বেরিয়ে থাকা জেনির মধুরঙা চুল বাতাসে উড়ছে। মাত্র তিন দিনেই তার মুখের চেহারা রোদের ছোঁয়ায় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গ্রাম্য পরিবেশে নিজেকে দারুণ মানিয়ে নিয়েছে মেয়েটা। তার বয়েস যেন হঠাৎ করে কমে গেছে, আচার-আচরণেও হয়ে উঠেছে চঞ্চলা কিশোরী।

রানা ও সোহানা পেনিফিদারকে হাতে পেলে খুন করবে, এ-কথা জানার পর মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট বোধ করেছে আশরাফ, কোন অপরাধবোধ তাকে স্পর্শ করেনি। তবে ভয় পেয়েছে, কারণ পেনিফিদারের মত লোককে কাবু করা নিশ্চয়ই খুব কঠিন কাজ হবে।

আস্তাবলের কাছাকাছি এসে জেনি জানতে চাইল, 'তোমার কি মনে হয়, আজ ফিরে আসবে ও?'

'আসবে,' বলল আশরাফ, জানে রানার কথা বলছে জেনি। সে এ-ও জানে যে জেনির জগতে এই মুহূর্তে মাত্র একটি জিনিসেরই অভাব—মাসুদ রানা। ওর প্রতি তার অসম্ভব ভক্তি। 'আমস্টারডাম থেকে কাল লন্ডনে ফিরেছে ও। সোহানা বলছিল, লন্ডনে কিছু কাজ আছে, সেগুলো শেষ হলেই এখানে চলে আসবে।'

'ভাল লাগছে আমার। মাত্র ক'দিন হলো গেছে, তা-ও মনে হচ্ছে কত যুগ ওর গলা শুনিনি। এই, তুমি আবার ঠোঁট ফোলাচ্ছ নাকি? শোনো—তুমি যদি কোথাও যাও, তোমার জন্যেও এই একই অনুভূতি হবে আমার, বুঝলে!'

'দেরি করে ফেলেছ তুমি।' নিঃশব্দে হাসল আশরাফ। 'যা বলে ফেলেছ তা আর ফিরিয়ে নিতে পারো না।'

'পাজি লোক!' আশরাফকে ভেংচাল জেনি। 'রেঞ্জে যখন থামলাম, একটা গাড়ির আওয়াজ পেয়েছি আমি। হয়তো রানা ফিরে এসেছে।'

আস্তাবলের সামনে ঘোড়া থেকে নামল ওরা। সহিসের হাতে লাগাম ধরিয়ে দিয়ে কটেজের দিকে হাঁটা ধরল। কটেজের সামনে এসে দেখল, ছোট বাগানটার পাশে একটা ল্যান্ডরোভার দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'রানা নয়, মারভিন লংফেলো এসেছেন,' বলল আশরাফ।

'মারভিন লংফেলো?'

'রানা ও সোহানার শুভানুধ্যায়ী বলতে পারো। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সরকারি চাকরি করেন, খুব বড় পদে আছেন। তবে তাঁর সম্পর্কে বেশি কিছু জানতে চেয়ো না আমার কাছে।'

'কেন?'

'এরই মধ্যে ভুলে গেলে? বললাম না, কোন প্রশ্ন নয়।'

'বুঝেছি, তার মানে রানা ও সোহানার মত ইনিও পুলিস বা গোয়েন্দা টাইপের কিছু হবেন। নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে ভালবাসেন।' হাসল জেনি। 'ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পাল্টাতে পারি?'

'অবশ্যই। আমিও তাই করব।' জেনির হাত ধরে কটেজের পিছন দিকে চলে এল আশরাফ, দরজা খোলা দেখে ঢুকে পড়ল কিচেনে।

কটেজটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। হলরুমে বিরাট একটা পাথরের তৈরি ফায়ারপ্লেস আছে। ওপরতলায় পাঁচটা বেডরুম, ছ'টা প্যাসেজ, ছ'টা বাথরুম। সিঁড়ি বেয়ে

উঠে এসে আশরাফ জানতে চাইল, 'তোমার কোন সাহায্য দরকার?'

'না। কোথায় কি আছে সব আমি জেনে ফেলেছি।'

'গুড। আমি তাহলে হলরুমে অপেক্ষা করব।'

'দশ মিনিট পর আসছি।'

'ড. জিমসনের ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই উচিত আমাদের,' চুরুট ধরিয়ে কার্পেটের ওপর পা দুটো লম্বা করে দিলেন বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলো। লিভিংরুমে বসে আছেন তিনি।

'কেন বলুন তো? আমার তো মনে হয়েছে, ভদ্রলোক খুন হয়েছেন।' প্রকাণ্ড একটা আর্মচেয়ারে বসে রয়েছে সোহানা, হাঁটুর কাছে ভাঁজ করা পা দুটো শরীরের নিচে ঢাকা। হাত-কাটা একটা জাম্পার পরেছে সে, কাশ্মীরী উলের। পাকা ধান রঙের স্কার্ট।

'খুন-খারাবি পুলিসের ব্যাপার,' বললেন মারভিন লংফেলো। সোহানার হাতে ধরা আইডেনটিকিট ছবিটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'ওদেরকে ওটার একটা কপি দিয়েছি আমি। কিন্তু তাকে ওরা খুঁজে পাচ্ছে না। আমার ধারণা, ইংল্যাণ্ডে নেই সে। এরকম একটা কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীকে খুঁজে না পাবার আর কি কারণ থাকতে পারে। পিক জনসন এয়ারপোর্ট থেকে রিপোর্ট পেয়েছে, কেউ তাকে দেখেনি।'

'সে যদি ডিপারচার কন্ট্রোল থেকে বেরিয়ে যায়, দেখতে পাবার কথাও নয়। কিংবা হয়তো বেরিয়ে যাবার আরও পথ তার আছে।' মারভিন লংফেলোকে কাঁধ ঝাঁকাতে দেখে সোহানার চোখে কৌতূহল ফুটে উঠল। 'আপনাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এটা আমার কোন কেস নয়; জিমসন আমার বন্ধু ছিলেন, সেজন্যেই মাস-এ কি ঘটছে না ঘটছে আপনাকে একবার দেখে আসার অনুরোধ করেছিলাম। তিনিই যখন নেই, এ-ব্যাপারে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ কি।'

'আমি তো ভেবেছিলাম যদি জানা যায় ড. জিমসন খুন হয়েছেন, আপনি তাহলে আরও তাড়াতাড়ি ওখানে আমাকে যেতে বলবেন।'

'যদি। যদি খুন হয়, আমরা সঠিক জানি না।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন বিএসএস চীফ। 'আমি চাই তাঁর ব্যাপারটা আপনি ভুলে যান। আপনাদের আসল সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে পেনিফিদার।'

'আপাতত, হ্যাঁ। কিন্তু এটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করে ফেলব।' এক মুহূর্ত বিরতি নিয়ে আবার বলল সোহানা, 'অন্তত জেনির নিরাপত্তার কথা ভেবে দেরি করা ঠিক হবে না। এই কাজটা শেষ করে মাস-এ একবার যেতে পারি আমি।'

প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্যে মারভিন লংফেলো বললেন, 'আপনি আমাকে চা অফার করবেন না? গলাটা শুকিয়ে গেছে।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ তাকিয়ে থাকল সোহানা, তারপর মৃদু হেসে চেয়ার ছাড়ল। 'পাঁচ মিনিট ধৈর্য ধরতে হবে আপনাকে। আর সবার জন্যে অপেক্ষা

করছিলাম। চা পরিবেশনের সময় উপস্থিত থাকতে ভারি পছন্দ করে জেনি। আজ তার জন্যে একটা বোনাসও আছে—মারভিন লংফেলো।'

'তাকে তার রঙিন স্বপ্ন ও ভুল ধারণা নিয়ে থাকতে দিন,' অনুরোধ করলেন বিএসএস চীফ। 'বলবেন না আমি কে বা কি।'

চাকরবাকরের সংখ্যা কম নয়, তবু অতিথিদের নিজের হাতে চা পরিবেশন করে আনন্দ পায় সোহানা। পাঁচ মিনিট পর একটা ট্রলি ঠেলে লিভিংরূমে ঢুকল সে, দেখল জেনির সঙ্গে মারভিন লংফেলোর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আশরাফ। জেনির হাতটা ধরে, সেটার ওপর মাথাটা সামান্য নিচু করলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

'প্রথমে আঙুলগুলো গুনে দেখো, দু'একটা চুরি গেছে কিনা,' জেনিকে বলল সোহানা। 'তারপর সবাইকে চা দিতে সাহায্য করো আমাকে, হাত বলতে যদি অবশিষ্ট কিছু থাকে।'

'মিথ্যে অপবাদ,' ভারী গলায় বললেন মারভিন লংফেলো। কথা বলার সময় বিস্ময় ও প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন সোহানার দিকে, উত্তরে অভয়দানের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সোহানা, মেয়েটার ওপর নজর রাখার ইঙ্গিত করল।

মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন মারভিন লংফেলো, ট্রলিতে রাখা কাপ, প্লেট, পিরিচ, চামচ ইত্যাদির ওপর হালকাভাবে আঙুল বোলাচ্ছে জেনি, মৃদু শ্বাস টেনে গন্ধ নিচ্ছে। 'পনির। স্ট্রবেরি জ্যাম,' তার গলায় তৃপ্তি। 'কে ঢালবে?'

পরিবেশে কোন রকম আড়ষ্টতা থাকল না, সবাই সহজ সুরে কথা বলছে। মারভিন লংফেলোর প্রশ্নের উত্তরে সোহানা জানাল, 'হ্যাঁ, যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে রানা। তবে ওর সঙ্গে আমি কথা বলব না।'

'কেন? কেন?' জানতে চাইল আশরাফ।

'এবার আমার জন্যে কোন উপহার আনেনি ও। যখনই ছুটিতে কোথাও যায়, কিছু না কিছু একটা আনে। কিন্তু পানামা থেকে কিছুই আনেনি।'

'লোভী মেয়ে,' সহাস্যে বলল আশরাফ। 'পানামায় অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল রানা। কি ধরনের উপহার আশা করছিলে তুমি?'

'মোটেও লোভী নই,' প্রতিবাদ জানাল সোহানা। 'রানার উপহার আমার ভাল লাগে। কি আশা করছিলাম, বলতে পারব না। কখনোই খুব দামী কিছু আনে না রানা। তবে যখনই যা এনেছে, সেটা বিশেষ ধরনের একটা কিছু।'

'আইভরি স্টক সহ উইলিয়ামসন ডেরিঞ্জার জোড়াকে আমি অমূল্য রতন বলতে পারি,' মন্তব্য করলেন মারভিন লংফেলো।

মুখ হাঁড়ি করল আশরাফ। 'গানস।'

'অ্যান্টিকস।' হাতের কাপটা নামিয়ে রাখল সোহানা। 'ভারি সুন্দর জিনিস ওগুলো। গতবার এনেছিল প্রাচীন মুদ্রা দিয়ে বানানো ছ'টা বোতাম।'

'কই, আমি তো দেখিনি!' বলল আশরাফ।

'কোভেন্ট গার্ডেনের ব্যালে অনুষ্ঠানে নাচতে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে রানা, ওই বোতাম লাগানো একটা হলুদ ড্রেস পরেছিলাম আমি। বোতামগুলো দেখে অনেকেরই চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। তুমি যদি কোনদিন ওখানে আমাকে নাচতে নিয়ে যাও, ড্রেসটা আবার একবার পরতে পারি…।'

হঠাৎ থেমে গেল সোহানা। কাতর একটা শব্দ করে এক হাতে কপালটা চেপে ধরল আশরাফ। বলল, 'আশ্চর্য! ফ্রিজের ওপর শেলফে রেখেছি ওটা। তুমি দেখোনি?'

'কি দেখব?'

'ছোট একটা পার্সেল। রানার হাতে ঠিকানা লেখা। আজ সকালে তুমি গ্রামে গিয়েছিলে, পোস্টম্যান দিয়ে গেল।' হঠাৎ আশরাফের গলায় রাগের আভাস পাওয়া গেল। 'কানাডিয়ান মেয়েটা কোন কম্মেরই নয়। আমাকে মনে করিয়ে দিতে পারত!'

প্রায় লাফিয়ে উঠল জেনি। 'বারে, আমাকে দুষছ কেন! আমাকে তো তুমি বলোইনি!'

'তোমার জানতে চাওয়া উচিত ছিল! থাক-থাক, এ নিয়ে আর ঝগড়া করতে চাই না।' চেয়ার ছেড়ে কিচেনের দিকে চলে গেল আশরাফ। একটু পরই একটা প্যাকেট নিয়ে ফিরে এল সে, আকারে সিগার বক্সের মত। সোহানার হাতে ধরিয়ে দিল সেটা। 'কোন স্ট্যাম্প ছিল না। পোস্ট খরচা আমাকে মেটাতে হয়েছে।'

'স্ট্যাম্প না থাকলে নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় পার্সেল পৌঁছুবে।' প্যাকেট খুলে একটা টিনের বাক্স বের করল সোহানা, বাক্স খুলে ভেতরে তাকিয়ে থাকল। ওর চেহারায় এমন একটা ভাব ফুটে উঠল, আশরাফ বা মারভিন লংফেলো আগে কখনও দেখেননি।

কারও মুখে কথা নেই। মনে হলো যেন এক যুগ পর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সোহানা, জানালার পাশে ফেলা ওক কাঠের তৈরি সাইডটেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও, তারপর অত্যন্ত সাবধানে বাক্সটা থেকে কি যেন একটা বের করে ছড়িয়ে দিল টেবিলের ওপর।

মারভিন লংফেলো দাঁড়ালেন। আশরাফ ধরল জেনির হাত। সবাই ওরা টেবিলের চারপাশে ভিড় করল। চৌকো ও কালো মখমলের ওপর মুক্তোর একটা নেকলেস পড়ে রয়েছে। নেকলেসটা হাত দিয়ে সিধে করল সোহানা, তারপর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ওটার দিকে, চেহারা থেকে অদ্ভুত একটা উজ্জ্বল আভা ফুটে বেরুচ্ছে।

জেনিকে ফিসফিস করে বলল আশরাফ, 'মুক্তো। নেকলেস। অপূর্ব।' তারপর, সোহানাকে, 'সন্দেহ নেই, বিশেষ ধরনের একটা কিছুই—তবে এটা যদি দামী কিছু না হয় তো আমি হলাম গিয়ে বাংলাদেশের রানী।'

মারভিন লংফেলো দম আটকে রেখেছেন। সব মিলিয়ে সাঁইত্রিশটা মুক্তো। মাঝখানের মুক্তোটার ওজন হবে কম করেও একশো গ্রেন, বাকিগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে এসেছে, সবচেয়ে ছোটটার ওজন হবে পঁচিশ গ্রেন। ছোট কজাটা বসানো হয়েছে রূপোর মঞ্চের ওপর, চারদিকে একগুচ্ছ খুদে মুক্তো। পুরো নেকলেসটা ঝলমল করছে। সাধারণ দেখতে, কিন্তু অপূর্ব সুন্দর। মুক্তোগুলো সাজানোর ভঙ্গিটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। রঙের এমন বাহার সহজে দেখা যায় না। হঠাৎ হাততালি দেয়ার প্রবল একটা ঝোঁক চাপল মারভিন লংফেলোর, কারণ তিনি যা লক্ষ করেছেন আর কারও চোখে তা ধরা পড়েনি। 'আশ্চর্য তো! দেখছেন, প্রায় সব

রঙের মুক্তো রয়েছে ওটায়। গোলাপী, স্বচ্ছ নীল, ক্রীম, দুধসাদা, কালো···মাই গড!' দম নিয়ে আবার বললেন তিনি, 'মন্তব্যটা ভদ্রতাবিরুদ্ধ হয়ে যাবে, তবু না করে পারছি না। আমার ধারণা, লন্ডনের বাজারে আপনার এই নেকলেসটা সত্তর হাজার পাউন্ডে বিক্রি করা কোন সমস্যাই নয়।'

নিঃশব্দে সোহানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল আশরাফ, ইঙ্গিতে জেনিকে দেখাল, বলল, 'মে আই?' অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। নেকলেসটা তুলে নিয়ে জেনির হাতে গুঁজে দিল আশরাফ। 'অনুভব করো, জেনি।'

মারভিন লংফেলো বললেন, 'রানা এটা পানামা থেকে কিনেছেন, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।'

নেকলেসটা আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করছে জেনি, সেদিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। 'এটা,' বলল জেনি। 'হ্যাঁ, এটা। ওই লোকগুলোর হাত থেকে আমাকে যেদিন উদ্ধার করল রানা, সেদিনই পায় এটা।'

'পায়?' হতভম্ব দেখাল আশরাফকে।

এই প্রথম কথা বলল সোহানা, অনিশ্চিত সুরে, 'হ্যাঁ···এতদিনে আমি বুঝতে পারছি গত সাত বছর ধরে হঠাৎ করে কেন উধাও হয়ে যেত রানা। এরকম রঙ মেলানো মুক্তো কোথাও তুমি পাবে না, আশরাফ। এরকম আগে কেউ কখনও দেখোনি তোমরা। কারণ হলো, দুনিয়ার বিভিন্ন পার্ল-বেড থেকে এসেছে ওগুলো।' আশরাফের দিক থেকে মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল সে। 'ওগুলো রানা কেনেনি। ডুব দিয়ে সাগর থেকে তুলে এনেছে।'

শান্ত গলায় মারভিন লংফেলো উচ্চারণ করলেন, 'গড অলমাইটি!' তারপর দীর্ঘ নিস্তব্ধতা ভাঙলেন নিজেই, 'তারমানে ওগুলো বাছাই করা মুক্তো। রঙ মেলানো মুক্তোর একটা নেকলেস তৈরি করতে হলে কয়েক হাজার মুক্তো দরকার।'

'হ্যাঁ,' বলল সোহানা, যেন জোর করে কথা বলছে সে। 'আর প্রতিটি ঝিনুকেই মুক্তো থাকে না। প্রতি একশো ঝিনুকেও একটা মুক্তো পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।' হাত বাড়াল সে, আলতোভাবে জেনির হাত থেকে তুলে নিয়ে কালো মখমলের ওপর রাখল আবার। 'এ-ব্যাপারে আমার ধারণা আছে, কাজেই আমাকে বলতে দাও। ভাল একজন ডাইভার একদিনে খুব বেশি হলে দু'শো মুক্তো তুলতে পারে। তারমানে এই নেকলেসটা বানাতে তোমার দরকার হবে···এই ধরো, তুমি যদি ভাগ্যবান হও, পঞ্চাশ হাজার ঝিনুক। তবে যদি তুমি দক্ষ হও বা কোন দুর্ঘটনায় না পড়। বেন্ড-এর শিকার হতে পার, কিংবা হয়তো কাছে চলে আসার আগে হাঙরটাকে দেখতে পেলে না।' মাঝখানের মুক্তোটাকে বাদ দিয়ে দু'পাশের দুটোয় আঙুল বুলাল সোহানা। 'এগুলো ওরিয়েন্টাল, পারশিয়ান গালফ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে; স্বচ্ছ ইস্পাতের মত নীলচে, এগুলো মাদ্রাজ থেকে; তারপর শ্রীলংকা, পানামা, শার্ক বে ও ফিলিপাইন; বাকিগুলোর খবর আমার জানা নেই। কালো দুটো বোধহয় তাহিতি থেকে এনেছে রানা।'

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না।

'সাত বছরে ন'মাস শুধু এই কাজেই ব্যয় করেছে রানা,' নিস্তব্ধতা ভাঙল

আশরাফ, তার হাসিতে অবিশ্বাসের সুর।

সোহানার হাতে হাত রেখে জেনি বলল, 'রানা যেন এসে দেখে ওটা তুমি পরে আছ। বলো, কিসের সঙ্গে পরবে তুমি ওটা?'

আশরাফ বলল, 'জাম্পারটা হবে হলুদ, যেটা পরতে দেখলে আমাদের চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইবে। যাও, সোহানা, কালো ড্রেসটা পরো তুমি, যেটার গলা গোল।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সোহানা বলল, 'হ্যাঁ...ঠিক আছে।'

'দোহাই লাগে, এবার একটু হাসো তুমি, সোহানা!' বলল আশরাফ। 'স্বীকার করি, হতভম্ব হবার কারণ আছে। আমার নিজেরই সেরকম লাগছে। তবে যে মেয়ে সত্তর লাখ পাউন্ড দামের মুক্তো পরার সুযোগ পেয়েছে তার মুখে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করা বিড়ালের নিঃশব্দ হাসি থাকা উচিত। তোমার উইন্ডস্ক্রীনের স্টিকারের চেয়ে ভাল এটা, তাই না?'

ভুরুতে একটা হাত ঘষল সোহানা। 'আমি জানি, আশরাফ। আমি জানি। কিন্তু ভাবছি রানাকে আমি এ-ধরনের একটা জিনিসের জন্যে ধন্যবাদ জানাব কিভাবে?'

আশরাফ এই প্রথম সোহানাকে কোন ব্যাপারে অনিশ্চয়তায় ভুগতে দেখল। অদ্ভুত একটা সন্তোষ বোধ করল সে। মারভিন লংফেলোর চোখের পাতা সামান্য কেঁপে ওঠায় সে বুঝল, তাঁরও একই অনুভূতি হচ্ছে। হাসল সে, খুশি ভরা গলায় বলল, 'তুমি ওটা পরে ওর সামনে দাঁড়ালেই ধন্যবাদ জানানো হবে। তারপর না হয় বলো, অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেয়া উচিত নয়। তারপরও যদি তোমার মনে হয় ধন্যবাদ জানানো হয়নি, কেঁদে ফেলো। রানা বুঝে নেবে, এটা তোমার আনন্দের কান্না। এবার যাও, কালো ড্রেসটা পরে এসো।'

নয়

বাগানে বসে দ্বিতীয় কাপ চা খাচ্ছেন মারভিন লংফেলো, পাশে বসে আছে আশরাফ, কটেজ থেকে বেরিয়ে এসে বাগানে ঢুকল সোহানা ও জেনি। আশরাফের ভাষায় কালো ড্রেসটাই পরেছে সোহানা, তবে আসলে ওটা চারকোল গ্রে। সরু, মেদহীন গলায় মুক্তোগুলোকে দেখে সন্তুষ্টচিত্তে নিঃশ্বাস ফেললেন মারভিন লংফেলো।

রানা এখনও আসেনি।

'গাছপালা আর বাড়ির মাঝখানের ওই জায়গাটায় আমরা একটা পুকুর কাটতে চাই,' বলল সোহানা। 'কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।' জেনি বসার পর সে-ও তার পাশে একটা খালি চেয়ারে বসল। 'লোকাল কাউন্সিল অফিসে আগুন লেগেছিল, ফলে সমস্ত রেকর্ড পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গ্যাস পাইপ, পানির পাইপ, ইলেকট্রিক কেবল, সুয়ারেজ লাইন ইত্যাদি কোথায় কি আছে বিস্তারিত

জানা যাচ্ছে না।'

'কি করবে বলে ভেবেছ?' জানতে চাইল আশরাফ।

'কিছু না জেনে মাটি খুঁড়তে পারি না। ভাবছি কোন ধরনের ডিটেক্টর সাহায্য করতে পারবে কিনা।'

আশরাফ অনুভব করল, হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল জেনি। তার দিকে তাকাল সে। চেহারা দেখে মনে হলো, যেন কোন সিদ্ধান্তে পৌছুল মেয়েটা। পেশীতে ঢিল দিল সে, তারপর বলল, 'কাজটা আমাকে দাও, সোহানা। আমি করে দেব। গ্যারেজে তার-টার কিছু আছে? গালভানাইজড ওয়্যার হলে ভাল হয়।'

তাড়াতাড়ি জেনির দিকে তাকাল সোহানা। 'মানে? কি বলতে চাও, জেনি?'

'আমি তো এই কাজই করি। পাইপ ইত্যাদি খুঁজে বের করি।'

'মি. লংফেলোর সঙ্গে গল্প করো তুমি। আশরাফ, চলো দেখি কিছু পাই কিনা।'

গ্যারেজের ভেতর তিনটে গাড়ি রয়েছে, ভেতরে ঢুকে সোহানা জিজ্ঞেস করল, 'কোন ধরনের ডাউজিং? ওয়াটার ডিভাইনিং?'

মাথা ঝাঁকাল আশরাফ। 'আ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল কাইন্ড। বিষয়টার ওপর অনেক আগেই পড়াশোনা শুরু করা উচিত ছিল আমার। এই একটা রহস্য, যেটা নিয়ে প্রায় কোন রিসার্চ হয়নি বললেই চলে।'

'জেনি সাইকিক?'

হেসে উঠল আশরাফ। 'এর জন্যে সাইকিক হবার দরকার নেই, সেজন্যেই ব্যাপারটা আমাদের মত অল্প জ্ঞানী লোকের কাছে দুর্বোধ্য। মজার ব্যাপার হলো, সাইকিক ক্ষমতা নেই এমন বহু লোক পাইপ-লোকেটর হিসেবে বিভিন্ন মাত্রায় সাফল্য অর্জন করে। পরীক্ষা করে দেখলে হয়তো জানা যাবে তোমার ভেতরও এই গুণটা আছে।'

'সবারই থাকে?'

'সেরকমই ধারণা করা হয়।' গ্যারেজের চারদিকে চোখ বুলাল আশরাফ। এগিয়ে গেল দেয়ালের দিকে। বড় একটা পেরেকের সঙ্গে ফাইভ-গেজ গালভানাইজড স্টীল ওয়্যারের একটা কয়েল ঝুলছে। 'মিশিগানে একটা কোম্পানি পাইপ-লোকেটর তৈরি করে। বুদ্ধিমান এঞ্জিনিয়াররা কাজে লাগায় তাদের। আমার ধারণা, এ-বিষয়ে দুর্লভ কোন বৈশিষ্ট্য আছে জেনির। দেখো তো, কোথাও একটা প্লায়ার্স আছে কিনা।'

গ্যারেজের একপাশে ওঅর্কশপ, একটা বেঞ্চের ওপর থেকে প্লায়ার্স নিয়ে ফিরে এল সোহানা। কয়েল থেকে দু'টুকরো তার কাটল আশরাফ, প্রতিটি এক ফুটের চেয়ে একটু বেশি লম্বা।

'তুমি ওয়াটার ডিভাইনিং-এর কথা বলছিলে,' বলল আশরাফ, 'কিন্তু পাইপে পানি থাক বা না থাক, সেটা কোন ব্যাপার না। মিশিগানের ওয়াটার সাপ্লাই ডিভিশন ওদেরকে কাস্ট-আয়রন পাইপ, ক্লে-টাইল ড্রেন, ব্রিক ইনটেক খুঁজে বের করার কাজে ব্যবহার করে। ভিজে হোক বা শুকনো। অন্যান্য কোম্পানি ওদেরকে দিয়ে চিহ্নিত করায় গ্যাস পাইপ বা ইলেকট্রিক পাইপ।'

'বলছ পড়াশোনা নেই, অথচ দেখছি অনেক কিছুই জানো।'

'একে জানা বলে না। বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর যুক্তি হলো, বিষয়টা ব্যাখ্যা করা যায় না, কাজেই এটার সাহায্যে কোন কাজও হয় না। কিন্তু এঞ্জিনিয়াররা এদের সাহায্য নিয়ে অনেক জায়গায় কাজ করছে, বিশেষ করে আমেরিকায়। তাদের সাফল্যের দাবিও কম জোরাল নয়।' তারের টুকরো দুটো সিধে করল আশরাফ, তারপর দুটোকেই ডান দিকে বাঁকা করল; একটা তারের বাহু হলো দুটো, একটার চেয়ে অপরটা বেশি লম্বা।

সোহানা জানতে চাইল, 'শতকরা কত ভাগ সফল হয়?'

'হিসাবটা আমার জানা নেই,' বলল আশরাফ। 'তবে জানি কনেকটিকাট-এর মিংফোর্ড ওয়াটার ওঅর্কস গত পনেরো বছর ধরে পাইপ-লোকেটরদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে। তামার ওই টিউবটা তোমার কোন কাজে আসবে?'

'না। কেন?'

'জেনিকে অবাক করে দেব। হ্যাকস' আছে?'

আধ ইঞ্চি চওড়া তামার টিউবটাকে কেটে দুটো টুকরো করল আশরাফ, প্রতিটি চার ইঞ্চি লম্বা। 'শুনেছি,' বলল সে, 'কোট-হ্যাঙ্গার-এর তার দিয়েও নাকি এই কাজ করে লোকে—শুধু তাই নয়, কাজটা করে ম্যাপের ওপর, মাটিতে নয়।'

'কি!'

'অবশ্য সেগুলো বেশ পুরানো ম্যাপ। এখানে অবশ্য সাইকিক ক্ষমতা অবশ্যই দরকার।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আশরাফ। 'খুব তাড়াতাড়ি এ-বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করব আমি। জেনি আমার এক্সপেরিমেন্টে সাহায্য করতে পারে।' ভুরু জোড়া হঠাৎ কুঁচকে উঠল তার। 'আশ্চর্য, নিজের এই গুণ সম্পর্কে কাউকে কিছু বলেনি জেনি!'

'আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তুমি যে অতীন্দ্রিয় ব্যাপারস্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাও, সহজে কথাটা জানাও কাউকে?'

বাঁকা তারের প্রতিটি ছোট বাহু তামার টিউবে ঢুকিয়ে দিল আশরাফ। 'ও, মানুষ হাসতে পারে এই ভয়ে কাউকে কিছু বলেনি।' দু'হাতে দুটো তামার টিউব ধরল সে, ফলে তারের বাকি দুটো বাহু সোহানার দিকে পিস্তলের মত তাক করা অবস্থায় থাকল। চলো এবার।'

বাগানে ওরা ঢুকতে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জেনি। 'তোমরা যদি কোন তার না পাও, একটা কোট-হ্যাঙ্গার হলেও চলবে।'

ঠোঁট-টেপা হাসি নিয়ে সোহানার দিকে তাকাল আশরাফ। 'এইমাত্র আমিও তাই বলছিলাম, জেনি। তবে তার চেয়ে ভাল জিনিস পেয়েছি আমরা। নাও।'

টিউব অর্থাৎ হাতল দুটো জেনির হাতে ধরিয়ে দিল আশরাফ। ধরার পর জেনির চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল। 'এগুলো তো প্রপার লোকেটর। তুমি জানলে কিভাবে?'

'দুনিয়ার সেরা সাইকিক ইনভেস্টিগেটরদের একজন ও,' বলল সোহানা 'সেজন্যেই জানে।'

'আশরাফ! আমাকে তুমি বলোনি!'

'তুমিও তো আমাকে বলোনি। দু'জনেই জানি কেন। তবে তোমার বন্ধুরা এখানে সবাই সহানুভূতিশীল। কেউ ভাববে না লাফিং অ্যাকাডেমি থেকে তুমি পালিয়ে এসেছ।'

'বেশ, খুশি হলাম।' জেনির চেহারা থেকে অস্বস্তির ছায়া সরে গেল, মৃদু হাসল সে। 'কয়েকটা খুঁটি আর খানিকটা রশি আনো, আশরাফ। খুব বেশিক্ষণ লাগবে না।'

দু'মিনিট পর কটেজের পশ্চিম দিকের ঘাস মোড়া মাঠে এসে দাঁড়াল ওরা সবাই।

'আরও আধ ঘণ্টা আগেই বিদায় নেয়া উচিত ছিল আমার,' বিড়বিড় করে সোহানাকে বললেন মারভিন লংফেলো। 'কিন্তু মি. রানার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার। তাছাড়া, জাদু দেখার লোভটাও সামলাতে পারছি না। আপনার কি ধারণা, সত্যিই কাজ হবে?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'জেনির অন্তত কোন সন্দেহ নেই।'

'বাড়ি আর গ্রামের মাঝখানে একটা রেখা কল্পনা করো, তারপর সেই রেখার ডান দিকে মুখ করিয়ে দাও আমাকে,' আশরাফকে বলল জেনি। 'অপর দিকটা ক্রস-চেক করব পরে।'

পিস্তল ধরার ভঙ্গিতে লোকেটর দুটো দু'হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেনি, তারগুলো সামনের দিকে তাক করা। ঘাস মাড়িয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল সে।

ছ'পা এগিয়েছে, টিউবের ভেতর সাবলীলভাবে তার দুটো ঘুরে গেল, মুখ করল পরস্পরের উল্টোদিকে। ক্ষীণ শব্দটুকু নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে জেনি, কারণ বলল, 'দুটো খুঁটি পুঁতে একটা রেখা তৈরি করো, আশরাফ। দুটো দিকই পরে আবার একবার চেক করব। এটাকে পুরানো পাকা নর্দমার ধ্বংসস্তূপ হিসেবে লিখে রাখো। গভীরতা ছ'ফুট।'

তারগুলো কোন দিকে তাক করা আছে দেখে নিল আশরাফ, তারপর মাটিতে একটা খুঁটি গাড়ল। 'কি করে জানলে পাকা নর্দমার ধ্বংসস্তূপ?' জানতে চাইল সে।

'কারণ এখন আমি ওগুলোই খুঁজছি। পরে গ্যাস, ওয়াটার আর ইলেকট্রিসিটি লাইন খুঁজব।'

'গভীরতা জানলে কিভাবে?'

'জানি। কথা না বলে খুঁটি গাড়ো।'

জেনির আরেক দিকে চলে এল আশরাফ, দ্বিতীয় খুঁটিটা গাড়ল, বলল, 'হয়েছে।'

লোকেটর দুটো কাত করল জেনি, ফলে আলগাভাবে আবার সামনের দিকে চলে এল তার দুটো। আবার এগোল সে।

পরবর্তী পনেরো মিনিট কয়েকবারই ঘুরে গেল তারগুলো। প্রথমে মাঠের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেল জেনি, তারপর দু'পাশ দিয়ে। সুয়্যার পাওয়া গেল, এক কোণ থেকে আরেক কোণ পর্যন্ত লম্বা পানির পাইপ পাওয়া গেল, একপ্রান্তের পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে রয়েছে গ্যাস পাইপ। তবে কোথাও কোন ইলেকট্রিক কেবল

নেই।

লোকেটর দুটো আশরাফের হাতে ধরিয়ে দিয়ে খালি তালু দুটো পরস্পরের সাথে ঘষল জেনি।

'গভীরতা জানলে কিভাবে?' আবার জানতে চাইল আশরাফ।

'আমি অনুভব করতে পারি। যা খুঁজছি তা সারফেসের কাছাকাছি থাকলে আমার হাত শিরশির করে, মাত্রার ওপর নির্ভর করে কতটা গভীরে আছে।'

'আর এটাই তোমার কাজ? পেশা?'

'হ্যাঁ। আসলে আমি টাইপিস্ট নই। এই কাজে বেতন অনেক বেশি। সোহানা, এক গ্লাস পানি খেতে পারি আমি? এই কাজটা শেষ করলে আমার খুব তেষ্টা পায়, অসুস্থ বোধ করি।'

'পানি কেন, পুরো এক কেস বিয়ার খাওয়াব তোমাকে, জেনি,' বলল সোহানা। 'ধন্যবাদ, ভাই। পুকুরটা গাছপালার দিকে সরিয়ে নিতে হবে খানিকটা, তাহলে আর সুয়্যার ও গ্যাস পাইপের কোন ক্ষতি হবে না। তারমানে পানির পাইপগুলোকে নতুন করে বসাতে হবে। এমনিতেও নতুন পাইপ লাগত, পুকুরে ভাল পানি আনার জন্যে।'

মাথাটা একদিকে কাত করল জেনি, বলল, 'একটা গাড়ি আসছে।'

এক মিনিট পর পাহাড়ের কাঁধে রানার টয়োটা দেখা গেল, বাঁক ঘুরে কটেজের পথ ধরল সেটা। 'হ্যাঁ, রানা,' বলল সোহানা। জেনির মুখে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল, মনে হলো কেঁদে ফেলবে, তারপর অদৃশ্য হলো সেগুলো, আনন্দের আভা ফুটে উঠল চেহারায়।

আশরাফকে সোহানা বলল, 'ওকে নিয়ে যাবে তুমি, আশরাফ? রানার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলতে দিয়ো, তারপর কিছু খাইয়ো ওকে। মি. লংফেলো বিদায় নেয়ার আগে রানার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমরা।'

'অনুপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়ে ভারি খুশি লাগছে। তোমাদের বিজনেস কনফারেন্স আমার হার্টবিট বাড়িয়ে দেয়। চলো, জেনি। রানার কান কামড়াবার জন্যে ষাট সেকেন্ড সময় পাবে তুমি।'

মারভিন লংফেলোকে নিয়ে কটেজের সামনে পৌঁছুল সোহানা, দূর থেকেই দেখা গেল ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে রানা। ওর দিকে ছুটে গেল সোহানা, ইচ্ছে করেই খানিকটা পিছিয়ে পড়লেন মারভিন লংফেলো। দেখলেন, রানা ও সোহানা পরস্পরকে আলিঙ্গন করল না, একজন আরেকজনের কাঁধে হাত রেখে হাসল শুধু। তারপর এক পা পিছিয়ে এসে রানার হাতটা ধরল সোহানা, জ্যাকেটের আস্তিন সরিয়ে কব্জিটা পরীক্ষা করল। ক্ষতটা প্রায় শুকিয়ে গেছে। হাতটা ছেড়ে দিল সোহানা, অপর হাতটা তুলে মুক্তোগুলো নাড়াচাড়া করল, বলল, 'কেমন দেখাচ্ছে বললে না তো?'

'ও, ওগুলো।' সোহানার চোখে তাকিয়ে আছে রানা। 'সামনে তুমি থাকলে আর কিছু আমি দেখতে পাই না। হ্যাঁ, ভাল দেখাচ্ছে, তবে শুধু তোমার গলায় রয়েছে বলে।'

তারপর দু'জনেই ওরা মারভিন লংফেলোর দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'হ্যালো, মি. রানা?' এগিয়ে এলেন বিএসএস চীফ।

'হ্যালো, স্যার। জেনির ব্যাপারে আশরাফ কি যেন বলে গেল, ঠিক বুঝলাম না,' ওদের দু'জনের দিকেই পালা করে তাকাল রানা। জেনির অসাধারণ গুণটা অল্প কথায় ব্যাখ্যা করল সোহানা।

চিবুকে আঙুল ঘষছে রানা। 'সন্দেহ নেই, আশরাফের সাবজেক্ট। আমি জানতাম, কি যেন একটা গোপন করে রাখছে মেয়েটা। তোমার ধারণা, এই কারণেই পেনিফিদার ধরতে চাইছে ওকে?'

মারভিন লংফেলো বললেন, 'পেনিফিদার পাইপ খুঁজবে কেন?'

'শুধু যে পাইপ তা তো নয়,' বলল সোহানা। 'আশরাফের ধারণা এই গুণটির দ্বারা আরও অনেক কিছু খুঁজে বের করা সম্ভব।'

'যেমন?'

'এখনও আমি জানি না। এই কারণেই যে পেনিফিদার তাকে ধরতে চাইছে, জেনি এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। মুশকিল হলো, এ-ব্যাপারে কথা বলতে লজ্জা পায় সে। সব কথা খুলে বললে হয়তো দু'একটা ক্লু পাওয়া যাবে। আমাদের আরও জানতে হবে, কোথায় কি করছে পেনিফিদার। তুমি কিছু জানতে পেরেছ, রানা?'

'আন্ডারগ্রাউন্ডের পুরানো কনট্যাক্টদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের অনেককেই বিশ্বাস করা যায় না। না, এখনও কিছু জানতে পারিনি। সিকিউরিটির ব্যাপারে কোথাও কোন ফাঁক রাখেনি পেনিফিদার।'

'আমি আমার কয়েকজন ইনফরমারকে এদিক-ওদিক পাঠিয়েছি, পেনিফিদারের কোন খবর পেলে জানাব,' বললেন মারভিন লংফেলো।

'ধন্যবাদ, মি. লংফেলো।'

'আপনারাও আমাকে জানাবেন সব, যখন যা জানতে পারবেন,' সোহানার দিকে ফিরলেন বিএসএস চীফ। 'ড. জিমসনের ব্যাপারটা ভুলে যান। এ-ব্যাপারে মি. রানাকে আপনি কিছু বলেছেন?'

'সময় পেলাম কোথায়? যাই হোক, আপাতত ভুলেই থাকব। তবে ব্যাপারটা আমার পছন্দ হলো না।'

'মাই ডিয়ার,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মারভিন লংফেলো, 'মাথার ওপর হাজারটা সমস্যা থাকলে এভাবে অ্যাডজাস্ট না করে উপায় কি।'

গজ সরিয়ে চাল দিল জেনি, বলল, 'চেক।'

আশরাফ বলল, 'দুঃখিত, চেক হয়নি। নিজের বড়েটার কথা ভুলে গেছ তুমি।'

'ধ্যাত!' নিজেকে ভেঙচে গজটা আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনল জেনি, তারপর পকেট দাবার ছকের ওপর দ্রুত হাত বুলাল, ওটা তার হাঁটুর ওপর রয়েছে, বড় ছকটার মতই সাজানো। ঘুঁটিগুলো কোথায় আছে ভুলে গেলে এটার সাহায্য নেয় সে।

ইতিমধ্যে রাত হয়ে গেছে। ওপরতলায় রয়েছে রানা, শেষ বারের মত পরীক্ষা

করে দেখতে গেছে আল্ট্রাসোনিক ও ইনফ্রারেড সিকিউরিটি সিস্টেম ঠিকমত কাজ করছে কিনা। সোহানার সঙ্গে ইতিমধ্যে জেনির নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে ওর। দু'জনেরই ধারণা, এখানে জেনির কোন বিপদ হবার ভয় নেই। পুলিস ও ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট বলছে, পেনিফিদার ইংল্যান্ডে আসেনি।

আশরাফ ও জেনির সঙ্গে লিভিংরুমে বসে রয়েছে সোহানা, কামরার আরেক প্রান্তে রেডিওগ্রাম থেকে সুচিত্রা মিত্রের ক্ষীণ কণ্ঠ বেরিয়ে আসছে। তন্ময় হয়ে শুনছে সোহানা; ওর ধারণা, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর-মাধুর্য সুচিত্রা মিত্রের গলায় যেন নতুন একটা মাত্রা এনে দেয়।

নিচে নেমে এল রানা, গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও কিভাবে যেন ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেল সোহানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও, তারপর আরামকেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এক মিনিট পর রানার হাতে এক কাপ ধূমায়িত কফি ধরিয়ে দিল ও।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা, পরমুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল। পাথরের তৈরি ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও, একটা হাতের কনুই রয়েছে ম্যান্টেল শেলফ-এর ওপর, সেই হাতেই মারভিন লংফেলোর রেখে যাওয়া আইডেনটিকিট ছবিটা ধরে রেখেছে।

সোহানা দেখল, হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল রানার চোয়াল দুটো। চোখে অবিশ্বাস, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ছবিটার দিকে। শুধু যে অবিশ্বাস তা নয়, ওর চোখে আরও কি যেন একটা রয়েছে, ঠিক চিনতে পারল না সোহানা। ভাবল, ভয়?

রানার আড়ষ্ট ভাবটুকু লক্ষ করেছে আশরাফও। কেউ কোন কথা বলছে না দেখে সজাগ হয়ে উঠেছে জেনিও।

নিস্তব্ধতা ভাঙল জেনিই, 'কি ব্যাপার?'

একটা হাত বাড়িয়ে জেনির কাঁধে মৃদু চাপ দিল। 'অপেক্ষা করো,' ফিসফিস করল সে।

মুখ তুলে সোহানার দিকে তাকাল রানা, উত্তেজিত গলায় জানতে চাইল, 'কোত্থেকে এল এটা?'

'মি. লংফেলো রেখে গেছেন। ড. জিমসনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমরা, তাঁর বাড়ির সামনে ভদ্রলোককে দেখি...কেন, তুমি চেনো?'

ম্যান্টেল শেলফে ছবিটা সাবধানে রেখে দিল রানা, বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। 'হ্যাঁ। চিনি ওকে। কিন্তু সে আজ দশ বছর আগের কথা। আমি ভেবেছিলাম মারা গেছে।'

রানার হাত ধরে আর্মচেয়ারের দিকে এগোল সোহানা, ওকে বসিয়ে দিয়ে নিজেও একটা হাতলের ওপর বসল। 'না, মারা যায়নি,' বলল ও। 'আমরা তাকে দেখেছি। যেদিন তুমি পানামা থেকে কথা বললে রেডিওতে। কি জানো তুমি ওর সম্পর্কে, রানা?'

পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করল রানা, তাড়াতাড়ি ধরাল। পর পর কয়েকটা টান দিয়ে তাকিয়ে থাকল সিগারেটের লাল প্রান্তটার দিকে। 'তোমার মনে আছে, সোহানা, উরুগুয়ে সরকারের অনুরোধে বস একবার আমাকে

পাঠিয়েছিলেন ওখানে? একটা টেরোরিস্ট গ্রুপ ভাড়াটে যোদ্ধাদের সাহায্যে রাজধানীর আশপাশে লুঠপাট, খুন-খারাবি করছিল—পুলিস বা সেনাবাহিনী আসছে দেখলে পাহাড়ে পালিয়ে যেত। বস্ আমাকে নির্দেশ দেন, গ্রুপটার ভেতর ঢুকতে হবে, ওদের লীডারকে ধরে পুলিসের হাতে তুলে দিতে হবে।'

'হ্যাঁ, অনেক বছর আগের কথা, তবু খানিকটা মনে আছে।'

'একটা প্রাইভেট প্লেন নিয়ে ওদের ঘাঁটিতে যাই আমি,' বলে চলেছে রানা। 'লোক মারফত আগেই ওদেরকে জানিয়েছিলাম আমার কাছে প্রচুর আর্মস আছে, বিক্রি করতে চাই। ওখানেই লোকটার সঙ্গে দেখা হয় আমার, টেরোরিস্ট লীডারের ডান হাত হিসেবে কাজ করছিল। তাকেই সবাই বস্ হিসেবে মানত, এমনকি লীডারও তাকে সম্বোধন করত বস্ বলে। গড, হি ইজ রিয়েল ব্যাড, সোহানা। ব্যাড অ্যান্ড লাকি। উদ্ভট পাগলামি আছে তার মধ্যে, অবিশ্বাস্য ঝুঁকি নিয়ে অসম্ভব সব কাজ করে, কিন্তু কখনও বিপদে পড়ে না। উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা বলে কিছু নেই তার।'

'পেশাদার খুনী?' জানতে চাইল সোহানা।

'পুরোপুরি অ্যাবনরমাল একটা মানুষ। শুধু শরীরটা নয়, ভেতরটাও। এ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, সোহানা। কোন হিসাবের মধ্যে পড়ে না সে। তাকে তুমি কোন ছকের ভেতর ফেলতে পারবে না। আমি শুধু তার বৈশিষ্ট্য বা অভ্যেস সম্পর্কে বলতে পারি তোমাকে। রোজ চার-পাঁচ বোতল হুইস্কি খেতে পারে, ধরো এক মাস ধরে প্রতিদিন, কিন্তু মাতাল হবে না। তারপর হঠাৎ একদিন খাওয়া বন্ধ করল, বেশ কিছুদিন আর ছুঁলই না। যে পরিমাণ হেরোইন একবারে খায়, তার অর্ধেক খেলে আমরা চারজন মারা যাব...।'

'হেরোইন?'

'অথচ নেশা হয় না তার, অসুস্থও হয় না। ড্রাগস নেয়, কিন্তু অ্যাডিক্টেড নয় এর মানে হল, নিজের ওপর টোটাল কন্ট্রোল আছে তার। গণ্ডারের মত কাঠামো, অথচ চিতার মত ক্ষিপ্র তার নড়াচড়া।' রানার চোখ আধবোজা হয়ে আছে, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজেকে বাধ্য করছে অতীতে ফিরে যেতে। 'শক্তিশালী...,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'বলা হয় মানুষের চেয়ে বারো গুণ বেশি শক্তি রাখে একটা গরিলা। আমার ধারণা, যে-কোন মানুষের চেয়ে অন্তত ছ'গুণ বেশি শক্তি রাখে সে। অ্যাবনরমালি স্ট্রং।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল রানা, তারপর সোহানার দিকে তাকাল। 'তাকে আমি খুন করতে দেখেছি, সোহানা। কোন কারণ ছাড়াই, শুধু মজা করার জন্যে। হঠাৎ মেরে ফেলল, ব্যাপারটা সেরকম নয়। যাকে মারবে তাকে নিয়ে খেলবে, বুঝতে দেবে তাকে মারবে সে। শিকারকে ছেড়ে দেবে বারবার, সরে যেতে দেবে দূরে, তারপর ধাওয়া করবে। একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে এভাবে কষ্ট দিয়ে মারতে পারে, সে তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না। লোকটার অনুভূতি বলে কিছু নেই, সারাক্ষণ হাসছে। এক লোকের সঙ্গে তার মতের অমিল হয়, ফলে মারামারি বেঁধে যায়—না, মারামারি নয়, ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ একতরফা। লোকটাকে আক্ষরিক অর্থেই ভেঙে ফেলে সে।'

'মানে?'

'তিনদিন ধরে তাকে খুন করে সে। প্রথমে চোখ দুটো বের করে নেয়। তারপর শুধু ঘুসি মেরে তার একদিকের পাঁজরের সবগুলো হাড় ভেঙে ফেলে। কজি ভাঙে, কনুই ভাঙে, হাঁটু ভাঙে, একটা একটা করে। মাটিতে ফেলে কনুই দিয়ে হাজারটা গুঁতো মেরে লোকটার পেট বইয়ের মলাটের মত পাতলা করে ফেলে। সবচেয়ে অসহ্য ছিল তার অট্টহাসি। আরেক লোকের ঘাড়ের পিছনটা ধরে ঝাঁকাতে শুরু করে সে। আধ ঘণ্টা পর মারা যায় লোকটা, ঘাড় ভেঙে গিয়েছিল।'

ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে আশরাফের দিকে তাকাল সোহানা। সিঁড়ির নিচে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন ড. জিমসন, দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠল আশরাফ, তার গায়ের মাংস কিলবিল করে উঠল।

'লোকটার নাম কি বলো তো?' আবার রানার দিকে তাকাল সোহানা।

তিক্ত, ক্ষীণ হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'পাইথন,' বলল ও। 'মার্কাস পাইথন।'

দশ

বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছে জেনি। আধ ঘণ্টা আগে তাকে 'গুডনাইট' জানাতে এসেছিল রানা, কিন্তু বসেনি।

প্যাসেজের আরেক মাথায় নিজের কামরায় শুয়ে সিগারেট ফুঁকছে আশরাফ, দরজায় শব্দ হতে মুখ তুলে তাকাল। ড্রেসিং গাউন পরে ভেতরে ঢুকল সোহানা, রঙটা যেন ঠিক অগ্নিশিখা। 'এই মুহূর্তে যদি পেনিফিদার এখানে এসে পড়ে, তোমার পিছনে গা ঢাকা দেব আমি- বলা যায় না, তোমাকে আমি জড়িয়েও ধরতে পারি,' বলল আশরাফ, হাসছে। 'তবে, চিন্তা নেই, তোমার ডান হাতটা ধরব না, যাতে তুমি গুলি করতে পারো। হাতটা লম্বা করে গুলি কোরো, তা না হলে আমার কানের ক্ষতি হবে।'

'পেনিফিদার এখুনি আসছে না। তবু বলছি, বাড়িটার সিকিউরিটি সিস্টেমে কোন খুঁত নেই। অ্যালার্ম ফিট করার সময় আলট্রাসোনিক সিস্টেমে ইনফ্রা-রেড মডিফিকেশন যোগ করেছে রানা। কটেজের দুশো গজের মধ্যে কেউ এলে বীম ব্রেক করবে তারা, সেই সঙ্গে অন হয়ে যাবে অ্যালার্ম।'

'সেই সঙ্গে আমিও খাটের তলায় লুকাব,' বলল আশরাফ। 'পেনিফিদার যদি ওই দুশো গজ বুকে হেঁটে আসে?'

'পেনিফিদার আসবে না, এলে তার ভাড়াটে কোন লোক আসতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে এলে ইস্পাতের জালে বাধা পাবে।'

তারের এই জাল বা পর্দা প্রতিটি দরজা ও জানালার পাশে কোন না কোনভাবে লুকানো আছে। ওগুলো দেখে বিস্মিত হয়েছে আশরাফ, স্বস্তিও বোধ করেছে। এখন সে জানে, স্ক্রীন অ্যালার্ম ফোন লাইনের মাধ্যমে গ্রামের পুলিস

স্টেশনের সঙ্গে সংযুক্ত।

'বসো না। এসো, গল্প করি,' বিছানার একপাশে সরে এল আশরাফ, সোহানাকে বসার জায়গা করে দিল।

'না, আমাকে এবার যেতে হয়,' বলল সোহানা। 'আমার ধারণা, রানা আমাকে খুঁজবে।'

'তোমাকে খুঁজবে? কেন?' হাঁ হয়ে গেল আশরাফ।

'যদি বলি কেন, ভয়ে তোমার হাত-পা অবশ হয়ে যেতে পারে।' হাসতে হাসতে আশরাফের কামরা থেকে বেরিয়ে এল সোহানা।

প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে ও, রানার কামরার দরজা বন্ধ দেখল। তবে দরজার নিচে আলো দেখা যাচ্ছে। থামল সোহানা, কান পাতল। কোন শব্দ নেই। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে নক করল ও। ভেতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল না, তবে একটু পরই দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল রানা। ইতিমধ্যে জ্যাকেট ও টাই খুলে ফেলেছে ও, বাকি সব কাপড় পরেই আছে। দরজা বন্ধ করল ও, ওর হাত ধরে বিছানার দিকে এগোল সোহানা।

পাশাপাশি বসল ওরা। রানার হাতটা ছাড়ল না সোহানা। বলল, 'এখন এখানে কেউ নেই। আমি সবটুকু শুনতে চাই, রানা।'

মেঝের দিকে তাকিয়ে মাথার চুলে হাত চালাল রানা। 'বলব বলে আমি নিজেই যেতাম তোমার কাছে।' মুখ তুলে সোহানার দিকে তাকাল ও। 'মার্কাস পাইথনকে আমি ভয় পাই।'

চমকে উঠল সোহানা। এ-কথা কার মুখে শুনছে ও? রানার মুখে? নিজেকে দ্রুত সামলে নিল ও। 'শুরু থেকে বলো, রানা। কোত্থেকে আরম্ভ হলো?'

'ওখানেই, উরুগুয়েতে। পরে আফ্রিকার একটা বন্দরে। দশ বছর আগের কথা, কাউকে গ্রাহ্য করতাম না। ভেবেছিলাম পাইথনকে কাবু করা আমার দ্বারা সম্ভব। আমার রিফ্লেক্স তখন এখনকার চেয়ে ভাল ছিল, জানতাম প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে কিভাবে বেসামাল করে তোলা যায়। কিন্তু পাইথনকে ছোট করে দেখে মারাত্মক ভুল করেছিলাম আমি।'

সোহানা অনুভব করল, রানার পেশী টান টান হয়ে উঠেছে। 'ব্যাপারটা ছিল একটা গরিলার সঙ্গে যুদ্ধ। কিন্তু পাইথন যে শুধু শক্তিশালী তা নয়, তার মুভমেন্ট এত দ্রুত যে চোখে দেখা যায় না। আমি যে তাকে মারিনি বা আঘাত করিনি তাও নয়। অন্য কোন লোক হলে ছাতু হয়ে যেত, মারা যেত অনেক আগে। কিন্তু আমার জানা সব রকম মার খেয়েও বেজন্মাটা হাসতে থাকল। আমি তার একটা চুলও ছিঁড়তে পারিনি। একটা করে ঘুসি খায় আর হো হো করে হাসে। তারপর কিভাবে, কখন যেন একহাতে ধরে ফেলল আমাকে। অপর হাতটা দিয়ে ঘুসি নয়, শুধু একটা থাপ্পড় মারল। ওই একটাই। পড়ে যাবার পর নিজেকে আমার কাদার ডেলা মনে হলো।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল রানা। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আছে সোহানা।

'তার পা অসম্ভব খাটো, তোমার শরীরের মত মোটা এক‌েকটা,'

অন্যমনস্কভাবে বলল রানা। 'লড়াইয়ের জন্যে কোন সুবিধে পাবার কথা নয়। কিন্তু লড়াই শেষ হয়ে গিয়েছিল। লাথি মেরে আমার পাঁজরগুলো ভাঙতে শুরু করল পাইথন। লাথি নয়, স্লেজহ্যামারের প্রচণ্ড আঘাত। একটা করে লাথি মারে, বার কাউন্টারে ফিরে গিয়ে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দেয়, তারপর হাসতে হাসতে আবার এগিয়ে আসে। তোমাকে বলেছি, একটা ডকসাইড বার-এ ছিলাম আমরা?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল সোহানা।

'বারে বারম্যান ছাড়া আর মাত্র তিনজন ক্রু ছিল। বারম্যান আগেই পালিয়েছিল, কারণ পাইথন সম্পর্কে জানত সে - কাউকে ধরলে খুন না করে ছাড়বে না। ক্রুরা লুকিয়েছিল কাউন্টারের নিচে। লুকালেও, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে রসিকতা করছিল পাইথন। কোথায় কাকে কবে মেরেছে, সেই গল্প। একটা করে লাথি মারে, হুইস্কি খায়, গল্পের খেই ধরে, তারপর আবার লাথি মারার জন্যে এগিয়ে আসে। কিছুই করার ছিল না আমার, বুঝতে পারছিলাম মারা যাচ্ছি। বিশুদ্ধ ইংরেজিতে নোংরা কৌতুক শোনাচ্ছিল সে, হাবভাব রীতিমত অভিজাত।'

ওর কাঁধে একটা হাত রাখল সোহানা।

'তার আগে, পরেও, অনেকের হাতে মার খেয়েছি আমি, কিন্তু পাইথনের মার জীবনে কখনও ভুলব না। পাঁজরগুলো ভেঙে ভেতর দিকে ডেবে যাচ্ছে, বুঝতে পারছিলাম। জানতাম, শুধু পাঁজরের হাড় ভেঙে ক্ষান্ত হবে না পাইথন। তারপর আমাকে মাফ চাইতে বলল সে। বলল, মাফ চাইলে, তার থুথু চাটলে, সে আমাকে প্রাণে মারবে না। আমার মাথা ঠিক কাজ করছিল না। বোধহয় বলেছিলাম, আমাকে দশ মিনিট সময় দেয়া হোক, নিজেকে সামলে নিয়ে আবার লড়তে চাই আমি।'

'কি বলল পাইথন?'

'বলল, কোন লাভ নেই। বলল, দশ মিনিট কেন, দশ হাজার বছর সময় পেলেও তার সঙ্গে লড়ার যোগ্যতা আমার হবে না। তারপর ঠিক কি ঘটল বলতে পারব না। সম্ভবত বারম্যান ফোন করেছিল। ছুটে এসে কে যেন খবর দিল, পুলিস আসছে। যাই ঘটুক, পাইথন ও ক্রুরা পালিয়ে গেল। জ্ঞান ফেরার পর দেখলাম সীম্যান'স হসপিটালে শুয়ে আছি। ডাক্তার বলল, নিশ্চয় কেউ আপনার ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়েছে। পাঁজরের হাড় ভেঙেছিল পাঁচটা। পিঠ আর বুকের চামড়া বলে প্রায় কিছু ছিল না। হাসপাতালে আমাকে আট হপ্তা থাকতে হয়। পুরোপুরি সুস্থ হতে সময় লাগে এক বছর।'

থামল রানা, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল। প্যাকেট থেকে বের করে রানাকে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে দিল সোহানা। বলল, 'ব্যাপারটা আমাকে তুমি বলোনি কখনও।'

'বলিনি, কারণ শুনলাম জার্কাতায় নাকি কি এক উদ্ভট পাগলামি করতে গিয়ে মারা গেছে পাইথন।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'খবরটা আমি বিশ্বাস করেছিলাম, কারণ ঝোঁক বা ইচ্ছেটাই ছিল বিশ্বাস করার। পাইথন আমার কি করেছে তা-ও আমি ভুলে গিয়েছিলাম, কারণ ভুলে যাবার একটা ঝোঁক ছিল আমার ভেতর।'

'কিন্তু তারমানে এই নয় যে সে তোমার আত্মবিশ্বাস কেড়ে নিয়েছে,' জোর দিয়ে বলল সোহানা। 'গত দশ বছরে কম লড়তে হয়নি তোমাকে—প্রতিবারই জিতেছ, তা না হলে আজও সারভাইভ করছ কিভাবে। তোমার শক্তি বরং আরও বেড়েছে। আগের চেয়ে কৌশলী হয়েছ তুমি, বেড়েছে অভিজ্ঞতাও। তোমার রিফ্লেক্স কমে গেছে, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'তবু আবার যদি মুখোমুখি হই, পরিস্থিতি সেই একই থাকবে,' বলল রানা, গলার স্বর প্রায় নিরাসক্ত, যেন অন্য কারও বিষয়ে আলোচনা করছে ওরা। 'প্রচুর সময় নিয়ে পাঁজর ভাঙার ব্যাপারটা আমার অনেক গভীরে ছাপ ফেলেছে।' নিজের মাথায় টোকা দিল ও। 'পি.ডি.-র একটা ভূমিকা না থেকে পারে না।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। সাইকোলজিক্যাল ডমিনেশন-এর কথা বলছে রানা, যে-কোন ক্লোজ কমব্যাট-এ এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব না থেকে পারে না। এক ধরনের স্বস্তিবোধ করল সোহানা, কারণ রানা কোন বিভ্রান্তিতে ভুগছে না। বিষয়টা গভীরভাবে বিবেচনা করেছে ও, নিজের দুর্বলতার মাত্রা চিহ্নিত করেছে, তারপর সিদ্ধান্তে এসেছে ওর অবচেতন মনের এত বেশি গভীরে ছাপ ফেলেছে ব্যাপারটা যে যুক্তিসিদ্ধ আশ্বাসেও তা মোছা যাবে না।

সিদ্ধান্তটা অপ্রীতিকর, তবু মেনে নিয়েছে রানা, কোন রাখ-ঢাক না করে ওর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর কাছে প্রকাশও করে দিয়েছে।

'ড. জিমসনের ব্যাপারটা বলো আমাকে, এর মধ্যে যদি পাইথনের কোন ভূমিকা থাকে,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, আছে বলেই আমার বিশ্বাস।' সংক্ষেপে ঘটনাটার বর্ণনা দিল সোহানা।

সব শুনে রানা বলল, 'ঘাড় মটকে মানুষ মারা পাইথনের একটা প্রিয় খেলা।' এক মুহূর্ত পর আবার বলল, 'আমাকে তাহলে ছুটিটা বাড়িয়ে নিতে হয়, সোহানা।'

'কেন?' বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল সোহানা।

'জেনির ভবিষ্যতের কথা ভেবে পেনিফিদারের একটা ব্যবস্থা করা দরকার,' বলল রানা। 'আমি চাই এ-ব্যাপারটা তুমি দেখবে। আর মি. লংফেলোর সঙ্গে কথা বলে আমি মাস-এ যাব, দেখি যদি কোন সূত্র পাই ওখানে—বেঁচে যখন আছে, তার সামনে আমাকে একবার দাঁড়াতেই হবে।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল সোহানা। 'কিন্তু এই না তুমি বললে যে...।'

'হ্যাঁ, তাকে আমি ভয় পাই,' স্বীকার করল রানা। 'সেজন্যেই তো তার সঙ্গে আবার আমার দেখা হওয়া দরকার। এ-ধরনের একটা ভয় নিয়ে বেঁচে থাকব, তা কি করে হয়। এবার এটাকে তাড়াতে হবে।' হঠাৎ হাসল রানা। 'পি.ডি.-র কথা ভেবে চিন্তা কোরো না। প্রথমবার ভুল হয়েছিল, দ্বিতীয়বার সেই একই ভুল করব না। সে মারতে এলে আমি তাকে পাশ কাটিয়ে যাব। লক্ষ্য রাখব আমাকে যাতে নাগালের মধ্যে না পায়। ভেবে দেখো না, একটা কুকুরকে মারার জন্যে তার সাথে লড়ে কেউ? হয় বিষ খাওয়ায়, না হয় গুলি করে। এরকম আরও অনেক উপায় আছে।'

সোহানার মনে স্বস্তি, হাসল ও। 'বেশ, ঠিক আছে। কিন্তু প্ল্যানটা একটু

বদলে নিই এসো। প্রথম সমস্যা পেনিফিদার। আগে আমরা তাকে সামলাই। তারপর পাইথন। আমি চাই তুমি যখন তার সামনে দাঁড়াবে, আমি তোমার পাশে থাকব।'

চুপ করে থাকল রানা, মনে হলো আপত্তি জানাবে। তারপর ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। জিজ্ঞেস করল, 'জেনির সঙ্গে পরে কথা হয়েছে তোমার? পাইপ ছাড়া আর কিছু খুঁজত সে?'

'খুঁজত না মানে! মেক্সিকোয় রুপো আর আলাস্কায় সোনা খোঁজার কাজ করেছে সে, দু'বারই লারসেন মাইনিং কোম্পানির তরফ থেকে। জেনি বলেনি, তবে আমি বুঝতে পেরেছি, এ লাইনে দুর্লভ একটা প্রতিভা সে।'

'রুপো ও সোনা,' চিন্তিত সুরে বলল রানা। 'দুটোর ওপরই পেনিফিদারের লোভ থাকার কথা। তবে মাইনিং সম্পর্কে তার আগ্রহ হবে বলে মনে হয় না। প্রশ্ন হলো, জেনিকে তারা জোর করে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে কেন? মোটা বেতনে চাকরির অফার দিলেই তো পারত।'

'চাকরির এ-ধরনের অফার অনেক পেয়েছে জেনি, সবগুলো ফিরিয়ে দিয়েছে,' বলল সোহানা। 'মেটাল খোঁজার কাজ ওই মাত্র দু'বারই করেছে সে। তুমি জানো, পাইপ খোঁজার পর অসুস্থবোধ করে সে? বলছে, মেটাল হলে প্রায় মারা যাবার অবস্থা হয়। এক ধরনের নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হয়ে পড়ে।'

'বোঝা গেল কেন পেনিফিদার কিডন্যাপ করতে চাইছে ওকে...।' রানার পাশে হঠাৎ বেজে উঠল ফোনটা। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলল ও, সোহানাকে বলল, 'আমরা হয়তো এই ফোন কলের জন্যেই অপেক্ষা করছি।' মুখের সামনে রিসিভার তুলে বলল, 'মাসুদ রানা।'

ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স চীফ গ্যাসপার ডেলাভাইন কথা বললেন, 'মসিয়ে রানা, আপনার বন্ধু আর তার শিষ্য বিউভাইস-এ আছে বলে খবর পেয়েছি। হোটেল দে লা পেতিস, রুসেন্ট নিকোলাসে। ওরলিতে আমার এক লোক দেখতে পেয়ে পিছু নেয়।'

খুব বেশি দিন হয়নি পাঁচজন পেশাদার খুনীর হাত থেকে ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স চীফ গ্যাসপার ডেলাভাইনকে ছিনিয়ে এনেছে রানা। এসপিওনাজ জগতে ওর কনট্যাক্ট-এর কোন অভাব নেই, তবে বিশ্বাসযোগ্য কনট্যাক্ট মাত্র দু'একটা। তালিকায় প্রথমে আসে গ্যাসপার ডেলাভাইন-এর নাম। 'আপনি নিশ্চয়ই ওদের আটক করছেন না?' জানতে চাইল রানা।

'ফ্রান্সে ওদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, মসিয়ে রানা। আপনি বললে অভিযোগ তৈরি করা যায়, তবে সেদিন আপনার সঙ্গে আলাপ করার সময় আমার মনে হয়েছিল, আপনারা চান তাকে যেন না ঘাঁটানো হয়।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত বোঝাপড়া আছে।'

'আমার লোক আপনার বন্ধুদের ওপর নজর রাখছে। আপনি যদি তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, সোজা বার লুইস-এ চলে যাবেন, ওটা বুলেভার্দ দ্য ল'আস-এ। ওখানকার ডোরম্যান আপনার লিঙ্ক। তাকে বলবেন মাদাম ফুরাবিনকে

আপনি একটা মেসেজ দিতে চান, তাহলেই যোগাযোগের ব্যবস্থা করবে সে।'

'ধন্যবাদ, মসিয়ে ডেলাভাইন।'

'কখন আপনি ওখানে পৌঁছুবেন?' ডুক্সেম ব্যুরো-র চীফ জানতে চাইলেন।

'ভোরের মধ্যে। আমরা আনঅফিশিয়ালি যাব।'

'গুড। আপনাকে আর দেরি করিয়ে দেব না। গুডনাইট, মসিয়ে।'

'গুডনাইট।'

'আনঅফিশিয়ালি যাবে কিভাবে?' জানতে চাইল সোহানা।

'আমারও সেই প্রশ্ন,' দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল আশরাফ, হাতে একটা শার্ট।

'ভেবেছ কোন প্রস্তুতি না নিয়েই অপেক্ষা করছি আমি?' হাসল রানা। 'ডেভিড মরিসনকে বলে রেখেছি, সে তার সেসনা নিয়ে তৈরি হয়ে আছে। নব্বুই মিনিটের মধ্যে প্লেনে চড়ব আমরা। ডেভিডকে ফোন করে গান-র‍্যাক থেকে দু'একটা জিনিস নিয়ে আসি।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

সোহানাও বেরুল, নিজের কামরায় ফিরছে। আশরাফ তার পিছু নিল।

'অনুমতি না নিয়ে আকাশপথে ফ্রান্সে ঢোকা বেআইনী,' বলল আশরাফ। 'তোমাদেরকে গুলি করে নামানো হবে।'

'ডেভিড মরিসন বছরে বারো বার চোরাই মাল নিয়ে ফ্রান্সে যাওয়া-আসা করে,' বলল সোহানা। 'চ্যানেল-এর দু'দিকেই উপকূলের বিরাট অংশ রাডারের আওতায় পড়ে না।'

'তবু ঝুঁকি তো বটেই।' সোহানার কামরায় ঢুকে শার্টটা পরতে শুরু করল সে।

ওয়ারড্রোব থেকে শার্ট আর ট্রাউজার বের করল সোহানা। 'আরে, তুমি শার্ট পরছ কেন?'

'কারণ জেনিকে দেখেশুনে রাখার জন্যে আমাকে দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছ তোমরা,' বলল আশরাফ। 'ড্রেসিং গাউনে নিজেকে আমার দুর্বল লাগে। মানে বলতে চাইছি, আরও বেশি দুর্বল লাগে।'

'এখানে খারাপ কিছু ঘটবে না, আশরাফ।'

'না। তবু সাবধানের মার নেই। অ্যালার্ম বেজে উঠলে কি করব আমি? বলে যাও।'

'অ্যালার্ম বাজবে না। যদি বাজেই পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে পুলিস। ইস্পাতের জাল ছিঁড়ে কারও পক্ষে সম্ভব নয় ভেতরে ঢোকে, অন্তত অল্প সময়ে সম্ভব নয়। তা-ও যদি ঢোকে, শটগান দিয়ে ঠেকাবে তুমি।'

'ভাল বলছ!' ঠোঁট বাঁকাল আশরাফ। সোহানা তাকে একটা শটগান দিয়েছে, দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে গুলি ছুঁড়তে হয়। 'তারমানে তোমরা না ফেরা পর্যন্ত ওটাকে বালিশের তলায় নিয়ে শুতে হবে আমাকে। কবে নাগাদ ফিরবে বলে আশা করব?'

'কাল,' বলল সোহানা। 'আর কিছু জানতে চাও? যদি না চাও, দয়া করে বেরোও এবার। দেখছ না, আমি কাপড় পাল্টাব।'

*

কয়েকটা খেত আর মাঠের পর নিচু একটা পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে আঁকাবাঁকা পথ। পথের একদিকে গভীর বনভূমি, গাড়িটা গাছপালার ভেতর লুকিয়ে রাখা হয়েছে। দৈত্যটা ব্যাকসীটে বসায় গাড়ির পিছন দিকটা নিচু হয়ে আছে।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে উঠে এল একটা টয়োটা, ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল, আরোহীরা কেউ এদিকে তাকালই না। এঞ্জিনের আওয়াজ এক সময় মিলিয়ে গেল দূরে।

হাসির দমকে কেঁপে উঠল পাইথনের শরীর, গাড়িটা দুলতে শুরু করল। হুইলে বসা লোকটা ঝিমুচ্ছিল, হঠাৎ সজাগ হলো সে।

'যাও, ফ্রান্সের বাতাস খেয়ে এসো,' বিড়বিড় করল পাইথন। 'এদিকে আমরা কাজে হাত দিই।'

ড্রাইভার বলল, 'অ্যাঁ?'

'একদম চুপ, কার্ল,' বলে পকেট থেকে একটা চুরুট বের করল পাইথন, সেটার দিকে আগ্রহের সাথে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড, তারপর সিদ্ধান্ত নিল ধূমপান করবে না। সিদ্ধান্তটা নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধূমপান করার নেশাটা নিস্তেজ হয়ে গেল, অনুভব করে মজা পেল সে। চুরুটটা ভেঙে দু'টুকরো করল, ফেলে দিল জানালা দিয়ে।

সীটে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল সে, বলল, 'আমি এখন চিন্তা করব। আওয়াজ হবে। তুমি কোন কথা বলবে না। আমাদের হিরো আর হিরোইন কটেজ ছেড়ে চলে গেল, তাই না? অন্ধ মেয়েটা রয়েছে, আর রয়েছে অচেনা এক চরিত্র। এখন কি ওদেরকে ধরা যায়? বোধহয় যায়। তবে পাইথন ভাবছেন, না যায় না। কারণ হিরো মাসুদ রানা ও হিরোইন সোহানা চৌধুরীর মাথায় ঘিলু আছে। দু'জনেই ভারি সতর্ক। কাজেই, নিজেকে আমার মনে করিয়ে দেয়ার দরকার আছে যে এর পর মাসুদ রানার পাঁজর ভাঙার সময় কাজটায় কোন খুঁত রাখা চলবে না। এই বাস্টার্ড, কার্ল, আমার চিন্তা করার সময় খবরদার তুমি ঘুমাবে না। যদি দেখি ঘুমাচ্ছ, কান দুটো কামড়ে ছিঁড়ে নেব।'

ঝট করে শিরদাঁড়া খাড়া করল লোকটা। কথা বলল না।

'কথাটা সত্যি কিনা বলো,' আবার সকৌতুকে শুরু করল পাইথন, 'কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানব প্রজাতির মধ্যে রাতের বেলা যে ভয়টা থাকে, সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তা দূর হয়ে যায়? জবাব দিয়ো না, কার্ল। বাধা জিনিসটা আমার একদম পছন্দ নয়। হ্যাঁ, আনন্দময় প্রভাতই হলো আমাদের সময়। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে আমাদের ফোন করতে হবে। পাবলিক ফোন বুদ থেকে? না। ফুটোয় খুচরো পয়সা ঢোকানো বিরাট একটা ঝামেলার কাজ।'

সামনের দিকে ঝুঁকল সে, একটা প্রকাণ্ড হাত দিয়ে ড্রাইভিং সীটের পিছনটা ধরল। শিউরে উঠল কার্ল।

'একটা প্রাইভেট ফোন দরকার, নাকি বলা উচিত সেমি-প্রাইভেট?' পাইথনের গলায় চাপা উল্লাস। 'পুলিস স্টেশন এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ব্যাপারটা যেহেতু জরুরী, একটা ফোন করার অনুমতি ওদের কাছ থেকে আমি আদায় করতে

পারব বলে মনে করি। আবার হেলান দিল সে। 'হ্যাঁ, চলো, পুলিস স্টেশনেই যাওয়া যাক।'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল কার্ল, বিড়বিড় করে বলল, 'গড!' তারপর স্টার্ট দিল গাড়িতে।

মুখের ভেতর তিক্ত একটা স্বাদ, ঘুম ভেঙে গেল আশরাফের। চোখ মেলে হাতঘড়ি দেখল সে। সাড়ে সাতটা বাজে, সূর্য উঠে এসেছে। মাত্র দেড় ঘণ্টা ঘুমিয়েছে সে।

চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে চুলে আঙুল চালাল আশরাফ, তারপর প্যাসেজ ধরে জেনির কামরার দিকে এগোল। দরজাটা হা হা করছে, কিন্তু ভেতরে জেনিকে দেখল না সে। কান পাতল, শুনতে পেল নিচের কিচেন থেকে থালা-বাসনের আওয়াজ ভেসে আসছে।

ইনফ্রা-রেড সার্কিটের সুইচ অফ করল আশরাফ, তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সোহানার সঙ্গে পরামর্শ করে চাকরবাকরদের কাল রাতেই বলে দেয়া হয়েছে, তারা যেন কেউ সকাল ন'টার আগে কটেজে না আসে। ন'টার আগে গ্রাম থেকে আসতে পারে এক শুধু গোয়ালা আর ধোপা।

আকাশটা স্বচ্ছ নীল, যতদূর দৃষ্টি যায় সবুজ হয়ে আছে জমিন, মনটা অকারণ পুলকে ভরে উঠল আশরাফের। রাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে, এমনকি দিনের বেলাও ইস্পাতের জাল ও ওগুলোর অ্যালার্ম সার্কিট অন করে রাখবে, কটেজের ভেতর নিরাপদে থাকবে তারা। ব্যাপারটা যদি গোয়ালা বা ধোপার পছন্দ না হয়, ফিরে যাবে তারা। তবে এই মুহূর্তে সিদ্ধান্তটা কেমন যেন অবাস্তব লাগল তার। চাকরবাকররা ন'টার সময় আসবে। কি করবে ঠিক করতে পারছে না, দ্বিতীয় সুইচটার ওপর আঙুল রেখে ইতস্তত করছে। তারপর হাতটা সরিয়ে নিল। আগে কেউ আসুক, তারপর দেখা যাবে।

জানালার কাছ থেকে সরে আসতে যাবে, আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথের ওপর পোস্টাপিসের লাল ভ্যানটাকে দেখতে পেল আশরাফ। স্বস্তিবোধ করে হাসল সে, সময়মত ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ইনফ্রা-রেড বীম অফ করে দিতে পেরেছে।

নিচে নেমে এসে কিচেনে ঢুকল আশরাফ। দেখল ওদের জন্যে একাই নাস্তা বানাতে শুরু করেছে জেনি। ইতিমধ্যে শাওয়ার সেরে কাপড় পাল্টেছে সে, চেহারায় ফুটে আছে তাজা ঝরঝরে একটা ভাব। শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল সে, হাসির মধ্যে কোন আড়ষ্টতা নেই। উদ্বিগ্ন যদি হয়ও, চেহারায় তা ফুটে উঠতে দেয়নি। 'হাই, আশরাফ।'

'হ্যালো, জেনি।' তার কাঁধে একটা হাত রাখল আশরাফ, 'তোমাকে দুশ্চিন্তায় কাতর দেখাচ্ছে না কেন? তা দেখালে আমার খানিক ভাল লাগত।'

'তোমাকে বুঝি সেরকম দেখাচ্ছে?'

'হ্যাঁ তোমার নাস্তা তৈরি হওয়ার আগে দাড়ি কামাবার সময় পাব?'

'যদি তাড়াতাড়ি করো।'

'চার মিনিট। ভাল কথা, গাড়ির শব্দ শুনলে ভয় পেয়ো না।'

'আগেই শুনেছি। পোস্ট ভ্যান। এঞ্জিনের আওয়াজটা আমার চেনা হয়ে

গেছে।'

শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আশরাফ। 'অথচ তোমার কাছে পৌঁছুবার জন্যে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে আরেকটু হলে মারা যাচ্ছিলাম আমি।' এঞ্জিনের আওয়াজটা এবার সে-ও শুনতে পেল। শব্দটা কিছুক্ষণ বাড়ল, তারপর হঠাৎ কমে গেল, দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঘুরে দাঁড়াল সে। 'শুধু বোধহয় চিঠি। আবার যদি স্ট্যাম্প ছাড়া মুক্তোর কোন পার্সেল এসে থাকে, পিয়ন ব্যাটা টাকা চাইবে, আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে দরজাটা খুলব কিনা।'

কিচেন থেকে বেরিয়ে এল আশরাফ, প্যাসেজ হয়ে চলে এল হলরুমে। লেটার বক্সের ফ্ল্যাপ খোলা রয়েছে, কার্পেটের ওপর দুটো এনভেলাপ। গুগুলো তোলার জন্যে ঝুঁকল সে, কাচ ভাঙার বিকট শব্দে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল প্রতিটি নার্ভ।

ঝট করে সিধে হলো আশরাফ, জট পাকানো চিন্তা থেকে একটাকে বেছে নিয়ে মুহূর্তের জন্যে ভাবল, পোস্ট ভ্যানটা কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। কিন্তু সংঘর্ষের আওয়াজ এসেছে কটেজের পিছন থেকে। পরমুহূর্তে জেনির চিৎকার শুনতে পেল সে। প্যাসেজ ধরে তীরবেগে ছোটার সময় আরও একটা আওয়াজ হলো—কঠিন ধাতব জাল ছেঁড়ার রোমহর্ষক শব্দ।

কিচেনের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে জেনির সঙ্গে ধাক্কা খেল আশরাফ, খপ করে ধরে ফেলে স্থির করল তাকে। তারপর, জেনিকে ছাড়িয়ে সামনে চলে গেল দৃষ্টি, দেখল ইস্পাতের গোটা জালটা ভাঁজ হয়ে দুমড়ে মুচড়ে গেল, বাইরে থেকে ছিঁড়ে সরিয়ে ফেলা হলো একপাশে। জানালায় থাকল শুধু ভঙ্গুর কয়েকটা কাঁচ।

জালটা অদৃশ্য হতেই উঁচু কার্নিসে লোকটার মাথা ও কাঁধ দেখতে পেল আশরাফ, তলপেট কুঁকড়ে হিমশীতল আতঙ্কের একটা খুদে বলে পরিণত হলো। প্রকাণ্ড দানবটা হাসল, কার্নিসের ভেতর দিকে হাত রেখে অনায়াস ভঙ্গিতে উঠে পড়ল জানালায়। তার একটা হাতে রক্ত লেপ্টে রয়েছে।

জেনির কানের কাছে ফিসফিস করল আশরাফ, নিজের গলা অচেনা লাগল তার। 'কটেজের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাও। দরজার সঙ্গে স্ক্রীন খুলে যাবে। জঙ্গলে চলে যাও। একটু পরই পুলিস এসে পড়বে।'

কথা বলার চেষ্টা করছে জেনি, তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। মৃদু ধাক্কা দিয়ে প্যাসেজে বের করে দিল তাকে আশরাফ, তার পিছনে বন্ধ করে দিল দরজাটা

ভাঙা জানালা থেকে কামরার দিকে ঝুঁকে আছে পাইথন। চারদিকে তাকাল আশরাফ, একটা ছুরি বা ভারী ডাণ্ডা খুঁজছে। শটগানটা এখনও বিছানায়, বালিশের তলায়। ওটা হাতের কাছে রাখেনি বলে নিজের প্রতি রাগ হলো তার।

থালা-বাসন ছাড়া আর কিছু দেখল না আশরাফ, ইতিমধ্যে প্রায় কোন শব্দ না করে মেঝেতে নেমেছে পাইথন, স্টোভে বসানো গরম প্যান আর আশরাফের মাঝখানে একটা বাধা সে। ছোঁ দিয়ে শেলফ থেকে একটা সসপ্যান তুলে নিল আশরাফ। মারা যাচ্ছে, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই তার মনে তবে মৃত্যুটাকে হঠাৎ করে এই মুহূর্তে গুরুত্বহীন বলে মনে হল, শুধু যদি এই দৈত্যের হাত থেকে

জেনিকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিতে পারে সে। ঘৃণায় সারা শরীর রী রী করে উঠল তার, নিজের অজান্তে বিকৃত হলো মুখের চেহারা, অনুভব করল ভাঁজ খেয়ে মুখের ভেতর ঢুকে গেছে ঠোঁট।

পাইথন কোন বিরতি নিল না। আশরাফের দিকে দ্রুত এগোল সে, সাবলীল ভঙ্গিতে, অমোঘ নিয়তির মত। হাতের সসপ্যান দিয়ে পাইথনের প্রকাণ্ড মুখে আঘাত করার চেষ্টা করল আশরাফ, অনুভব করল গাছের মোটা একটা ডালের মত বাহুতে বাধা পেল সে, সরিয়ে দিল সসপ্যান ধরা হাতটাকে।

পাইথনের হাঁটুর নিচে হাড় লক্ষ্য করে লাথি চালাল আশরাফ, সংঘর্ষটা অনুভব করল, শুনতে পেল দানবটা হাসছে। তার চোখের সামনে বিস্ফোরিত হলো উজ্জ্বল আলো, দেখতে পেল কিচেনের ভেতর শূন্যে উড়ছে সে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল শরীরটা, তারপরই অসহ্য ব্যথা অনুভব করল। আতঙ্ক ও যন্ত্রণা যেন লাল কুয়াশার মত গ্রাস করল তাকে, যেন হাজার মাইল দূর থেকে ভেসে এল একটা শব্দ—কিচেনের দরজা খুলল। আরও একটা শব্দ হলো। প্যাসেজের শেষ মাথা থেকে। জেনির আর্তচিৎকার।

লাল কুয়াশা কালো ও ভারী হয়ে উঠল, চাপা দিচ্ছে তাকে। কালো ও গাঢ় কুয়াশায় হারিয়ে যাবার আগে তিক্ত একটা চিন্তা এল আশরাফের মনে, মৃত্যুই এখন তাকে নিরাপত্তা দিতে পারে।

বার লুইস-এর ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে এল রানা। সকাল সাড়ে আটটা বাজে। চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই যে মাসুদ রানা ও। বার-এর এক কোণে, দু'কাপ কালো কফি নিয়ে একটা টেবিলে বসে রয়েছে সোহানা। ওকে দেখেও বোঝার উপায় নেই আসল চেহারাটা কি রকম।

টেবিলে ফিরে এসে বসল রানা, কফির কাপে চামচ নাড়ছে। ওর আচরণে কোন ব্যস্ততা নেই, চেহারা নির্লিপ্ত, কিন্তু সোহানা জানে খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। শান্ত, নিচু গলায় বলল রানা, 'ফোন করেছিলেন গ্যাসপার ডেলাভাইন। জেনিকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।'

কাপটা তুলে ছোট্ট একটা চুমুক দিল সোহানা। তারপর বলল, 'তারমানে ভুল তথ্য জোগান দিয়ে আমাদেরকে ওখান থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে, কাজটা যাতে নির্বিঘ্নে করতে পারে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'পেনিফিদার আর ক্রুনেল রাত দুটোয় ওরলি ছেড়ে চলে গেছে, বার্সেলোনার প্লেন ধরে।'

'জেনিকে তাহলে কারা ধরে নিয়ে গেল?'

'বিস্তারিত কিছু জানতে পারেননি মসিয়ে ডেলাভাইন। মি. লংফেলো তাঁকে আধ ঘণ্টা আগে টেলিফোনে খবরটা দিয়েছেন।'

'আশরাফ?'

'নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। কটেজ থেকে মি. লংফেলোকে ফোন করে সে।'

এক মুহূর্ত পর সোহানা বলল, 'মেয়েটা না পাগল হয়ে যায়।'

'তা হবে না। জেনি খুব সাহসী। তাছাড়া, একটা ব্যাপারে নিশ্চিত সে,

যেভাবেই হোক আমরা তাকে উদ্ধার করব।

'কিন্তু উদ্ধার করব কিভাবে,' সোহানার গলায় হতাশা। 'আমরা কি জানি কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?'

'আমার ধারণা, আশরাফ হয়তো কিছু বলতে পারবে।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা। 'যদি না পারে, পেনিফিদারকে ধরব আমরা। ওর গলায় পা দিলে সব জানা যাবে।'

আমি সোহানা-২

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৯৩

পূর্বাভাস

ছুটিতে পানামায় রয়েছে মাসুদ রানা, সাগরে ডুব দিয়ে ঝিনুক তুলছে। ঘটনাচক্রে দূর থেকে নির্মম একটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে দেখল ও। টমাস পেনিফিদারের লোকজন খুন করল জুলি উডহাউসকে, ধরে নিয়ে যাচ্ছে তার অন্ধ বোন জেনিকে। পেনিফিদার আর তার দল রানার পুরানো শত্রু। দু'জনকে মেরে তাদের হাত থেকে জেনিকে উদ্ধার করল ও। একটা কটেজে গা-ঢাকা দিয়ে আছে ওরা; ওদের খোঁজে গোটা পানামা চষে ফেলেছে শত্রুরা।

অঙ্ক শাস্ত্রে পণ্ডিত আশরাফ চৌধুরী, অতীন্দ্রিয় রহস্যের একজন গবেষকও বটে; কিন্তু ভীতুর ডিম, খুন-খারাবিকে যেমন ভয় করে তেমনি ঘৃণাও করে—সে তার ফুফাত বোন সোহানা চৌধুরীর কাছে লন্ডনে বেড়াতে এসেছে।

হোয়াইটহলে অফিস, যাবার পথে সোহানার সঙ্গে দেখা করতে এলেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মারভিন লংফেলো, ও তখন প্রফেসর নিগুয়েডার কাছে ফেনসিং শিখছে। ফেনসিং-এ আগেই অবশ্য রানার কাছে হাতেখড়ি নিয়েছে সোহানা। ওদের দু'জনকে ডিনার খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন মারভিন লংফেলো, বললেন ডিনার শেষে ওদেরকে নিয়ে তিনি তাঁর এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। সোহানার প্রশ্নের উত্তরে কারণটাও ব্যাখ্যা করলেন। কিছুদিন আগে রোমান আমলের যে প্যাপিরাস পাওয়া গেছে, সেটার পাঠোদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর বন্ধু ড. জিমসন। সেই লিপির সূত্র ধরে আলজিরিয়ার মাস-এ প্রাচীন এক নগর-সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে, এই মুহূর্তে সেখানে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চালাচ্ছেন প্রফেসর ডেভিড হোয়াইটস্টোন ও তাঁর আর্কিওলজিকাল টীম। মাস-এ সাপ্লাই নিয়ে যায় একটা প্লেন, সেই প্লেনে চিঠি-পত্রও পাঠান প্রফেসর হোয়াইটস্টোন। তাঁর চিঠি পড়ে ড. জিমসনের মনে সন্দেহ হয়েছে, মাসে রহস্যময় কিছু একটা ঘটছে। তাঁর হার্টের অবস্থা ভাল নয়, কাজেই তিনি ওখানে যেতে পারছেন না, অনুরোধ করেছেন আসলে কি ঘটছে জানার জন্যে মারভিন লংফেলো যেন কাউকে একবার ওখানে পাঠান। এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডের বাইরে একটা কনভেনশনে রয়েছেন তিনি, লন্ডনে ফিরে বিস্তারিত সব জানাবেন।

নির্দিষ্ট দিনে ডিনার শেষে ড. জিমসনের বাড়িতে যাচ্ছে ওরা। গাড়িতে বসেই রেডিওর সাহায্যে রানার সঙ্গে যোগাযোগ করল সোহানা। সাঙ্কেতিক আরবী ভাষায় একটা মেসেজ দিল রানা। অন্ধ জেনিকে পানামা থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে, সোহানার সাহায্য দরকার ওর।

ড. জিমসনের বাড়ির সামনে অতিকায় এক কুৎসিত প্রাণীকে দেখল ওরা, আকৃতিতে মানুষ হলেও দৈত্য বলে ভ্রম হয়। ড. জিমসনের কলিংবেল বাজাচ্ছিল সে। জানাল, ইতিমধ্যে চারবার বেল বাজিয়েও ড. জিমসনের সাড়া পায়নি। সময়ের অভাব, কাজেই চলে যাচ্ছে সে। মারভিন লংফেলোর প্রশ্নের উত্তরে সহাস্যে নিজের পরিচয়টা জানিয়ে গেল, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ডান কেগান।

বাড়ির ভেতর ঢুকে ড. জিমসনকে সিঁড়ির গোড়ায় পড়ে থাকতে দেখল ওরা। ঘাড় ভাঙা, মারা গেছেন। মারভিন লংফেলোকে পরামর্শ দিল সোহানা, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে একবার খবর নিয়ে দেখা দরকার ডান কেগান নামে ওখানে কেউ আছে কিনা। ইতিমধ্যে প্রশ্ন করে সোহানা জেনে নিয়েছে, মাস প্রজেক্টের সমস্ত খরচ বহন করছেন একজন স্যার, স্যার ভিক্টর ক্যানিং। ভদ্রলোক জনহিতকর বহু কাজের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু আত্মপ্রচার একেবারেই পছন্দ করেন না।

ওদিকে হঠাৎ রানা টের পেল, কটেজটা ঘিরে ফেলেছে শক্ররা। শক্রদের বোকা বানাবার জন্যে একটা কৌশল অবলম্বন করল ও। জেনিকে কটেজে একা রেখে গাড়ি নিয়ে পালাচ্ছে, ওকে ধাওয়া করল শক্ররা। খানিক পর কটেজে পৌঁছুল সোহানা, জেনিকে উদ্ধার করে পৌঁছে দিল হোটেল সান্তা মারিয়ায়, আশরাফ চৌধুরীর কাছে। শক্রদের বোকা বানাবার জন্যে সে-ও পানামা পুলিসের ক্যাপ্টেন হার্মিটেজের সাহায্য নিয়েছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রানার আর পালানো হলো না, শক্রদের হাতে ধরা পড়ে গেল। প্রায় খালি একটা হোটেলে নিয়ে এসে বন্দী করা হলো ওকে। জেরার উত্তরে প্রায় সব কথাই সত্যি বলল রানা, পেনিফিদার উপলব্ধি করল জেনিকে তারা অনায়াসে ধরতে পারবে, কাজেই রানা ও সোহানাকে তাদের আর বাঁচিয়ে রাখার দরকার নেই। রানার এক হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল তারা, অপর হাতে ধরিয়ে দিল একটা গ্রেনেড, পিনটা জড়ানো থাকল সরু একটা তারের সঙ্গে, তারের অপর প্রান্তটা থাকল দরজার কী-হোলে আটকানো। লম্বা করা হাতটা, যেটায় বোমা রয়েছে, কয়েক ইঞ্চির বেশি নাড়াতে পারবে না রানা, কারণ তাহলে গ্রেনেডের পিনটা বেরিয়ে আসবে। আবার বোমাটা এভাবে বেশিক্ষণ ধরে রাখাও সম্ভব নয়। ওদিকে সোহানাকে ফোন করে হোটেলে ডাকা হয়েছে, বলা হয়েছে এখানে এলে রানার সঙ্গে তার দেখা হবে। সোহানা আসবে, আর সে এলেই নিকেল তাকে সাবমেশিনগান দিয়ে ঝাঁঝরা করে দেবে।

অসমসাহস ও তুলনাহীন দক্ষতার সাহায্যে নিকেলের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করল সোহানা। তারপরও ওর বা রানার বাঁচার কথা নয়, কারণ ওদের দু'জনের জন্যে আরও একটা মৃত্যু-ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে। অভিজ্ঞতা ও প্রতিশোধ নেয়ার প্রবল ইচ্ছা ওদেরকে সাহস ও বুদ্ধি যোগাল, দ্বিতীয় ফাঁদটাও এড়িয়ে গেল ওরা।

ইংল্যান্ডের এক গ্রামে, সোহানার বিশাল ভিলায় নিরাপদে রয়েছে জেনি। আশরাফের সঙ্গে তার একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠছে। ভিলার সামনে সোহানা একটা পুকুর কাটবে, এ-প্রসঙ্গে আলোচনার সময় জেনির অদ্ভুত একটা গুণের কথা

জানতে পারল ওরা। এক টুকরো লোহার তার হাতে থাকলে মাটির তলায় পানির পাইপ, গ্যাস লাইন, ইলেকট্রিক লাইন অথবা সোনা-রূপা ইত্যাদি কোথায় কি আছে বলে দিতে পারে সে। ওরা ধারণা করল, জেনির এই গুণটির জন্যেই সম্ভবত পেনিফিদার তাকে ধরতে চাইছে। ঘটনাচক্রে মারভিন লংফেলোর বর্ণনা থেকে তৈরি করা ডান কেগান-এর একটা আইডেনটিকিট ছবি দেখল রানা, দেখেই চমকে উঠল। ইতিমধ্যে মারভিন লংফেলো খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, ডান কেগান বলে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কেউ নেই। ছবিটা দেখে রানা হঠাৎ যেন হতভম্ব হয়ে গেল। রীতিমত আতঙ্কিত দেখাল ওকে। সোহানার প্রশ্নের উত্তরে জানাল, দশ বছর আগে এই লোকটাকে চিনত সে। জীবনে যদি কাউকে কোনদিন ভয় করে থাকে ও, তো সে এই লোকটাকে। তার সঙ্গে লড়েওছিল রানা, তবে দাঁড়াতে পারেনি। সেদিন মারাই যেত ও, বেঁচে গেছে ভাগ্যগুণে। লোকটা যে শুধু প্রকাণ্ড তা নয়, তার মত নিষ্ঠুর মানুষ জীবনে কখনও দেখেনি রানা। দুনিয়ার কাউকে ভয় করে না সে। তার বৈশিষ্ট্য হলো, হাসতে হাসতে মানুষকে মেরে ফেলে। নাম, পাইথন মার্কাস। রানা কাউকে ভয় পায়, কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল সোহানা।

এরপর ফ্রান্স থেকে খবর এল, পেনিফিদারকে ওখানে দেখা গেছে। সোহানাকে নিয়ে ফ্রান্সে চলে এল রানা। ওদের অনুপস্থিতির সুযোগে আশরাফকে আহত করে জেনিকে কিডন্যাপ করল পাইথন। ফ্রান্সে পৌঁছে রানা জানতে পারল, জেনিকে একা পাওয়ার জন্যেই মিথ্যে তথ্য যোগান দিয়ে ওদেরকে ইংল্যান্ড থেকে বের করে এনেছে পেনিফিদার।

রানা ও সোহানা এখনও জানে না, জেনিকে পাইথন কিডন্যাপ করেছে। পেনিফিদার ও পাইথন যে একই দলের লোক, এই প্রথম ওরা জানতে পারবে। ওদের প্রথম কাজ জেনিকে উদ্ধার করা, তারপর অপরাধী চক্রটিকে শায়েস্তা করা। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কিভাবে কতটুকু কি করতে পারে।

এক

লন্ডন। সোহান্যার পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্ট। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলো, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন হাইড পার্কের দিকে।

'মাত্র দু'মাইল দূরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে পোস্টাপিসের ভ্যানটা, বললেন তিনি। 'স্থানীয় পুলিস জেনির ব্যাপারটা জানে না। সাংবাদিকরা ঝামেলা করবে ভেবে ওদেরকে আমি তার কথা কিছু বলিনি। ড্রাইভারকে আহত করে ভ্যানটা যে বা যারা চুরি করেছিল, ওরা শুধু তাকে বা তাদেরকে খুঁজছে। তবে লন্ডন পুলিসের পিক জনসন তার লোকজনকে পাইথন আর জেনিকে খোঁজার কাজে লাগিয়ে দিয়েছে।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'আমার ধারণা, ইতিমধ্যে ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে গেছে তারা। আনঅফিশিয়ালি, বাই এয়ার। কাজটা যদি আপনারা পারেন, তারাও পারবে।'

ভাঁজ করা হাত দিয়ে কনুই দুটো ধরে কামরার ভেতর নিঃশব্দে পায়চারি করছে রানা। বড় একটা আর্মচেয়ারে বসে রয়েছে সোহানা, রাগে লালচে হয়ে আছে মুখ। মাত্র দশ মিনিট আগে ফিরে এসেছে ওরা, ভ্রমণের ধকলটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

লম্বা একটা কাউচে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে রয়েছে আশরাফ। তার মুখের একপাশে, চুলের ঠিক নিচে, একটুকরো প্লাস্টার। মেঝের দিকে চোখ, তবে কিছু দেখছে বলে মনে হয় না। হাতে সিগারেটের খালি প্যাকেট, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছে। স্বভাবসুলভ হাসিখুশি ভাবটা কে যেন কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। চেহারা হয়েছে ভূতের মত।

'কাগজে যাতে লেখালেখি শুরু না হয়, তার ব্যবস্থা কি করা সম্ভব, মি. লংফেলো?' জানতে চাইল রানা।

'সম্ভব। পিক জনসনকে আমি নিষেধ করে দিয়েছি।' জানালার দিকে পিছন ফিরলেন বিএসএস চীফ। 'মি. আশরাফের ফোন পেয়েই তার সঙ্গে যোগাযোগ করি আমি। ভাবলাম, আপনাদের সঙ্গে আলাপ না হওয়া পর্যন্ত সব চেপে যাওয়াই ভাল।'

'ধন্যবাদ, মি. লংফেলো।'

আশরাফের দিকে তাকাল সোহানা। 'নিজেকে শান্ত করো, আশরাফ। তুমি অন্তত বেঁচে তো আছ। বুঝতে পারছি না, পাইথন তোমাকে খুন করল না কেন!'

'করলেই ভাল হত,' বিড়বিড় করে বলল আশরাফ। 'সে বোধহয় ধরে নিয়েছিল আমি মারা গেছি। জ্ঞান ফেরার পর দেখি, গ্যাস স্টোভের গায়ে একটা স্তূপের মত পড়ে আছি, সারা মুখে রক্ত, ঘাড়টা অদ্ভুতভাবে বাঁকা হয়ে দেয়ালে

ঠেকে আছে। প্রথমে মনে হলো, ওটা বোধহয় ভেঙে গেছে। হয়তো পাইথনও তা-ই ভেবেছিল।'

'হ্যাঁ, হতে পারে। তারপর কি হলো?'

'একবার তো বলেছি সব।' সোহানার দিকে তাকাল না আশরাফ।

'তবু আরেকবার বলো।'

চোখ বুজল আশরাফ। 'জ্ঞান ফিরল। দেয়াল ধরে দাঁড়ালাম। মাথাটা ফাঁকা লাগছিল, কিছু ভাবতে পারছিলাম না। তোমার দেয়া নাম্বারে ডায়াল করে মি. লংফেলোকে বললাম সব। তিনি বললেন, পুলিস এলে আমি যেন জেনির কথা কিছু না বলি তাদের, ওদিকটা তিনি সামলাবেন, তোমাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করবেন। আরও বললেন, আমার জন্যে একটা গাড়ি পাঠাবেন, লোকাল পুলিস আমাকে যাতে বেশিক্ষণ আটকে না রাখে সে-ব্যবস্থাও করবেন। এর দু'মিনিট পর বেনিলডন থেকে দু'জন পুলিস এল, পুলিস স্টেশনের অ্যালার্ম শুনে। আমার কথারও ওরা বোধহয় কোন অর্থ করতে পারেনি, হয়তো ধরে নিয়েছিল আমি পাগল-টাগল হয়ে গেছি। নিজেকে আমার মনেও হচ্ছিল তাই। তারপর কি ঘটেছে আমার ঠিক মনে নেই। দেখলাম পুলিস স্টেশনে বসে আছি, একজন ডাক্তার পরীক্ষা করছে আমাকে। একটু পর মি. লংফেলোর এক লোক গাড়ি নিয়ে পৌঁছুল আমাকে এখানে আনার জন্যে।'

সিগারেটের প্যাকেট ছিঁড়ছিল আশরাফ, হাত দুটো কাঁপছে দেখে বগলের নিচে ভাঁজ করল ওগুলো। 'আমি দুঃখিত,' রানার দিকে ফিরে বলল সে। 'জীবনে এই প্রথম আমি বুঝতে পেরেছি, সাহস ও যোগ্যতা না থাকলে একজন পুরুষ মানুষের বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। আমার হাত থেকে জেনিকে কেড়ে নিয়ে গেছে ওরা, সেজন্যে নিজেকে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না।'

আশরাফের সামনে এসে পায়চারি থামাল রানা, তার কাঁধে একটা হাত রাখল। 'শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছ তুমি, আশরাফ। তুমি যা করেছ, তোমার জায়গায় আমি হলেও ঠিক তাই করতাম। জেনিকে তুমি পালাবার সুযোগ করে দিয়েছ, নিজে পালাওনি। জেনি কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার পর দরজা বন্ধ করেছ, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হয়েছ পাইথনের। এ যে কি ভীষণ সাহসের কাজ, ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। নিজেকে নিয়ে তোমার গর্ব হওয়া উচিত, আশরাফ।'

মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল ও। 'ইস্পাতের স্ক্রীনটা যখন লাগাই আমি, পাইথনের মত কারও কথা ভাবিনি।'

'কেউ ভাবত না,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'ওরকম শক্ত একটা তারের জাল খালি হাতে কেউ ছিঁড়ে ফেলতে পারে, কল্পনার বাইরে। আই সাজেস্ট এভরিবডি স্টপস ফিলিং গিল্টি। আমাদের পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব ছিল না যে একটাই দল দু'ভাগে ভাগ হয়ে কাজ করছে–পানামায় আপনার সঙ্গে বেধেছে পেনিফিদার আর ক্রুনেলের, এখানে আমাদের সঙ্গে বেধেছে পাইথনের।'

'পাইপ,' বলল রানা, হাতের তালু দিয়ে চাপ দিল কপালে। 'ওহ্ গড, পাইপ!'

মারভিন লংফেলো তাকিয়ে থাকলেন। মুখ তুলে তাকাল আশরাফও, চোখে

নিষ্প্রাণ দৃষ্টি। সোহানা জানতে চাইল, 'কি বলছ, রানা?'

সোহানার দিকে তাকাল রানা, কথা বলার সময় কর্কশ শোনাল গলাটা, 'আমি একটা ভুল করেছি। কাল রাতে তুমি যখন বললে প্রথমে আমরা পেনিফিদারকে শায়েস্তা করব, তারপর ধরব পাইথনকে, তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, দুটো বিষয়ের মধ্যে কি যেন একটা যোগাযোগ আছে। জানতাম, কি যেন মিলছে না।' আবার পায়চারি শুরু করল রানা। 'আসলে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা ভুলে গিয়েছিলাম আমি। পেনিফিদার আর ক্রনেল পানামায় আমাকে জেরা করেছিল, এক ফাঁকে নিজেদের মধ্যে কি নিয়ে যেন আলাপ করল ওরা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, জেনিকে তাদের কেন দরকার। পেনিফিদার বলল, দরকার আর্কিওলজিকাল রিসার্চের জন্যে। আমি ভাবলাম, কৌতুক করছে সে।'

আশরাফ ধীরে ধীরে বলল, 'কিন্তু ঠিক বুঝলাম না...।'

'পরিষ্কার,' বলল রানা। 'জেনি শুধু পাইপ নয়, দামী মেটালও খুঁজে বের করতে পারে। কাল আমি জানতে পারি, সেজন্যেই জেনিকে ধরতে চাইছে পেনিফিদার, ওকে দিয়ে মাটির তলায় পড়ে থাকা কিছু বের করবে। কথাটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম সোহানা যখন আমাকে বলল যে মাসে কি ঘটছে না ঘটছে সে-ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন ড. জিমসন। ড. জিমসনের সন্দেহ হয়, সেজন্যেই তাঁকে খুন করে পাইথন। দুটো ঘটনাই আমি জানতাম, অথচ মেলাতে পারিনি। মাস-এ কিছু একটা আছে, পেনিফিদার আর পাইথন সেটা পেতে চাইছে। শুধু জেনি সাহায্য করলে জিনিসটা তারা পেতে পারে।'

'যোগাযোগটা ক্ষীণ, মি. রানা,' শান্ত কণ্ঠে বললেন মারভিন লংফেলো। 'তৃতীয় নয়ন ছাড়া দেখতে পাবার কথা নয়।'

'যার তা নেই তার এ-পেশায় থাকা উচিত নয়,' বলল রানা, আত্মসমালোচনায় নির্দয়। মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল ও। 'স্যার ক্যানিং-এর সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া দরকার, কত তাড়াতাড়ি তা সম্ভব বলে মনে করেন?'

ভুরু কুঁচকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল আশরাফ, প্রসঙ্গটা ঠিক ধরতে পারছে না। তারপর তার মনে পড়ল, মাসে যে খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে তার যাবতীয় খরচ বহন করছেন স্যার ভিক্টর ক্যানিং।

বিএসএস চীফ ইতস্তত করছেন। 'ঠিক কি ভাবছেন বলুন তো, মি. রানা?'

'মাস আলজিরিয়ান এলাকা। আলজিরিয়ান সরকারের অনুমতি আদায় করা অত্যন্ত কঠিন ও ঝামেলার কাজ। আমি আর সোহানা ক্যারাভান রুট ধরে যেতে পারি, কিন্তু তাতে সময় অনেক বেশি লাগবে। আলজিয়ার্স-এ স্যার ক্যানিঙের একটা প্লেন আছে, সাপ্লাই নিয়ে আসা-যাওয়া করার অফিশিয়াল অনুমতিও আছে তাঁর। সেজন্যেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছি।'

পরবর্তী দু'মিনিট আবছাভাবে ওদের আলাপ শুনল আশরাফ, তার ভেতর একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব ফুটে উঠল। হঠাৎ বলল সে, 'আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।'

রানার প্রশ্নের উত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল সোহানা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল

আশরাফের দিকে। 'তুমি এখনও পুরোপুরি সুস্থ নও, আশরাফ। তাছাড়া...'

'কে বলল আমি সুস্থ নই? আমার মন খারাপ, সেটাকে তুমি অসুস্থতা বলতে পারো না। আমি এখানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব, এ হতে পারে না। পাইথন যখন জেনিকে ধরল, জেনি চিৎকার করে উঠেছিল। তার সেই চিৎকার এখনও আমি শুনতে পাচ্ছি।' হাত তুলে চোখ দুটোয় চাপা দিল সে। 'তার জগৎটা এরকম,' ধরা গলায় বলল সে, শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। 'অন্ধকার। সব সময় অন্ধকার। ভয় পাওয়া কাকে বলে আমি জানি, কিন্তু এক শুধু আল্লাই বলতে পারবে তার মনের কি অবস্থা!'

রানার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল সোহানা। কথা না বলে মাথাটা নিচু করল রানা।

ওদের হাবভাব লক্ষ করল আশরাফ, রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্লীজ, রানা, আমাকে তোমরা সঙ্গে নাও। এখানে থাকলে আমি দম বন্ধ হয়ে মরে যাব।' ভৌতিক হাসি ফুটল তার মুখে। 'আমাকে নিয়ে তোমাদেরকে কোন সমস্যায় পড়তে হবে না, কথা দিচ্ছি। বিশ্বাস করো, ভয়ে আমি জ্ঞান হারাব না। ভয় বলে সত্যি আর কিছু নেই আমার ভেতর। আমি আর পরোয়া করি না। এমনকি পাইথন আমাকে শুধু ঝাঁকি দিয়ে মেরে ফেলতে পারে, এ-কথা ভেবেও আমার ভয় লাগছে না। এমন হতে পারে, পাইথন যখন আমাকে মারার কাজে ব্যস্ত থাকবে, তোমরা হয়তো তাকে গুলি করার একটা সুযোগ পাবে।'

তার কথায় কেউ হাসল না। কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধল। সবাই তাকিয়ে আছে রানার দিকে। কয়েক মুহূর্ত পর গম্ভীর সুরে রানা বলল, 'আমরা জেনেশুনে বিপদের মধ্যে পড়তে যাচ্ছি। এ পরিস্থিতিতে আনাড়ি কাউকে সঙ্গে নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে তোমার ব্যাপারটা আলাদা, আশরাফ। আমি তোমার মধ্যে সত্যিকার সাহসী একজন পুরুষকে দেখতে পাচ্ছি। জেনিকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে সে যখন তোমার দায়িত্বে ছিল, কাজেই তাকে উদ্ধার করতে যেতে চাওয়ার অধিকার তোমার আছে।'

বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলো তাঁর সমস্ত প্রভাব খাটিয়ে স্যার ভিক্টর ক্যানিং-এর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের আয়োজন করতে সমর্থ হলেন। শহরের অভিজাত এলাকায় মার্বেল পাথরের প্রাসাদোপম অট্টালিকা ক্যানিং হাউসে ঠিক ছ'টার সময় ওদের সঙ্গে পাঁচ মিনিটের জন্যে দেখা করতে রাজি হয়েছেন ভদ্রলোক।

স্যার ক্যানিং শুধু যে বিশাল সব কোম্পানির মালিক তা নয়, বিশটার মত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষকও তিনি, বারোটা হাসপাতালের গভর্নিংবডির সদস্যও। কোন কাজেই তিনি কম মনোযোগী নন। প্রতিটি দায়িত্ব সতর্কতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে পালন করেন ভদ্রলোক। কাজেই তিনি যে অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ হবেন এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে।

অল্প বয়সে ব্যবসায় ঢোকেন স্যার ক্যানিং, পঁচিশ পেরোবার আগেই প্রথম

এক মিলিয়ন পাউন্ড কামিয়ে ফেলেন। দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও দূরদৃষ্টি তাঁর অন্যতম গুণ, যার ফলে ব্যবসাতে শনৈ শনৈ শুধু তাঁর উন্নতিই ঘটেছে। স্যার ক্যানিং একজন মৌন বা বোবা ধনকুবের। পত্র-পত্রিকায় কখনও তিনি সাক্ষাৎকার দেন না বা টিভির পর্দায় আসেন না। শোনা যায়, কোন রাজনৈতিক দলকেই চাঁদা দেন না তিনি, ফলে রাজনীতির ব্যাপারে তাঁকে নিরপেক্ষ বলে মনে করা হয়।

এখন তাঁর বয়েস পঞ্চান্ন, স্ত্রী মারা যাওয়ার পর পনেরো বছর হলো নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন। নিঃসন্তান তিনি। প্রাচীন মূল্যবোধে বিশ্বাসী, খুব কম মদ্য পান করেন, মাঝে মধ্যে ব্রিজ খেলেন, এবং যতটুকু জানা যায় নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর কোন দুর্নাম নেই। তাঁর একমাত্র শখ হলো অর্কিড চাষ। রিভেয়েরায় তাঁর একটা ভিলা আছে, গরমের দিনে সেখানে তিনি হপ্তা কয়েক কাটান, তবে অতিথিদের সেখানে কখনও অ্যাপায়ন করেন না। ভদ্রলোক গলফ খেলেন না, ব্যায়ামের জন্যে হাঁটেন ও সাঁতরান।

মেহগনি কাঠের প্রকাণ্ড একটা ডেস্কে মাত্র কয়েকটা জিনিস রয়েছে—ছোট একটা মেমো-প্যাড, বড় একটা ডেস্ক ডায়েরী, দুটো টেলিফোন, একটা ইন্টারকম। গভীর একটা স্যুইভেল চেয়ারে বসে আছেন স্যার ভিক্টর ক্যানিং, হেলান দিয়ে আছেন পিছনে, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা। তাঁর শরীরটা বিশাল, মাথার চুল নিখুঁতভাবে ব্যাকব্রাশ করা, কপালের দু'পাশে পাক ধরেছে। বয়স হলেও আশ্চর্য মসৃণ তাঁর চেহারা, এখনও কোন ভাঁজ বা রেখা পড়েনি।

ঝাড়া প্রায় পাঁচ মিনিট কথা বলছেন মারভিন লংফেলো, একবারও তাঁকে বাধা দেননি স্যার ক্যানিং।

মারভিন লংফেলোর পাশে বসে আছে রানা, পরনে ধূসর রঙের কমপ্লিট স্যুট। মাঝে মধ্যে ওর দিকে তাকাচ্ছেন স্যার ক্যানিং, তবে বেশিরভাগ সময় লক্ষ করছেন বিএসএস চীফকে। তাঁর চোখ দুটোয় আশ্চর্য একটা গভীরতা ও জাদু আছে, যেন মনে হয় খুঁটিয়ে দেখার জন্যে তিনি ওই চোখ দুটোর সাহায্যে নিজের ভেতর টেনে নেন প্রতিপক্ষকে। শিল্প ও বাণিজ্যের কুটিল জগতে চলার পথে সঙ্কট কখনও তাঁর পিছু ছাড়েনি, কিন্তু চোখ দুটো সাক্ষ্য দেয় সঙ্কট যতই তীব্র হোক, কখনও বিচলিত করতে পারেনি তাঁকে। মারভিন লংফেলোর গল্প তাঁর যদি অবিশ্বাস্য লেগেও থাকে, চেহারায় তার কোন আভাস ফুটল না। প্রতিটি শব্দ মন দিয়ে শুনছেন তিনি, গেঁথে রাখছেন অন্তরে, বিশ্লেষণ করছেন দ্রুত।

বিএসএস চীফ থামতেই প্রথম প্রশ্নটা করার জন্যে তৈরি হয়ে গেলেন স্যার ক্যানিং। রানার মনে হলো, ওই শান্ত চোখের পিছনে সম্ভাব্য প্রশ্নগুলো এরইমধ্যে সাজানো হয়ে গেছে।

'আপনার এই ধারণা কতটা যুক্তিসিদ্ধ, মি. লংফেলো?' অত্যন্ত মার্জিত কণ্ঠস্বর, উচ্চারণও বিশুদ্ধ। কোমল বিনয়ের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি।

মারভিন লংফেলো সরাসরি জবাব দিলেন, 'আমার কোন সন্দেহ নেই যে মাসে খারাপ কিছু একটা ঘটছে, এবং মেয়েটাকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকালেন স্যার ক্যানিং। 'নতুন করে ঢেলে সাজানো ব্রিটিশ সিক্রেট

সার্ভিসে আপনার অবদান সম্পর্কে খবর রাখি আমি। খবর রাখার কথা নয় আমার, তবু রাখি। কাজেই এ-ব্যাপারে আপনার বক্তব্য আমাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। আপনার কি ধারণা, এই ক্রিমিন্যালরা মাস দখল করে নিয়েছে?'

'আমার তাই বিশ্বাস।'

'প্রফেসর হোয়াইটস্টোনকে আপনি সন্দেহ করেন? সম্ভব, ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সে?'

'অসম্ভব বলেই মনে হয়। এ-কথা বলছি তাঁর সুখ্যাতির কথা মনে রেখে। বন্ধু-বান্ধবের কাছে তিনি অত্যন্ত সৎ ও নিরীহ হিসেবে পরিচিত।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করলেন স্যার ক্যানিং। 'তার রিপোর্টে সঙ্কটের কোন আভাসই আমি পাইনি।'

'রিপোর্টে কিছু থাকবে না, যদি পেনিফিদার ও পাইথন জায়গাটা দখল করে নিয়ে থাকে,' খানিকটা শুকনো লাগল মারভিন লংফেলোর গলা। 'তবে, ড. জিমসন তাঁর চিঠি পড়ে কিছু একটা সন্দেহ করেছিলেন।'

আবার মাথা ঝাঁকালেন স্যার ক্যানিং। 'হোয়াইটস্টোনকে আমার চেয়ে ভালভাবে চিনত সে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, আমাদের সামনে তিনটে বিকল্প পথ আছে। ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে আলজিরিয়ান সরকারকে অনুরোধ, ব্যাপারটা যেন তদন্ত করে দেখা হয়। একই উদ্দেশ্যে আমার তরফ থেকে আলজিরিয়ান সরকারকে অনুরোধ। কিংবা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশনের ব্যবস্থা করা।'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাবেন বিএসএস চীফ, সবিনয় ভদ্রতার সঙ্গে একটা হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন স্যার ক্যানিং। 'প্রথমটা বাতিল হয়ে যায়, কারণ দুই সরকারের মধ্যে সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না। দ্বিতীয় বিকল্পটা সম্ভব। হোয়াইটস্টোনকে আর তার টীমকে ফান্ড দেয়ার আগে প্রথমে আমাকে খোঁড়াখুঁড়ির জন্যে আলজিরিয়ান সরকারের শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হয়েছে। ওরা একটা নতুন মিউজিয়াম তৈরি করবে, সেজন্যে মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছি আমি। বলা যায়, ওদের ওপর ব্যক্তিগত খানিকটা প্রভাব আমার আছে। তবে আলজিরিয়ান সরকার তদন্ত শেষ করতে সময় নেবে অনেক বেশি। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। কারণ তাড়াতাড়ি কিছু করতে না পারলে মেয়েটাকে আমরা হয়তো বাঁচাতে পারব না। আর শুধু মেয়েটিই নয়, বিপদের মধ্যে রয়েছে হোয়াইটস্টোন ও তার টীমও।'

রানার দিকে তাকালেন স্যার ভিক্টর ক্যানিং। ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল তাঁর ঠোঁটে। 'এর আগে বলেছি, মি. লংফেলো সম্পর্কে খবর রাখি আমি,' বলে চলেছেন ভদ্রলোক। 'আমি আপনার সম্পর্কেও কিছু কিছু খবর রাখি, মি. মাসুদ রানা। যদি কিছু মনে না করেন, এটা তো অবভিয়াস যে বাংলাদেশ গভীর সঙ্কটে হাবুডুবু খাচ্ছে, বিস্তারিত বিবরণ না-ই বা দিলাম—কিন্তু তবু ভাবতে ভাল লাগে যে বাংলাদেশেরও গর্ব করার মত অনেক কিছু আছে—যেমন বিসিআই, যেমন রানা এজেন্সি। আমার ধারণা দক্ষ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের বিনিময়ে বাংলাদেশ ভাল

ফরেন কারেন্সি আয় করছে। সম্ভবত ব্রিটেন থেকেও।'

জবাব দিলেন মারভিন লংফেলো। 'মি. রানা ও মিস সোহানা আসলে বিএসএস-এর অবৈতনিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন। এর মধ্যে টাকা-পয়সার কোন ব্যাপার নেই। টপ সিক্রেট ব্যাপার, তবু বলি—আমাদের অনেক কাজ করতে গিয়ে ওদেরকে বহুবার মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হয়েছে।'

'ব্রিটেনের একজন নাগরিক হিসেবে ওঁদের প্রতি সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ,' সবিনয়ে বললেন স্যার ক্যানিং। 'তবে একটা কথা না বলে পারি না—বুদ্ধি ও চাতুর্যের অমার্জনীয় অভাব না ঘটলে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস এভাবে ধসে পড়ত না। নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব যদি আমার ওপর থাকত, পরিস্থিতি তাহলে অন্যরকম হত। থাক এ-প্রসঙ্গ। আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি, মি. রানা?'

'আপনার পাইলটকে বলুন, পরবর্তী রেগুলার ফ্লাইটে সে যেন দু'জন আরোহীকে নিয়ে যায় ওখানে। সরি··· তিনজনকে।'

'আপনি, মিস সোহানা, আর···কি যেন নাম ভদ্রলোকের? আশরাফ চৌধুরী। হ্যাঁ।' ডেস্ক ডায়েরী খুলে পাতা ওল্টালেন স্যার ক্যানিং। 'পরবর্তী রেগুলার ফ্লাইট আলজিয়ার্স থেকে মাসে যাবে বৃহস্পতিবার, মানে পরশুদিন।'

'তাহলে বৃহস্পতিবারেই যাব আমরা। আলজিয়ার্স গিয়ে কার সঙ্গে যোগাযোগ করব?'

'আমার এজেন্টের সঙ্গে। আমি একটা সাদা কাগজ সই করে দেব আপনাকে, তাকে দিয়ে যা যা করাতে চান অর্থাৎ নির্দেশগুলো লিখে নেবেন আপনি। আজ রাতে তাকে আমি ফোন করেও যা বলার বলে দেব। পাইলটকে আপনার হাতে তুলে দেবে সে।'

'ওরা দু'জনেই মুখ বন্ধ রাখবে তো?'

'অবশ্যই। বাছাই করা লোক ছাড়া রাখি না আমি, বাছাই করি আমি নিজে। তাছাড়া, পরবর্তী ফ্লাইটেই যাচ্ছেন যখন, আপনারা মাসে পৌছবার আগে কারও পক্ষে ওখানে কোন মেসেজ পাঠানো সম্ভব নয়।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, সন্তুষ্টবোধ করছে। 'পাইলট অভিজ্ঞ তো?' জানতে চাইল ও।

'ইউরোপ ও স্টেটস-এর সেরা ছ'জন পাইলটের একজন বলে মনে করি আমি তাকে।'

'ভালই হলো তাহলে। আমি চাইব সে যেন আমাদেরকে মাস থেকে দশ মাইল দূরে কোথাও নামিয়ে দেয়, তারপর আবার নিজের পথে রওনা হয়ে ভুলে যায় আমাদের কথা।'

ভুরু দুটো উঁচু করলেন ভিক্টর ক্যানিং। 'ওই এলাকায় সে-সুযোগ কি আছে?'

'আছে,' আশ্বস্ত করল রানা। 'সাহারার মাত্র সাত ভাগের এক ভাগ বালিয়াড়ি। শক্ত সমতল জমিন অনেক পাওয়া যাবে। তবে তাকে আমি ব্যাপারটা জানাব সময়মত। তার মধ্যে যদি দ্বিধা দেখি, আমরা প্যারাশুট ব্যবহার করব। কারও চোখে না পড়ে মাসে পৌছুতে হবে আমাদের। আগে জানতে হবে ঠিক কি ঘটছে

ওখানে।'

স্যার ক্যানিঙের চোখে কৌতূহল, রানার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর মারভিন লংফেলোর দিকে তাকালেন তিনি। 'এ-ব্যাপারে আপনার কি ধারণা?'

সতর্ক হাসি ফুটল মারভিন লংফেলোর মুখে। 'মি. রানাকে তার কাজ সম্পর্কে আমি কোন পরামর্শ দিতে রাজি নই।'

রানার দিকে তাকালেন স্যার ক্যানিং। 'সে-চেষ্টা আমিও করছি না। এক্সকিউজ মি ফর আ মোমেন্ট।' একটা দেরাজ খুলে ডাই-স্ট্যাম্পড কাগজ বের করলেন তিনি। সোনালি কলম দিয়ে প্রায় ষাট সেকেন্ড দ্রুত লিখলেন কাগজটায়। 'এখানে আলজিয়ার্সে আমার এজেন্টের ঠিকানা থাকল, সেই সঙ্গে নেসেসারি অথোরাইজেশন।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি, ডেস্ক ঘুরে এগিয়ে এলেন রানার হাতে ওটা ধরিয়ে দেয়ার জন্যে। 'চলবে তো?'

লেখাটা দ্রুত পড়ল রানা। স্পষ্ট হস্তাক্ষর, পরিচ্ছন্ন। 'হ্যাঁ, সব দিক কাভার করছে। ধন্যবাদ, স্যার ক্যানিং।'

'কবে নাগাদ আপনার কাছ থেকে খবর পাব আমরা, মি. রানা?'

'রিপোর্ট করার মত কিছু পেলেই আমরা আপনাকে জানাব। মি. লংফেলোর কমিউনিকেশন রূমের সঙ্গে আমাদের একটা রেডিও লিঙ্ক থাকবে।'

'কিন্তু তা তো সম্ভব নয়,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বললেন স্যার ক্যানিং। 'ওরা আমাকে জানিয়েছে মাস হল ডেড এরিয়া, মানেটা যা-ই হোক। পাহাড় আর তাদেমিট মালভূমির সঙ্গে কি যেন একটা সম্পর্ক আছে। সেজন্যেই তো হোয়াইটস্টোনের সঙ্গে আমার কোন রেডিও লিঙ্ক নেই। আমাদেরকে নির্ভর করতে হবে চিঠি পত্রের ওপর।'

অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ধীর পায়ে জানালার দিকে এগোলেন তিনি। 'আপনি হয়তো তিন বা চারটে রেডিও লিঙ্ক ব্যবহার করে সমস্যাটার সমাধান করতে পারবেন—এ-সব আমি ভাল বুঝি না।'

'না।' মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল রানা। 'সেটা অত্যন্ত জটিল।' মাথা ঝাঁকিয়ে ওর সঙ্গে একমত হলেন মারভিন লংফেলো।

স্যার ক্যানিং বললেন, 'তাতে অবশ্য তেমন কিছু এসে যাবে না, শুধু এদিকে আমরা কিছু জানতে না পারায় টেনশনে থাকব। আপনারা যদি সাহায্য চেয়ে মেসেজ পাঠান, আমাদের তরফ থেকে তেমন কিছু করার থাকবে না। আলজিরিয়ার মাটিতে থাকবেন আপনারা, আমি বললে হয়তো ওদের সরকার সাহায্য পাঠাতে রাজি হবে, কিন্তু ভাবতেও ভয় লাগে কি রকম সময় নেবে ওরা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন বিএসএস চীফ। স্যার ক্যানিং ঠিকই বলেছেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে গোটা ব্যাপারটার সমাপ্তি না ঘটা পর্যন্ত ভাল-মন্দ কিছুই জানতে পারবেন না তিনিও।

'তিন হপ্তা সময় দিন আমাকে,' বলল রানা। 'জানি, লম্বা সময় চাইছি। কিন্তু মাসও আধুনিক সভ্য জগত থেকে অনেক দূরে। ওখানে গিয়ে কি দেখব এখনও আমরা জানি না। আপনি শুধু দেখবেন, প্লেনটা যেন রেগুলার ফ্লাইট মিস না

করে।'

কয়েক মুহূর্ত রানার দিকে তাকিয়ে থাকার পর স্যার ক্যানিং জানতে চাইলেন, 'কিন্তু তিন হপ্তার ভেতর আপনার কাছ থেকে যদি কোন খবর না পাই?'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা। 'সেক্ষেত্রে ধরে নেবেন, আমরা ব্যর্থ হয়েছি। পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করে আপনাদের দু'জনের ওপর। তবে যা-ই করুন না কেন, তাতে আমাদের কোন উপকার হবে বলে মনে হয় না।'

'বোধহয় উপকার হবে,' শান্ত গলায় বললেন স্যার ক্যানিং। 'তিন হপ্তার ভেতর আপনার কাছ থেকে কোন মেসেজ না পেলে আমি নিজে মাসে চলে যাব। আমার সঙ্গে দু'একজন আলজিরিয়ান মন্ত্রী থাকবেন, থাকবে একজন এসকর্ট। তবে, আশা করব, তার দরকার হবে না।' রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'সিনসিয়ারলি আশা করব, ব্যাপারটা অতদূর গড়াবে না।'

দুই

প্লেনটা সেসনা স্কাইওয়াগন, ৩০০ ঘোড়া কন্টিনেন্টাল ১০-৫২০ এঞ্জিন। মাল-পত্র তোলা ও নামানোর জন্যে দু'পাশেই একটা করে বড় দরজা আছে। পানির ড্রামগুলোকে জায়গা করে দেয়ার জন্যে দুটো বাদে বাকি সব সিট সরিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রতিটি ড্রামে ত্রিশ গ্যালন করে পানি থাকে। হপ্তায় দু'বার মাসে যায় সেসনা।

প্লেনের ডেকে দুটো বড় সুটকেস তুলল রানা। চার ড্রাম পানি ও খাবার ভর্তি একটা কাঠের বড় বাক্স আগেই তোলা হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে তিনজন আরোহী উঠলে সেসনার ধারণক্ষমতা ছাড়িয়ে যাবে, তবে সেটা উদ্বিগ্ন হবার মত কিছু নয়।

এয়ারফিল্ডের গরম টারমাক ধরে হেঁটে এল সোহানা, পিছনেই রয়েছে আশরাফ। হালকা হলুদ ফুলহাতা শার্ট ও ঢোলা স্ন্যাকসে পরিবেশের সঙ্গে বেমানান, প্রায় বিদঘুটে লাগছে তাকে, ব্যাপারটা আরও হাস্যকর হয়ে উঠেছে ফিতে বাঁধা ব্রাউন জুতো পরায়। তার মন খুব খারাপ, কাজেই ব্যাপারটা লক্ষ করলেও চুপ করে আছে সোহানা।

একই ধরনের কাপড় পরেছে রানা ও সোহানা, ধূসর কমব্যাট ড্রেস। দেখে মনে হবে, যুদ্ধ করতে যাচ্ছে ওরা। প্লেনে উঠে তাড়াতাড়ি সোহানার পাশের সিটটা দখল করে নিল আশরাফ। ওদের ঠিক পিছনে কাঠের বাক্সটার ওপর বসল রানা। হাত বাড়িয়ে সীটের পাশের একটা হাতল ঘোরাল ও, আশরাফের সীটটা পিছন দিকে হেলে পড়ল খানিকটা। 'হেলান দিয়ে বস, আরাম পাবে,' বলল রানা।

খোলা দরজা দিয়ে প্লেনে চড়ল এক লোক, একহাতে ফ্লাইং হেলমেট। দাগবহুল নীল জিনস আর রঙ ওঠা শার্ট পরে আছে। মাথা ভর্তি কাঁচাপাকা চুলের নিচে মুখটা প্রাণচঞ্চল এক তরুণের, কিন্তু চোখ দুটো ঠাণ্ডা ও শান্ত। সাত ঘাটের

পানি খাওয়া লোক, নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা। বলল, 'আরে, ওয়াটসন তুমি!'

'হাই, রানা!' নরম আমেরিকান কণ্ঠস্বর, ঠাণ্ডা ও শান্ত, পাঁশুটে চোখের মতই ভাব বোঝা যায় না। 'হাই, ম্যা'ম। লং টাইম।'

'হ্যাঁ, অনেক দিন,' বলল রানা। 'কেমন চলছে তোমার?'

'রেগুলার হয়ে গেছি, রানা।' হেলমেট পরে দরজাটা বন্ধ করল বিল ওয়াটসন। 'তোমরা সবাই রেডি তো?'

'হ্যাঁ। এজেন্ট বলছিল, তোমার জানা ভাল একটা জায়গা আছে, মাস থেকে মাইল আটেক দূরে, ওখানে আমাদেরকে তুমি নিরাপদে নামিয়ে দিতে পারবে।'

'শিওর। লম্বায় খানিকটা ছোট, তবে ম্যানেজ করে নেব।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ওয়াটসন যখন আশ্বাস দিচ্ছে তখন আর চিন্তার কিছু নেই। স্যার ক্যানিং যখন বললেন তার পাইলট ইউরোপ ও আমেরিকার ছ'জন সেরা পাইলটের একজন, ও ধরে নিয়েছিল ভদ্রলোক বাড়িয়ে বলছেন। ওয়াটসনকে দেখে ভুলটা ভেঙে গেছে ওর। বিল ওয়াটসন উড়তে জানে। শুধু যে পেশা তা নয়, ওড়াটা তার নেশা। যে-কোন প্লেন নিয়ে উড়তে পারে সে। দুর্যোগের সময় বেশিরভাগ পাইলট যখন মাটি ছাড়তে চায় না, দেখা যাবে প্লেন নিয়ে দিব্যি ওঠানামা করছে বিল ওয়াটসন। মজার ব্যাপার হলো, নিয়ম ধরে প্লেন চালানো শেখেনি সে। প্লেন যেন তার অস্তিত্বের একটা অংশ, ধাতব কলকব্জার সমষ্টিমাত্র নয়। সেজন্যেই তাকে দেখে মনে হয় প্লেনের সঙ্গে ওড়ে সে, প্লেনটাকে চালায় না। মানুষ তার ডানার সাহায্যে উড়তে পারলে যে-সব কায়দা-কসরৎ করে মনের শখ মেটাত, ডানা না থাকা সত্ত্বেও প্লেনটাকে নিয়ে তারচেয়েও মজার ও বিপজ্জনক কায়দা-কসরৎ দেখাতে পারে বিল ওয়াটসন, অবলীলায়।

এয়ার সার্কাস-এর হয়ে প্লেন চালিয়েছে ওয়াটসন। বিভিন্ন সময়ে আমেরিকান ও রাশিয়ার জেট ফাইটার চালিয়েছে দূর প্রাচ্যে। এয়ারলাইন্স-এর পাইলট হিসেবে বড় আকারের জেটও চালিয়েছে। চোরাই মাল অর্থাৎ আর্মস, সোনা ও হিরোইন নিয়ে আকাশ পাড়ি দিয়েছে। আইন সম্মত হোক বা না হোক, সেটা বিল ওয়াটসনের দেখার বিষয় নয়, সে ভাড়া খাটে। টাকা দিলেই ভাড়া খাটে, পক্ষ বিপক্ষ বলে কিছু নেই তার কাছে। কারও প্রতি বিশ্বস্ত নয় সে, শুধু একজন বাদে, যে তাকে টাকা দেয়।

রানা ও সোহানা তাকে তিনবার ব্যবহার করেছে অতীতে। একবার তাইওয়ান, একবার হাইফা, শেষ বার এথেন্স থেকে পালাবার দরকার হওয়ায়। ওদের পরিচয় সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই, তবে হয়ত আন্দাজ করে নিয়েছে আন্তর্জাতিক চোরাচালানী দলের সদস্য হবে। প্রচুর টাকা নিলেও, বেঈমানীর কোন চেষ্টা না করে ওদেরকে নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে সে। তবে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে নেয়ার সময় এক পর্যায়ে বলেছিল, নিজেদের গরজেই ওদের উচিত তাকে বেশি টাকা দেয়া, কারণ তাহলে ওদের প্রতিপক্ষরা ওকে আরও বেশি টাকা অফার করে কিনে নিতে পারবে না। ফ্রিল্যান্স ও ভবঘুরে টাইপের লোক সে, একটানা

বেশিদিন কোথাও থাকে না।

'ফেরার পথে ফুয়েল নেবে কোত্থেকে, ওয়াটসন?' জানতে চাইল রানা

'লোকজনদের আমি পরে নিয়ে গেছি ওখানে,' বলল ওয়াটসন, ওদেরকে সাবধানে পাশ কাটিয়ে ককপিটের দিকে এগোল সে। 'তার আগে তিন হপ্তা ধরে প্রতিদিন গ্যাস আর পানি পৌঁছে দিয়েছি। মাসে আমাদের সব জিনিসই প্রচুর পরিমাণে মজুদ আছে।'

সোহানা জানতে চাইল, 'ওয়াটসন...মাসে বেমানান কিছু লক্ষ করেছ তুমি? এমন কোন লোককে দেখেছ, যাদেরকে ওখানে তুমি নিয়ে যাওনি? বা অন্য কোন প্লেন? প্রফেসর হোয়াইটস্টোনকে চিন্তিত বলে মনে হয়েছে তোমার? তাঁর আচরণে...।'

দাঁড়িয়ে পড়ল ওয়াটসন, প্রথমে রানার দিকে, তারপর সোহানার দিকে তাকাল। চোখে হাসি নেই, কৌতূহল নেই, মুখেও কোন ভাব ফুটল না। নিচের ঠোঁটটা হঠাৎ কামড়াল সে। 'আমি, ম্যা'ম?' সমীহের সঙ্গে বলল, মাথা নাড়ল। 'এ-সব লক্ষ করার মানসিকতা কোন কালে ছিল আমার? আমি শুধু উড়ে যাই আর ফিরে আসি। কে কি করছে চেয়েও দেখি না, মাথাও ঘামাই না।'

ককপিটে ঢুকে পাইলটের সিটে বসল ওয়াটসন, রানার দিকে ফিরে সোহানা বলল, 'লোকটার কিছুই বদলায়নি।'

রানা কোন মন্তব্য করল না।

খক খক করে উঠে স্টার্ট নিল এঞ্জিন। সেফটি-বেল্ট বাঁধল আশরাফ, বলল, 'তোমাদের পুরানো বন্ধু, তাই না? তারমানে দলে আরেকটু ভারী হলাম আমরা।'

মাথা নাড়ল সোহানা। 'ওয়াটসন শুধু ওড়াউড়ির ব্যাপারে আগ্রহী, কারও দলে থাকতে রাজি নয়। তবে স্যার ক্যানিং তাকে চাকরি দিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে বেতন পায়, কাজেই তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে সে। ফ্লাইং অর্ডারস, দ্যাট ইজ। তার বাইরে আর কিছু জানতে চায় না সে।'

অনেক পিছনে ও উত্তরে রয়েছে অ্যাটলাস পর্বতমালা। ওদের সেসনা অসংখ্য বালিয়াড়ি পেরিয়ে এসেছে। এই মুহূর্তে যত দূর দৃষ্টি চলে, দুই দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বাদামি রঙের কার্পেটের মত শুধু বালি আর বালি, মাঝে মাঝে দ্বীপের মত মাথাচাড়া দিয়ে আছে কালো বা খয়েরি পাথরের স্তূপ।

প্লেনের ভেতর খুব যে গরম লাগছে তা নয়, তবে বাম পাশে সূর্যটা এত বেশি উজ্জ্বল ও প্রখর যে ওদিকে তাকানো যায় না। বাধ্য হয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হচ্ছে আশরাফকে মরুভূমির বিশালত্ব উপলব্ধি করে নিজেকে তার অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য বলে মনে হলো। তিন ঘণ্টা হলো একটানা উড়ছে ওরা, মাত্র একবার প্রাণের চিহ্ন দেখতে পেয়েছে সে—দশটা উট, একটা বালির ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে, আরোহী সহ ওগুলোকে কালো বিন্দুর মত দেখাল। দু'বার শিংঅলা গজলা হরিণ দেখেছে রানা ও সোহানা, চোখ কুঁচকে বহু চেষ্টা করার পরও আশরাফের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি ওগুলো।

'এলাকা ভেদে,' বলল সোহানা। 'তাকানোর ভঙ্গি বদলাতে হবে তোমাকে। জঙ্গল, মরুভূমি, শহর, প্রতিটির জন্যে আলাদা দৃষ্টি আছে। সামান্য একটা প্র্যাকটিস করলে তুমিও দেখতে পাবে।'

সূর্য নিচের দিকে নেমে এসেছে, এই সময় প্লেনের কন্ট্রোল অটোমেটিক-এ দিয়ে ককপিট থেকে বেরিয়ে এল বিল ওয়াটসন। সেসনার এঞ্জিন তেমন শব্দ করে না, তবু তার গলা নরম বলে একটু চড়াতে হল। 'আধঘণ্টার মধ্যে তোমাদেরকে নামিয়ে দেব, রানা।' সম্বোধনের মধ্যে ব্যঙ্গ বা কৌতুক নেই থাকলে নির্লিপ্ত একটা সুর আছে।

'জায়গাটা কি রকম, ওয়াটসন, একটা ধারণা দাও,' বলল রানা।

'সমতল বালি আর নুড়ি পাথর। পাশেই নিচু, আঁকাবাঁকা একটা রিজ। পানি নেই।' কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াটসন। 'কতদূর পর্যন্ত পানি নেই তা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারবে। তবে এজেন্টের কথামত তোমাদের জন্যে অতিরিক্ত একটা ড্রাম তুলেছি প্লেনে। ঠিক আছে?'

'লোকবসতি?'

'পাগল।'

'ক্যারাভান রুট? আশপাশে?'

'থাকতে পারে, তবে আশপাশে নয়, অনেক পুবে ও উত্তরে। কথা দিচ্ছি, কারও সাথে তোমাদের দেখা হবে না।'

'ধন্যবাদ।'

কন্ট্রোলে ফিরে গেল ওয়াটসন, পিছন থেকে আশরাফকে বলল রানা, 'খুব একটা অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। রিজটা ছায়া দেবে। একটা গুহাও পেয়ে যেতে পারো।'

মাথা ঝাঁকাল আশরাফ। তার ভূমিকা আগেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মাস থেকে কয়েক মাইল দূরে থাকবে ওদের ঘাঁটি, ঘাঁটির দায়িত্ব থাকবে তার ওপর। দিন দশেকের পানি ও খাবার আছে ওদের সঙ্গে। প্রথম রাতেই রানা ও সোহানা পায়ে হেঁটে মাসে যাবে। তার মানে আজ রাতেই, প্রায় একটা ঝাঁকি খেয়ে হঠাৎ উপলব্ধি করল আশরাফ। পরবর্তী প্ল্যান এখনও ঠিক করা হয়নি, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা হবে, আগে ওরা মাসের পরিস্থিতি দেখে ফিরে আসুক।

রানা বলল, 'আর্মস বেশির ভাগই তোমার কাছে রেখে যাব আমরা, আশরাফ ওখানকার পরিস্থিতি বুঝে যখন যা দরকার নিয়ে যাব পরে।'

'তুমি তো কার-ফিফটিন চালাতে জানো, কটেজে থাকতে শিখিয়েছিলাম,' বলল সোহানা। 'বলা যায় না, এক্সট্রা একজন গানম্যান দরকার হতে পারে আমাদের। অবশ্য তুমি যদি রাজি থাকো।'

আশরাফের চোখের সামনে জেনির নিষ্পাপ সরল মুখটা ভেসে উঠল। চোয়াল শক্ত করল সে। 'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করে বলল, 'আমি রাজি।'

সূর্য এখন দিগন্ত ছুঁই ছুঁই করছে, সরাসরি ওদের সামনে। প্লেন ঘুরিয়ে নিল ওয়াটসন, পুব দিকে মুখ করে ল্যান্ড করবে সে। নিচে নামছে প্লেন, এরইমধ্যে গাঢ়

ছায়া মুড়ে ফেলেছে নিচের মরুভূমিকে।

কোথায় ল্যান্ড করবে, ওদেরকে দেখাল ওয়াটসন। জায়গাটাকে ঘিরে একবার চক্কর দিল প্লেন। তারপর আবার নামতে শুরু করল। ল্যান্ড করার সময় কোন ঝাঁকি লাগল না, কাঁকরে চাকা পড়ায় শুধু একটা কাঁপন অনুভব করল ওরা, বিল ওয়াটসনের সেসনা যেন একটা হালকা প্রজাপতির মত বালি ছুঁলো।

অনেক কষ্টে একটা ঢোক গিলল আশরাফ। এখনও তীরবেগে ছুটছে ওদের প্লেন, সামনে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে রিজটা। সরাসরি পাথরের একটা পাঁচিলের দিকে ছুটছে ওরা।

তার হাত ধরে মৃদু চাপ দিল সোহানা। 'ভয় পেয়ো না। ওর নাম বিল ওয়াটসন।'

ঢালু পাথর-প্রাচীরের গায়ে চওড়া একটা ফাটল দেখা গেল, তার ঠিক বিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল সেসনা। বন্ধ হলো এঞ্জিন, থামল কাঁপুনি। অলস ভঙ্গিতে নিজের সিট থেকে উঠে দাঁড়াল বিল ওয়াটসন।

'দশ মিনিট, ওয়াটসন,' বলল রানা। 'আশরাফ, ড্রামের রশিগুলো খোল। সোহানা, এসো, আশপাশটা আগে একবার দেখে নিই।'

দরজা খুলল সোহানা, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে, পিছনে রানা। ইতিমধ্যে সূর্য ডুবে গেছে, হঠাৎ করে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। পাথর ও বালি গরম হয়ে আছে এখনও, আঁচ লাগল হাতে ও মুখে। 'দিনে গরম, রাতে শীত,' বলল সোহানা। 'আশরাফের সহ্য হলে হয়।'

'জেনির জন্যে এমন উতলা হয়ে আছে, এ-সব বোধহয় লক্ষ্যই করবে না,' বলল রানা, তাকিয়ে আছে পাথুরে প্রাচীরের গায়ে চওড়া ফাটলটার দিকে। 'মাল-পত্র নামানোর পর ভেতরটা একবার দেখতে হবে। দেখে মনে হচ্ছে ঘাঁটি হিসেবে কাজে লাগানো যাবে।'

আলোর টানেলটা প্রচণ্ড এক ঘুসির মত লাগল রানাকে। কোনও ধরনের স্পটলাইট, ফাটলের ঢালু দিকটা থেকে ওদের সামনে বালির ওপর তাক করা হয়েছে। আলোর একটা চোখ ধাঁধানো বৃত্ত, বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনি উডহাউস। শার্ট আর ট্রাউজার পরে রয়েছে সে। একা। দাঁড়িয়ে আছে ওদের দিকে মুখ করে, বিশ কি বাইশ কদম দূরে। তার মুখে কি যেন একটা বাঁধা রয়েছে, হাতদুটো পিছনে।

গুলি হলো এক পশলা। সাবমেশিনগানের আওয়াজ। জেনির কয়েক ফুট বাম দিকে বালি ও নুড়ি পাথর লাফিয়ে উঠল।

তারপর নিস্তব্ধতা নামল। কয়েক সেকেন্ড পর জেনির পিছনের অন্ধকার থেকে ভেসে এল একটা মার্জিত কণ্ঠস্বর। বিশুদ্ধ ইংরেজি, নিখুঁত উচ্চারণ, হাস্যরসে সমৃদ্ধ। 'ভাই ও বোনদের দলে স্বাগত জানাই তোমাদের। বিপদটা কার ও কি রকম, সবাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, কাজেই এ-ব্যাপারে কথা বলা বাহুল্য বলে মনে করি, রানা। শুধু এটুকু জানাই, প্রথমে তোমরা নয়, মারা পড়বে বেচারি অন্ধ মেয়েটা। তারপরই অবশ্য তোমাদের পালা। দু'জন একসাথে, ঠিক আছে?

চিরকাল একসাথে আছ।' হঠাৎ আঁতকে ওঠার ভান করল পাইথন। 'ওরে সর্বনাশ, তোমাদের সাথে দেখছি বীরপুরুষটাও আছে!'

মাথাটা একটু ঘোরাল রানা, দেখল প্লেনের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আশরাফ। স্পটলাইটের আভায় পরিষ্কার দেখা গেল না তার চেহারা, তবে মনে হলো ভয়ে কুঁকড়ে আছে সে।

প্লেনের দরজা ধরে কাঁপুনিটা বন্ধ করার চেষ্টা করছে আশরাফ। রানা ও সোহানা, দু'জনের হাতেই একটা করে কোল্ট .৩২ দেখে সে ভাবল, ওগুলো সম্ভবত স্পটলাইট জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে ওদের হাতে। দেখল, আঙুলের চাপ দিয়ে ধীরে ধীরে সেফটি-ক্যাচ অন করল রানা, মুঠোটা আলগা করল যাতে শুধু ট্রিগার-গার্ডে আঙুল থাকায় রিভলভারটা ঝুলে পড়ে। তারপর শান্তভাবে ঝুঁকল রানা, বালির ওপর রাখল অস্ত্রটা, সিধে হলো ধীরে ধীরে। ওর দেখাদেখি সোহানাও তাই করল।

আর কিছু আশা করার নেই, কাঁপুনিটা আপনা থেকেই কমে এল, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে ওদের পাশে দাঁড়াল আশরাফ।

'বেশ, বেশ। খুব খুশি হলাম,' অন্ধকার থেকে প্রশংসা করল পাইথন। 'তোমরা যদি বেচারি অন্ধ জেনির পেটের ওপর খেয়াল রাখ, আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ বাধবে না। বলেছি কি, প্রথমে আমরা ওর পেটে গুলি করব?'

সেসনার দরজায় উদয় হলো বিল ওয়াটসন, অলসভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরাল। ওয়াটসন প্রথম থেকেই সব জানত, উপলব্ধি করে প্রচণ্ড রাগ হলো আশরাফের।

মাথা না ঘুরিয়ে শান্তস্বরে জানতে চাইল রানা, 'কেন, ওয়াটসন?'

শার্টের ভেতর ওয়াটসনের চওড়া কাঁধ দুটো ঝাঁকি খেতে দেখল আশরাফ। প্রায় প্রতিবাদের সুরে বলল পাইলট, 'যে আমাকে টাকা দেয়, আমি তার। যাকে দেখি সবার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে, আমি তার পক্ষে। তোমরা জানো, রানা।'

অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এল পাইথনের অতিকায় কাঠামো। তার হাত দুটো এত লম্বা, মুহূর্তের জন্যে মনে হলো একজোড়া কুঠার বহন করছে সে, প্রায় হাঁটু ছাড়িয়ে নেমে এসেছে। তার পিছনে, জেনির দু'পাশে, আরও কয়েকটা ছায়ামূর্তি দেখা গেল। অন্তত দু'জনকে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। দু'জনের হাতেই সাবমেশিনগান।

দাঁড়িয়ে পড়ল পাইথন। নিঃশব্দে হাসছে। চোখে আগ্রহ, কয়েক সেকেন্ড সোহানাকে খুঁটিয়ে দেখল সে। তারপর রানার দিকে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড কথা বলল না। ধীরে ধীরে বিস্তৃত হলো মুখের হাসি। তারপর বলল, 'আশা করি এই ক'বছরে তোমার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, রানা। থাপ্পড় খেয়ে পড়ে যেয়ো না, পড়লে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ো। আর যদি লড়ার কোন ইচ্ছে না থাকে, তা-ও বলতে পারো। তোমাকে তাহলে ওদের কারও হাতে তুলে দেব আমি। লড়তে নেমে ইঁদুর মারা আমার পোষাবে না। তোমার পাঁজরগুলোর খবর কি?'

সোহানা তাকিয়ে আছে রানার দিকে। শরীরের দু'পাশে হাত দুটো স্থির,

আলগাভাবে ভাঁজ করা আঙুলগুলো সিধে হলো, তারপর আবার ভাঁজ হয়ে গেল। চোখ সরিয়ে নিল সোহানা। খানিকটা স্বস্তিবোধ করছে ও। রানা সঙ্কেত দিল, এই মুহূর্তে কোন অ্যাকশন নয়। সাবমেশিনগানগুলো জেনির দিকে তাক করা রয়েছে। তাকেই প্রথম গুলি করা হবে। পরিস্থিতি কিভাবে নিজের অনুকূলে রাখতে হয় জানে পাইথন।

'অভিমান হলো নাকি, রানা? আমার কথার জবাব দেবে না?' অমায়িক হাসি ফুটল পাইথনের মুখে। 'আরে ভাই, রাগ কখনও পুষে রাখতে নেই। রাগের কোন মূল্যও নেই, যদি না তোমার বাহুতে বল থাকে। ঠিক আছে, তোমার সাথে পরে কথা বলব।'

এগিয়ে এল সে, তার প্রকাণ্ড ছায়া ওদের তিনজনকে প্রায় ঢেকে দিল। হেঁটে এসে আশরাফের সামনে দাঁড়াল পাইথন, প্রায় অস্তিত্বহীন দুই ভুরুর একটা কুঁকড়ে উঁচু হলো খানিকটা। 'দি সসপ্যান ম্যান,' বলল সে। 'ওহ্, ডিয়ার। আমি ধরেই নিয়েছিলাম তুমি পটল তুলেছ। তবে যে-সময়টুকু বেঁচে ছিলে বা আছ, সেটা ধার করা, তার মেয়াদ এই মাত্র শেষ হয়ে গেল।' প্রকাণ্ড একটা হাত স্যাৎ করে ওপরে উঠল, চেপে ধরল আশরাফের ঘাড়। আশরাফের মনে হলো শরীরের প্রতিটি নার্ভ অবশ হয়ে গেছে।

'বোকামি করছ,' রানার গলা অসম্ভব শান্ত।

'করছি বুঝি?' ঠোঁট টিপে হাসল পাইথন। 'সত্যি?' অনায়াসে আশরাফকে এক হাতে উঁচু করল সে, বালি থেকে শূন্যে উঠে পড়ল পা দুটো।

'সত্যি।' রাগ নয়, রানার গলায় সামান্য ঘৃণা। 'জেনিকে দিয়ে তোমরা যা করাতে চাও, ওই বিষয়ে আশরাফ একজন এক্সপার্ট। দি টপ এক্সপার্ট।'

'বলে কি!' আশরাফের মাথাটা নিজের দিকে ঘোরাল পাইথন, যেন একটা পুতুলকে ধরে আছে সে।

তীব্র ব্যথা ঘাড় থেকে ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে, আশরাফ বুঝতে পারছে মৃত্যুর কাছ থেকে মাত্র কয়েক চুল দূরে রয়েছে সে। সবার সামনে তাকে অপমান করা হচ্ছে। তারপরও ঠোঁটে বোকার মত হাসি ফুটিয়ে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, সাথে করে আমি কোন রেফারেন্স নিয়ে আসিনি।'

তাকিয়ে থাকল পাইথন। পরমুহূর্তে তার প্রকাণ্ড বুক থেকে সগর্জনে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল অট্টহাসি। হাতটা আলগা করল সে, ভারি বস্তার মত বালির ওপর খসে পড়ল আশরাফ। 'মাইরি বলছি, ভারি মজা পেলাম,' বলল পাইথন, হাসির দমকে এখনও কাঁপছে সে। 'আমাদের কোন এক্সপার্ট দরকার আছে কিনা ঠিক জানি না, তবে আরও কিছুটা সময় তোমাকে ধার দেয়া যেতে পারে।'

সোহানার দিকে এগোল পাইথন। 'রানাকেও আমি খানিকটা সময় বরাদ্দ করেছি। কিন্তু তোমাকে আপাতত বাঁচিয়ে রাখার কোন বিশ্বাসযোগ্য কারণ দেখাতে পারবে তুমি, সোহানা?'

'না।' সোহানার মধ্যে আড়ষ্ট কোন ভাব নেই, তবে সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ

করছে পাইথনকে। 'তবু একটা কথা আছে। পরিস্থিতি এখন তোমার অনুকূলে, কিন্তু আমাদের কাউকে তুমি খুন করছ দেখলে অবশ্যই বদলে যাবে সেটা।' চট করে জেনি আর তার পাশে দাঁড়ানো সশস্ত্র লোক দু'জনের দিকে একবার তাকাল ও, তারপর আবার কুৎসিত মুখটার ওপর ফিরিয়ে আনল দৃষ্টি। 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব, তুমি আমাকে খুন করবে, সেটি হবার নয়, পাইথন। বলছি না যে কাজটা তুমি পারবে না। তবে, গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, তোমার একটা চোখ আমি খুলে আনব।' এক মুহূর্ত থেমে আবার বলল, 'আর কিছু না পারি।'

'ব্যাপারটা জমে উঠছে! প্রতি মুহূর্তে বৈচিত্র্যের সন্ধান পাচ্ছি আমি।' পাইথনের গলায় অকৃত্রিম উল্লাস। 'বোঝা যাচ্ছে ক'টা দিন দারুণ মজা পাব আমরা।'

টলমল করতে করতে সিধে হয়ে দাঁড়াল আশরাফ। তার শরীর কাঁপছে। কাঁপুনিটা বন্ধ করতে চাইছে, সেই সঙ্গে চিন্তার এলোমেলো জগৎ থেকে একটা উদ্ভট ধারণা খুঁজে নিতে চেষ্টা করছে।

চিন্তাটা তার মাথায় এসেছিল পাইথন যখন তাকে খুন করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ঘাড়ের পিছনটা ডলল সে, তাকাল সোহানার দিকে, তারপর কাতর কণ্ঠে বলল, 'রোদ লেগে চামড়ার ক্ষতি হতে পারে, তাই ক্রীম মেখেছিলাম। ওর হাতের ঘষা লেগে সবটুকু উঠে গেছে।'

চোখে অবিশ্বাস, আশরাফের দিকে তাকিয়ে থাকল পাইথন। তারপর আবার তার বুক থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল সগর্জন হাসি। অস্বাভাবিক লম্বা হাত দিয়ে উরুর ওপর চাপড় মারল সে, ঠাস করে পটকা ফাটার আওয়াজ হলো। 'আরে, এ তো দেখছি আমার সামনে কৌতুকের ভাণ্ডার খুলে গেছে! হাসির এত খোরাক নির্ঘাৎ আমার আয়ু পঞ্চাশ বছর বাড়িয়ে দেবে!' অন্ধকার ফাটলের দিকে ফিরল সে, হাত তুলে সঙ্কেত দিল। জেনির দু'পাশ থেকে সশস্ত্র লোক দু'জন আরও কাছে সরে এল, একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল তাকে। ওদের পিছন থেকে এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ ভেসে এল, পরমুহূর্তে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল একটা ল্যাণ্ড-রোভার।

বিল ওয়াটসনের দিকে তাকাল পাইথন, এখনও প্লেনের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। 'অন্ধ মেয়েটা আর দু'জন গার্ডকে নিয়ে যাও তুমি, ওয়াটসন। আমাদের নতুন মেহমানরা আমার সাথে ল্যান্ড-রোভারে যাবে।'

সাবধানে সিগারেটটা নেভাল ওয়াটসন, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'শিওর।'

ঠাণ্ডায় হি হি করছে আশরাফ। তার উদোম পিঠে বরফের মত ছ্যাঁকা দিচ্ছে পাথরের দেয়াল। সমস্ত কাপড় খুলে নেয়া হয়েছে তার, পরে আছে শুধু আন্ডারওয়্যার। একই অবস্থা রানারও, আর সোহানা শুধু প্যান্টিজ ও ব্রেসিয়ার পরে আছে। ওর পাশেই, খালি মেঝেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, সবার হাত মাথার ওপর।

পাথুরে চেম্বারটায় আলোর কোন অভাব নেই, দুটো ইলেকট্রিক ল্যাম্প জ্বলছে। লম্বা একটা টেবিলের ওপর স্তূপ হয়ে রয়েছে ওদের কাপড়চোপড়। টেবিলের এক

প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন লোক। ওদেরকে চেনে আশরাফ, পেনিফিদার ও ক্রনেল। লম্বা ও ঢোলা শর্টস পরে থাকায় ভাঁড়ের মত লাগছে ক্রনেলকে, তবে তার নীল চোখ ও নিষ্ঠুর হাসির মধ্যে কৌতুকের ছিটেফোঁটাও নেই। পেনিফিদারের পরনে ট্রপিক্যাল স্যুট। রানার শার্টটা ব্যস্ত হাতে সার্চ করছে সে। বিজয়ীর হাসি বা উল্লাস, কিছুই নেই চেহারায়। মুখের ভাব নির্লিপ্ত, শুধু চোখ দুটোয় ঠাণ্ডা এবং অশুভ কি একটা চকচক করছে।

স্ক্রু-ড্রাইভারের সাহায্যে রানার কমব্যাট বুটের সোল ফাঁক করল ক্রনেল। রাবারের ভেতর একজোড়া ফাটল দেখা গেল। একটা থেকে বেরুল ছুরির একটা ফলা। অপরটা থেকে চ্যাপ্টা হাতল

ক্রনেলের মুখে সবজান্তার হাসি। স্ক্রু এঁটে হাতলের সঙ্গে ফলাটা জোড়া লাগাল সে, তারপর এক পাশের স্তূপের দিকে ছুঁড়ে দিল। কাপড় ও জুতো থেকে পাওয়া জিনিসগুলোই শুধু রাখা হয়েছে ওখানে। এবার সাবধানে জুতোর গোড়ালিটা পরীক্ষা করতে শুরু করল।

ফোল্ডিং চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে পাইথন, অলসভঙ্গিতে চুরুট ফুঁকছে। নির্লিপ্ত, প্রায় অন্যমনস্কভাবে ওদের কাজকর্ম দেখছে সে। ডান হাতটা হাঁটুর ওপর, মুঠো করে ধরে আছে ভারি একটা অটোমেটিক মাউজার পিস্তল। বিশ রাউন্ড ম্যাগাজিন সহ কুৎসিত একটা অস্ত্র।

চেম্বারে আরও একজন লোক রয়েছে। কড়া ভাঁজের, গাঢ় রঙের স্ল্যাকস পরে আছে সে, এক ধরনের জিম ভেস্ট-এর ওপর গায়ে কার্ডিগান চড়িয়েছে। শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, হাত দুটো পিছনে। খানিক পরপর পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু করছে শরীরটাকে, তারপর আবার ধীরে ধীরে গোড়ালি ঠেকাচ্ছে মেঝেতে। পালা করে সবার ওপর নজর রাখছে সে।

ল্যান্ড-রোভারে ওদের ওপর কড়া পাহারা ছিল গার্ডদের। এখানে আসতে বিশ মিনিট সময় লাগে। চওড়া পাহাড় চূড়া ধরে সাবধানে গাড়ি চালাতে হয়েছে ড্রাইভারকে, শতবর্ষের বালি-ঝড় পথটাকে অসম্ভব সরু করে রেখেছে। পাথুরে শহর মাসে পৌঁছুবার ওটাই একমাত্র রাস্তা। অন্ধকারে উপত্যকার কিছুই দেখতে পায়নি ওরা। ল্যান্ড-রোভার থেকে নামার পর তাড়াহুড়ো করে একটা প্যাসেজে ঢোকানো হয় ওদেরকে। পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে টানেলটা। তারপর এই চেম্বারে এনে বসানো হয়েছে।

নিজের মনের অবস্থা অদ্ভুতই লাগছে আশরাফের। চিরকেলে ভীতু সে, এই মুহূর্তেও ভয় পাচ্ছে, তবে ভয়টাকে একটা সীমার মধ্যে দমিয়ে রাখতে পারছে। সে জানে, গুরুতর এই বিপদের মধ্যে আপাতত অসহায় হলেও, রানা ও সোহানা নিজেদের অসহায়বোধকে মোটেও পাত্তা দিচ্ছে না। জানে, দু'জনেই ওরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে। চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে, কে কি বলছে শুনছে, লক্ষ করছে কার কি অভ্যাস, বিশ্লেষণ করছে বাস্তব পরিস্থিতি, চিন্তা করছে সম্ভাবনা নিয়ে। এ-সব কাজে এত ব্যস্ত ওরা, হতাশা বোধ করার সময় নেই। ওরা কি করছে বোঝার পর আশরাফ নিজেও তাই করার

চেষ্টা করছে এখন।

আলো যখন আছে, নিশ্চয়ই আলোর একটা উৎসও আছে। সম্ভবত জেনারেটর আছে কোথাও। কোথায় আছে জানতে পারলে ভবিষ্যতে কাজে আসতে পারে। তার অনুমান যদি ভুল না হয়, গার্ডগুলো আলজেরিয়ান, শহুরে লোক। তারা কেউ ইংরেজি জানে না, ভাঙা-ভাঙা ফ্রেঞ্চ বলতে পারে। ওদের ভাষা আসলে আরবী। আরবী বোঝে না সে, তবে রানা ও সোহানা বোঝে। এটা একটা তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ হোক বা না হোক। গার্ডদের ঘুষ দিতে চাইলে ওদের ভাষা বুঝতে হবে। পাইথনের দিকে মনোযোগ দিল আশরাফ, তার মনে হলো এই একটি ক্ষেত্রে ভাল কিছু অর্জন করার সুযোগ আছে তার, যা রানা বা সোহানার নেই। পাইথনের সঙ্গে ঠিক কি ধরনের আচরণ করা দরকার, বুঝে নিয়েছে সে। শুরুতে অভিনয়টা বোধহয় মন্দ হয়নি, সম্ভবত তার ওই অভিনয়ের কারণেই এখনও বেঁচে আছে সে।

পাইথনকে আনন্দ দিয়েছে সে। তাকে হাসিয়েছে। ওর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তার। আশপাশে একটা হাসির ভাণ্ডার থাকলে খুশি হবে পাইথন। যে লোক হাসাতে পারে তাকে কিছুটা সুযোগ-সুবিধে দেয়াটা স্বাভাবিক। অন্তত আশা করতে দোষ কি।

অভিনয়টা চালিয়ে যাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছে আশরাফ। তবে জানে যে অত্যন্ত সাবধানে করতে হবে কাজটা। বুঝতে পারছে এই মুহূর্তে কৌতুক করার চেষ্টা করলে মারাত্মক বোকামি হবে সেটা। কারণ পাইথনের চেহারায় একটা পরিবর্তন এসেছে। পেনিফিদার আর ক্রনেল সাবধানে কাজ করছে, উদ্ধার করা জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে পাইথন, ভাঁজবিহীন প্রকাণ্ড মুখ থমথম করছে তার।

স্তূপটার দিকে তাকাল আশরাফ। কয়েকটা জিনিস চিনতে পারল না, তবে বেশিরভাগই চেনে। দুটো কোল্ট, একটা ছোট এমএবি অটোমেটিক। লেদার হারনেসে ভরা রানার একজোড়া থ্রোইং-নাইফ। ওর জুতো থেকে পাওয়া গেছে আরও একটা ছুরি। সোহানার স্ল্যাকস-এর থাই পকেট থেকে পাওয়া গেছে একটা আট ইঞ্চি মেটাল টিউব, টেনে লম্বা করে ওটাকে ধনুকে রূপান্তর করা যায়। সরু ইস্পাতের রড পাওয়া গেছে আরেক পকেটে, স্ক্রু এঁটে জোড়া লাগালে ওগুলো হয়ে উঠবে তীর। সোহানার কাছ থেকে আরও পাওয়া গেছে এক ফাইল অ্যানেসথেটিক নোজ-প্লাগ, একটা স্লিং, ছ'টা গোল আকৃতির সীসার বল। রানার কাছ থেকে আরও পাওয়া গেছে একটা ঝর্ণা কলম, ভেতরে কালির বদলে অ্যাসিড। প্রতিটি জিনিসের নাম একটা নোট-বুকে লিখে নিচ্ছে ক্রনেল। লেখার দরকার কি? ভাবল আশরাফ। ব্যাপারটা মনে গেঁথে রাখল সে, সব কিছুর নোট রাখা ক্রনেলের একটা অভ্যাস।

আঙুল দিয়ে টিপে সোহানার শার্টের কাফ পরীক্ষা করল পেনিফিদার, তারপর একটা ছুরি তুলে নিয়ে সেলাই কাটল, খুলে ফেলল হাতার কাফ। ভেতর থেকে চৌকো ও অত্যন্ত পাতলা এক টুকরো সীসা বের করল সে, কাফের ভেতর লাইনিং-এর মত ছিল।

ক্রনেল জানতে চাইল, 'ওটা আবার কি?'

হাতের চাপ দিয়ে সীসার পাতটাকে গোল পাকিয়ে ফেলল পেনিফিদার, তালুতে ফেলে ওজন নিল। 'আস্তিনটা ছিঁড়ে ফেল, এই সীসার বল একটা অস্ত্র হয়ে গেল।' চোখে নগ্ন ঘৃণা, সোহানার দিকে তাকাল সে।

স্তূপটার দিকে তাকাল ক্রনেল। 'এর আগে ওরা আমাদেরকে ফাঁকি দিয়েছে, কারণটা পরিষ্কার—সাথে এক গাদা ইকুইপমেন্টও রাখে ওরা,' বলে আশরাফের শার্টটা ছুঁড়ে দিল সে। 'তবে, এবার পরিস্থিতি অন্যরকম।' স্তূপটার দিকে আবার তাকাল সে। 'আর বোধহয় কিছু নেই। না, আছে। আর মাত্র একটা।' টেবিল ঘুরে সোহানার সামনে এসে দাঁড়াল সে, ওর কাঁধে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'ঘোরো, সুন্দরী!'

প্রতিবাদ না করে ঘুরল সোহানা। হাত তুলে তার ঘাড়ে হাত দিল ক্রনেল, ইলাস্টিক ব্যান্ড দুটো খুলে নিল চুল থেকে। এক রাশ কালো চুল আলগা হয়ে ঝুলে পড়ল। আবার হাত তুলে চুলের ভেতর আঙুল ঢোকাল ক্রনেল, খুলির গায়ে কিলবিল করছে। তারপর পিছু হটল এক পা, দেখা গেল তার হাতে একটা তিন ইঞ্চি লম্বা সুঁই রয়েছে। হাসল ক্রনেল। 'সুযোগ পেলেই কারও চোখে ঢুকিয়ে দিত। আর হার্টে ঢোকালে তো কথাই নেই।' আগের জায়গায় ফিরে গেল সে।

ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইল পাইথন। 'ওরা কি এখন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র?'

মাথা ঝাঁকাল পেনিফিদার। 'হ্যাঁ।'

'এবার কোন ভুল হয়নি তো?' পাইথনের মুখে নরম, সবিনয় হাসি।

এক কি দু'সেকেন্ডের জন্যে পেনিফিদারের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। 'এ-ধরনের ঠাট্টা আর কারও সাথে কোরো, পাইথন। একবার তো বলেছি, ওদের কাছে আর কিছু নেই।'

শব্দহীন হাসির দমকে ঝাঁকি খেল পাইথনের শরীর। 'তুমি আহত বোধ করছ,' সকৌতুকে বলল সে। 'সত্যি আমি দুঃখিত।' হাসতে হাসতে চেয়ার ছাড়ল। 'আবার তুমি ঘুরে দাঁড়াতে পার, সোহানা।' তার নির্দেশ মত ঘুরল সোহানা। ওর দিকে নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকল পাইথন। সোহানার চোখে পলক নেই, সে-ও শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হাতের পিস্তলটা নাড়ল পাইথন। 'এবার তুমি,' বলল সে, ঘোষণার সুরে, 'কাপড় পরতে পারো। কারণ একটু পরই তোমাদের যত্ন নেব আমরা।'

তিন

পাথরের এই চৌকো ঘরটা ছোট, বারো ফুটের বেশি হবে না। ক্ষতবিক্ষত মেঝেটা খালি। একটাই সরু প্রবেশপথ, কাঠের ফ্রেম সহ ভারী একটা দরজা লাগান হয়েছে সম্প্রতি। রাবার দিয়ে মোড়া হয়েছে ফ্রেমের কিনারাগুলো, যাতে কোন বাতাস ঢুকতে না পারে। কবাটে কী-হোল বা হাতল নেই। মোটা একজোড়া লোহার বার

দিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করা হয় দরজাটা।

বার দুটো সকেটে ঢুকল, আওয়াজটা শুনতে পেল আশরাফ। সে ভাবল, তিনজন মানুষ আমরা, অক্সিজেন শেষ হতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, নিরেট কবাটে ঠেকে আছে একটা কান। দেয়ালের একটা কোণের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সোহানা, ওর দৃষ্টি ধীরে ধীরে প্রায় গম্বুজ আকৃতির সিলিঙের দিকে উঠে গেল। ওর চেহারায় কোন ভাব নেই। আশরাফ ওকে এত ভালভাবে চেনে যে ওর এই চেহারা দেখেই বলে দিতে পারে, সোহানা বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে সিলিঙের দিকে তাকাল সে-ও। ছোট একটা ভেন্টিলেটর দেখল, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে চার ইঞ্চি। স্রেফ একটা অমসৃণ গর্ত, দেখে মনে হয় প্রথম যখন উপত্যকার পাঁজর কেটে মাস শহরটা গড়ে তোলা হয় তখনকার তৈরি।

কবাট থেকে কান সরিয়ে দরজার গায়ে হাত দিয়ে চাপ দিল রানা, কতটা শক্ত পরীক্ষা করছে। 'আশরাফ, আমাদের মধ্যে শুধু তুমি খানিকটা কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছ,' নিচু গলায় বলল ও। 'পাইথনের সাথে তোমার খেলাটা ঠিক আছে। চালিয়ে যেতে হবে।'

'চেষ্টা করব,' বিড়বিড় করল আশরাফ, সরে এল রানার কাছে। 'তবে কতক্ষণ চালান সম্ভব বলা যাচ্ছে না। লোকটা বোকা নয়। যদি বুঝতে পারে যে আমি ভান করছি...।'

'খুব বেশিক্ষণ তোমাকে ভান করতে হবে না। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে চাইলে যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।'

'পাইথনকে তোমার কেমন লাগল, রানা?' জানতে চাইল সোহানা।

সবাই ওরা নিচু গলায় কথা বলছে। 'আগের মতই। কিছুই হারায়নি সে গম্ভীর হলো রানা।

'আর পেনিফিদারকে?'

'তার বোধহয় আগের সেই ধার আর নেই।'

'ওদের মধ্যে বস্ কে?'

'বলা যাচ্ছে না।' দরজার কাছ থেকে সরে এল রানা, সোহানার পাশে দাঁড়িয়ে গর্তটার দিকে তাকাল। 'কেউ কারও অধীনে কাজ করছে বলে মনে হয় না।' হঠাৎ রাগে লালচে হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'দুঃখিত, আমিই তোমাদেরকে এই ফাঁদে টেনে এনেছি।'

'তুমি?' অবাক হয়ে তাকাল আশরাফ। 'তুমি কিভাবে টেনে আনলে?'

'এখনও বোঝনি? ওয়া...,' হিসহিস করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল ওদের মাথার ওপরের গর্তটা থেকে, চুপ করে গেল রানা। দশ সেকেন্ড পর শব্দটা থেমে গেল। পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। ঘরটা মিহি বাষ্পে ভরে গেছে। কি এক অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠল আশরাফ। দেখল, মৃদু একটা ঝাঁকি খেল সোহানা, মুখ স্পর্শ করার জন্যে হাত দুটো তুলল। পরমুহূর্তে সে নিজেও অনুভব করল, তার মুখ ও কপালে কাঁটার মত কি যেন বিঁধছে, হুল ফোটার মত। মাত্র কয়েক

সেকেন্ডের মধ্যে শুরু হলো তীব্র ব্যথা। মুখে হাত রেখে সোহানার দিকে তাকাল রানা, কর্কশস্বরে বলল, 'বুঝতেই পারছ কি!'

'কী?' আতঙ্কে চিৎকার করল আশরাফ, পরমুহূর্তে মুখে অসংখ্য সুঁচের তীব্র খোঁচা খেয়ে লাফাতে শুরু করল, হাঁপাচ্ছে। দ্রুত তার পাশে চলে এল সোহানা, ব্যথায় সরু হয়ে আছে চোখ দুটো।

'অ্যান্টি-রায়ট নার্ভ গ্যাস,' হিসহিস করে বলল রানা।

'ধৈর্য ধরতে হবে, আশরাফ,' গলার স্বর নরম রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করল সোহানা। 'শক্ত করো নিজেকে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে যাচ্ছে...।' লক্ষ করল, আশরাফ ওর কথা শুনছে না। নত করা মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে গোঙাচ্ছে সে, কেউ যেন বিরতিহীন চাবুক মারছে তাকে।

সাধারণ নার্ভ গ্যাস স্থায়ী কোন ক্ষতি করে না, তবে এর যন্ত্রণা সহ্য করা কঠিন। কয়েক ফোঁটা গ্যাস স্প্রে করলে আধ ঘণ্টার বেশি কাজ করে। মুখের তেলতেলা ভাবের সঙ্গে লেপ্টে যাওয়ার একটা প্রবণতা আছে, ফুসফুসের অক্সিজেনও নষ্ট করে দেয়, ফলে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, দুর্বল হয়ে পড়ে পেশী। তবে সবচেয়ে মারাত্মক হলো ব্যথাটা, প্রচণ্ড দাঁত ব্যথার চেয়েও কয়েক গুণ তীব্র হয়ে ওঠে।

দু'চোখ বেয়ে হড়হড় করে পানি গড়াচ্ছে, ব্যথায় কমে যাচ্ছে দৃষ্টিশক্তি, আশরাফকে টেনে মেঝেতে বসাল রানা। ওর পাশেই রয়েছে সোহানা, সাহায্য করছে ওকে। ব্যথা সহ্য করার জন্যে দু'জনেই দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে। ওদের হাতের চাপে দেয়ালে হেলান দিল আশরাফ।

'তুমি...তুমি অজ্ঞান হতে পারবে, সোহানা?' হাঁপাচ্ছে রানা।

'হুঁউউ।' দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল আওয়াজটা। তারপর জানতে চাইল সোহানা, 'কিন্তু আশরাফের কি হবে?'

'ওকে আমি অজ্ঞান করব। ক্যারটিড।' শরীরটা ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে রানার, গলার আওয়াজ কাঁপা কাঁপা। 'এস, দু'জনের মাঝখানে বসাই ওকে। খাড়া করে।'

গোঙাচ্ছিল আশরাফ, এখন ফোঁপাচ্ছে। চিন্তাশক্তি যেন লোপ পেয়েছে তার, শুধু ব্যথা ছাড়া আর কিছু অনুভব করছে না। যেন অন্যকোন এক দুনিয়ায় তার আলাদা একটা অস্তিত্ব আছে, অনুভব করল রানার একটা হাত তার গলায় চেপে বসেছে। রানা কি তাকে গলা টিপে মেরে ফেলছে?...না...এখনও শ্বাস নিতে পারছে সে। তাহলে কি...কেন...?

বর্ণনার অতীত স্বস্তিবোধ করল আশরাফ, কারণ গাঢ় একটা অন্ধকারে দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছে সে, পিছনে রেখে যাচ্ছে ব্যথাটাকে। জ্ঞান হারাল সে।

আশরাফের ঘাড় থেকে হাত নামাল রানা। লম্বা করল পা দুটো, একটার ওপর তুলে দিল অপরটা। হাত দুটো থাকল হাঁটুর ওপর, তালু ওপর দিকে। তাকিয়ে আছে ও, তবে কিছুই দেখছে না। মুখের চেহারায় প্রাণের কোন লক্ষণ থাকল না।

সোহানাও এই একই ভঙ্গিতে বসেছে, আশরাফের আরেক পাশে।

প্রথমে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক ও নিয়মিত করতে হবে। কাজটা কঠিন, কারণ

জোর খাটানো চলবে না। এই মুহূর্তে ব্যথার সঙ্গে লড়ছে না রানা, ঢেউয়ের মত বয়ে যেতে দিল সেটাকে।

অটোসাজেশনে কাজ হলো। ষাট সেকেন্ড পর ব্যথাটাকে মনে হলো ওর অস্তিত্ব থেকে আলাদা একটা কিছু। আছে, অনুভব করা যায়, তবে ওর শরীরের কোন অংশ নয়। ধীরে ধীরে, জোর না খাটিয়ে, স্বেচ্ছায় ওটাকে আরও দূরে সরে যেতে দিল ও।

তারপর ব্যথাটা নগণ্য ও দূরের একটা জিনিস বলে মনে হলো। সেটাকে এভাবেই ধরে রাখল রানা, পুরোপুরি অদৃশ্য হতে দিল না। ওর মনের একাংশে অ্যালার্ম দেয়া আছে, পাঁচ মিনিট পর সেটা বাজলেই নড়ে উঠবে রানা, যদিও সচেতনভাবে নয়। পাঁচ মিনিট পর আশরাফের ঘুমন্ত ব্রেন-এ রক্ত সঞ্চালনের ফলে জ্ঞান ফিরে পাবে সে। আগেই সাজেশন দিয়ে রাখায় সম্মোহিত অবস্থা থেকে বেরিয়ে না এসেও আশরাফের ঘাড়ে হাত রাখবে রানা, আবার চাপ দেবে ক্যারটিডে, রক্ত প্রবাহ বন্ধ করার জন্যে।

সোহানার শ্বাস-প্রশ্বাসও এবার রানার সঙ্গে তাল মেলাল, প্রতি এক মিনিটে চারবার নিঃশ্বাস ফেলছে ওরা। ওদের চোখ খোলা, সামান্য ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। চেহারায় কোন উত্তেজনা নেই।

যেন দুটো নিষ্প্রাণ, স্নায়ুহীন ও শান্ত মূর্তি, অজ্ঞান আশরাফের দু'পাশে বসে আছে, চলে গেছে শান্তিময় অন্য এক জগতে।

কানের লতিতে কেউ চিমটি কাটছে। বিরক্ত হয়ে দুর্বোধ শব্দ করল আশরাফ। ঘুম থেকে তার জাগতে ইচ্ছে করছে না। কি যেন একটা জরুরী কথা মনে পড়তে চাইছে তার, কিন্তু ধরা দিতে দিতেও দিচ্ছে না। এরকম পাঁচ-সাতবার হলো। প্রতিবার মনে হল অন্ধকার রাজ্য থেকে ক্রমশ আলোর একটা জগতে উঠে আসছে সে, যেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে ব্যথাটা। কিন্তু তারপর ব্যথা নয়, এই চাপটা অনুভব করল। একটা নখ তার কানের লতিতে ডেবে গেল। রাগ হলো তার, মাথাটা সজোরে ঝাঁকাল,তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও খুলল চোখ দুটো। মেঝেতে পিঠ দিয়ে শুয়ে রয়েছে সে। হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে রানা, পাশে সোহানা। ওদের চোখ দুজোড়া অস্বাভাবিক লাগল তার, যেন বিস্ফারিত হয়ে আছে।

হঠাৎ সব কথা মনে পড়ে গেল আশরাফের, ধড়মড় করে উঠে বসল সে, একটা হাত ঝট করে উঠে গেল মুখে। এখন কোন ব্যথা নেই ওখানে। নার্ভ গ্যাস, রানা বলেছিল। অ্যান্টি-রায়ট গ্যাস। কথাটা মনে পড়তে শিউরে উঠল সে। রানা তাকে অজ্ঞান করে রেখেছিল। সেজন্যেই কষ্ট পাওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছে সে। 'কতক্ষণ হয়েছে?' ভারি গলায় জানতে চাইল সে, রানার দিকে তাকিয়ে আছে।

'আধ ঘণ্টার মত।'

'ওহ্ গড!' মাথার চুলে আঙুল চালাল আশরাফ। 'আমার মগজ অসাড় হয়ে

গিয়েছিল!'

'তা আমাদেরও গিয়েছিল,' বলল সোহানা, হাসল, তারপর একটা হাত ধরল আশরাফের। 'চিন্তা কোরো না। গ্যাসের প্রভাব যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম আমরা।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল আশরাফ, বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলোর একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। 'এসপিওনাজ জগতে আজও যে ওরা সারভাইভ করছে, কারণটা শুধু ওদের ফিজিক্যাল স্কিল নয়। ওদের আসল শক্তি নিহিত রয়েছে মনে মনের সাহায্যে নিজেদেরকে এতটাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ওরা, মনে হয় যেন জাদু জানে।'

আশরাফ বলল, 'এরই নাম পাইথনের যন্ত্র সর্বনাশ, ওরা কি জেনিকেও এই...?' কথা শেষ না করে দাঁড়াতে চেষ্টা করল সে, বাধা দিল রানা।

'নোড়ো না আশরাফ,' চাপা গলায় বলল ও। 'যে-কোন মুহূর্তে আমাদেরকে দেখতে আসবে ওরা। যেমন দেখবে বলে আশা করে আছে, এসে যেন ঠিক তেমনই দেখে। সরে বস তোমরা। এমন ভাব কর যেন ভয়ে ও ক্লান্তিতে কুঁকড়ে আছো।'

ত্রিশ সেকেন্ড পর আওয়াজ হলো দরজায়, লোহার বারগুলো সকেট থেকে বের করা হলো। একটা গড়ান দিয়ে ভাঁজ করা হাতের কনুইয়ে মুখ গুঁজল রানা। কাত হয়ে দেয়ালে হেলান দিল সোহানা, মাথাটাও দেয়ালে ঠেকে থাকল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে, চোখ দুটো আধবোজা।

ঘরে ঢুকল ক্রুনেল। তার পিছনে ক্ষতবিক্ষত একটা মুখ দেখা গেল, হাতে সাবমেশিনগান। লোকটা আলজিরিয়ান, তার বেল্ট থেকে ঝুলছে অ্যারোসল-এর একটা সিলিন্ডার।

'খুবই কাজের দাওয়াই, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ক্রুনেল, হাতের তালু দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঘষছে। 'মেড ইন আমেরিকা, অর্থাৎ আমাদের দেশের জিনিস। তবে আমাদের কেমিস্ট লন্ডনে বসে আরও উন্নত করেছে। কেমন আছ গো তোমরা? যন্ত্রের কোন ত্রুটি হয়নি তো?'

কেউ সাড়া দিল না। বন্দীদের দিকে পালা করে তাকাল ক্রুনেল, নিঃশব্দে হাসল।

আবার শুরু করল সে, 'এই দাওয়াই প্রথমদিকে রোজ তিনবার করে দেয়া হয়েছে বাকি সবাইকে। এখন আর প্রায় ব্যবহারই করতে হয় না। যে-কোন লোককে "জী-হুজুর" বলাতে এই দাওয়াইয়ের কোন জুড়ি নেই।' শব্দ করে হেসে উঠল ক্রুনেল। 'তবে দাওয়াইটার স্বাদ এই একবারই পেলে তোমরা। তোমাদের পাইথন একটা উন্মাদ। বাকি সবার মত তোমাদেরকে জড় পদার্থে পরিণত করতে রাজি নয় সে।' বোধহয় পাইথনকে ব্যঙ্গ করার জন্যেই তার ভরাট অট্টহাসি অনুকরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে। পেনিফিদারকে কি বলেছে পাইথন, তা-ও অনুকরণ করে শোনাল সে, 'তাহলে ওদের কাছ থেকে আরও বেশি মজা আদায় করা যাবে, পেনিফিদার। ওরা নিস্তেজ হয়ে গেলে আমি কোন আনন্দই পাব না।'

ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকাল রানা, চোখ দুটো ভারি হয়ে আছে। স্যাৎ করে এক পা পিছিয়ে গেল ক্রনেল, ইঙ্গিতে নির্দেশ দিল আলজিরিয়ান গার্ডকে। এক পা সামনে বাড়ল গার্ড, সাবমেশিনগানটা রানার দিকে তাক করল।

'পাইথনের জায়গায় আমি হলে, প্রথম সুযোগেই গুলি করে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতাম,' বলল ক্রনেল। 'এখনও পারি, শুধু একটা ছুতো দরকার। রানা, এবার তুমি দাঁড়াও। সাবধান, আমাকে কোন সুযোগ দিয়ো না।'

প্রথমে রানা, ওর দেখাদেখি বাকি দু'জনও, ধীরে ধীরে দাঁড়াল।

'তোমাদেরকে এখন কমন রুমে নিয়ে যাওয়া হবে, বাকি সবার কাছে,' বলল ক্রনেল। 'বাকি সবাই মানে লেবার হিসেবে যাদেরকে রিক্রুট করা হয়েছে। পানি পাবে মাথা পিছু পনেরো পাইন্ট। একটা সৎ পরামর্শ দিই, পনেরো পাইন্টের প্রায় সবটুকুই খেয়ে ফেল, যদিও সেক্ষেত্রে বাকি সবার মত নোংরা থাকতে হবে তোমাদের। এই গরমে সারাটা দিন মাটি খুঁড়লে শরীরের রক্তও ঘাম হয়ে ঝরে যাবে।'

ম্লান দৃষ্টি বিনিময় করল রানা ও সোহানা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ফ্রেঞ্চ ভাষায় নির্দেশ দিল ক্রনেল। দরজার ঠিক বাইরে আরও একজন গার্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে বন্দীরা ছোট একটা প্যাসেজ ধরে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। রানার কাছ থেকে সঙ্কেত পেয়ে আশরাফ দু'পাশের কাঁধ ঝুলিয়ে পা টেনে টেনে হাঁটছে।

রাতের বাতাস বরফের মত ঠাণ্ডা। উপত্যকার পুবদিকের পাঁচিল ধরে একশো গজের মত এগোল ওরা, পাশ কাটিয়ে এল পাথর কেটে তৈরি করা বিভিন্ন আকারের অনেকগুলো সুড়ঙ্গমুখ। পাথর ধসে পড়ায় সুড়ঙ্গের কয়েকটা মুখ বন্ধ হয়ে গেছে।

ওদের সামনে চৌকো একটা খিলান ও ভারি কাঠের দরজা। গ্যাস চেম্বারেও এরকম একটা নতুন দরজা দেখেছে ওরা, তবে এটা অনেক বড় ও ভারি। দরজার পাশে আরও দু'জন গার্ড বসে আছে, হাতে সাবমেশিনগান। ওদেরকে এগিয়ে আসতে দেখে দাঁড়াল তারা। দরজার ফ্রেমের পাশেই পাথরে গাঁথা রয়েছে এক জোড়া ব্র্যাকেট, সেগুলোর ভেতর থেকে দুটো ইস্পাতের বার বের করল একজন গার্ড।

ক্রনেল বলল, 'এক ঘণ্টা পর আলো নিভিয়ে দেয়া হবে। ভাল কথা, এখানকার আইন-কানুন সম্পর্কে জেনির কাছ থেকে জেনে নিয়ো। বাকি সবাই তেমন কিছু বলতে পারবে না।'

এ যেন একটা আর্মি ব্যারাক রুম, ওদের পিছনে দরজা বন্ধ হতে ভাবল রানা। লম্বায় প্রায় আশি ফুট, চওড়ায় ত্রিশ ফুটের মত, দু'দিকে সারি সারি ফেলা হয়েছে ক্যাম্প বেড। প্রাচীন মিস্ত্রিদের খাড়া করা পাথরের চারটে পিলার এখনও টিকে আছে, ধরে রেখেছে বিশাল ছাদটাকে। সিলিং থেকে ঝুলছে তিনটে ইলেকট্রিক ল্যাম্প।

বয়স্ক এক লোক, মুখটা ডেবে আছে ভেতর দিকে, মাথা নিচু করে বসে রয়েছে একটা বেডে। চেহারায় অন্যমনস্ক ভাব, তাকিয়ে আছে নিজের হাত দুটোর দিকে। লন্ডন ছাড়ার আগে রানা ও সোহানা প্রফেসর ডেভিড হোয়াইটস্টোনের ছবি দেখেছে। ভদ্রলোকের বয়স ছাপান্ন কি সাতান্ন। কিন্তু এই লোকটাকে দেখে মনে হলো বয়স আশির ওপর ছাড়িয়ে গেছে। ভাল করে তাকাতে প্রফেসর হোয়াইটস্টোনের সঙ্গে তার চেহারার মিলটা লক্ষ করল রানা। দরজা খোলার সময় মুখ তুলে তাকাননি তিনি। ক্যাম্প বেডে শুয়ে রয়েছে আরও দু'জন লোক, তারাও কেউ নড়াচড়া করেনি।

কাছাকাছি লোকটার দিকে তাকাল রানা। হয়তো তরুণই, তবে বয়স আন্দাজ করা কঠিন। দাড়িতে ঢাকা পড়ে আছে নাক থেকে মুখের নিচের অংশ, এলোমেলো মাথার চুল কপালটাকেও প্রায় ঢেকে রেখেছে। ভয়ের ভাব ছাড়া চোখ দুটো শূন্য। খুক করে কেশে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা। ওর দিকে তাকাল সে, কয়েক সেকেন্ড পর কাতর কণ্ঠে বলল, 'চিঠি একটা সত্যি লিখেছি, তবে ঈশ্বরের কিরে, তাতে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু লিখিনি।'

হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে বন্দীদের চিঠি লিখতে দেবে ওরা, দেখে যেন মনে হয় সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে। কিন্তু চিঠিতে যদি এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আভাসেও কিছু লেখা হয়, গ্যাস চেম্বারে নিয়ে গিয়ে দাওয়াই দেয়া হবে।

'ঠিক আছে, শান্ত হও,' বলল রানা। 'আমরা তোমাদের লোক।'

অসুস্থবোধ করছে আশরাফ। ব্যথাটা মাত্র দু'মিনিট সহ্য করেছে সে। এই লোকটা, এরা সবাই, পুরো আধ ঘণ্টা ধরে দৈনিক তিনবার ভোগ করেছে সেই অসহ্য নরকযন্ত্রণা। ওরা প্রথম যখন এখানে আসে, সবাই নিশ্চয়ই সুস্থ-সমর্থ ও সাহসী মানুষ ছিল, কিন্তু ওই মাত্রা ছাড়ানো নৃশংস ব্যথা সহ্য করা কোন রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। গ্যাসের মিহি স্প্রে পোড়ায় না বা কাটে না, আক্রমণ করে নার্ভে। একটা পর্যায়ে জ্ঞান হারাতে হয়। জ্ঞান ফেরার পর দেখা যায়, প্রাণশক্তি আগের চেয়ে অনেকটা কমে গেছে। এভাবে কমতে কমতে যে-টুকু অবশিষ্ট থাকে, মানুষটাকে দেখে মনে হবে জড় পদার্থে পরিণত হতে আর বেশি দেরি নেই।

এ স্রেফ বর্বরতা ঠাণ্ডা মাথায় অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে লোকগুলোর সঙ্গে। আশরাফ অনুভব করল, তার আঙুলগুলো এমনভাবে নড়ছে যেন এই মুহূর্তে পেনিফিদারের গলায় রয়েছে ওগুলো—পেনিফিদার, ক্রনেল বা পাইথনের। ওদেরকে খুন করার জন্যে তার ভেতর যেন একটা আগুন জ্বলে উঠল। সে জানে, ভাবাবেগের এই বন্যাটা সরে গেলেও ওদেরকে মৃত দেখতে চাওয়ার ইচ্ছেটা তার ভেতর থেকে যাবে, কারণ এ-ধরনের মানুষদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

পাশ থেকে তার কাঁধে হাত ছোঁয়াল সোহানা, শান্ত গলায় বলল, 'ওদিকে তাকাও—জেনি।' আশরাফের মন থেকে সমস্ত চিন্তা এক পলকে মুছে গেল। মনে হলো লম্বা গুহার সংলগ্ন আরেকটা অংশ থেকে বেরিয়ে এল জেনি, শেষ প্রান্তের ডান দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল আশরাফ, মুখে

কথা যোগাল না।

গলা চড়াল রানা, সাবধানে বলল, 'হ্যালো, জেনি।'

ওদের দিকে ছুটে এল জেনি, হাত দুটো লম্বা করে দিয়েছে সামনে। ঠোঁট সরু করে মৃদু শিস দিচ্ছে সে, একেবারে শেষ মুহূর্তে এড়িয়ে গেল প্রফেসর হোয়াইটস্টোনকে, বেড়ে বসে পা দুটোকে মেঝের ওপর লম্বা করে রেখেছেন তিনি ছুটে এসে সরাসরি রানার বাহুবন্ধনে ঢুকে পড়ল মেয়েটা।

জেনির চোখে পানি নেই, সারা শরীরে শুধু অদম্য একটা কাঁপুনি। হাঁপাচ্ছে সে, ভাঙা শব্দ বেরুল গলা থেকে। 'ওহ্, ওহ্ গড। রানা, তোমাকে ওরা মেরেছে? এ আমাকে কোথায় আটকে রেখেছে ওরা! কারও সাথে কথা বলতে পারি না, মানুষগুলোকে কিভাবে যেন বোবা করে রেখেছে—নড়াচড়া করে, কিন্তু যেন মরা!'

'লক্ষ্মী মেয়ে, শান্ত হও,' জেনির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছে রানা ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে জেনি, ওর বুকে কপাল ঘষছে।

'আজ রাতে ওরা যখন আমাকে বাইরে নিয়ে গেল, জানতাম না কি ঘটতে যাচ্ছে। ওখানে গিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো, তারপর প্লেনের আওয়াজ শুনতে পেলাম...'

'ঠিক আছে, পরে শুনব, জেনি।'

রানার বুক থেকে মুখ তুলল জেনি, তার নাকের ফুটো কেঁপে উঠল, বাতাসের গন্ধ নিচ্ছে। এখনও কাঁপছে সে। 'তোমার সাথে সোহানা রয়েছে। সোহানা আর আশরাফ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, প্লেন ল্যান্ড করার আগে পর্যন্ত আমার ভয় হচ্ছিল আশরাফ বোধহয় বেঁচে নেই। সবাই তোমরা ওকে ভীতুর ডিম বলো, ভারি অন্যায়। জানো, সোহানার কটেজে আমার জন্যে কি করেছে ও? আমাকে প্যাসেজে বের করে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়, মুখোমুখি হয় পাইথনের! চিন্তা করতে পারো? তোমরা সবাই ভাল আছ তো, রানা? প্লীজ, কিছু ঘটে থাকলে আমার কাছে লুকিয়ো না।'

'কবে আমরা তোমার কাছে কিছু লুকোতে পেরেছি?'

ফোঁপানোর মত আওয়াজ করে হেসে উঠল জেনি, দু'সেকেন্ডের জন্যে আরও জোরে জড়িয়ে ধরল রানাকে, তারপর যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে ছেড়ে দিয়ে হাতড়াবার ভঙ্গিতে একটা হাত লম্বা করল। 'আশরাফ?'

'তোমার সুদক্ষ দেহরক্ষী এদিকে,' বলে এগিয়ে এল আশরাফ, ধরা দিল জেনির বাহুবন্ধনে। 'সত্যি আমি দুঃখিত, ডার্লিং। পাইথনের সাথে আমার তুলনা হয় না।'

ক্ষমাপ্রার্থনার কোন প্রয়োজন নেই, বোঝাবার জন্যে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল জেনি, তারপর হঠাৎ করে তার চোখ দুটো ভরে উঠল পানিতে। চুপচাপ কাঁদছে সে।

'এই তো চাই, বোতলের ছিপি খুলে দাও,' বলে জেনিকে একপাশে টেনে নিয়ে এল আশরাফ, তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা ও অভয় দিচ্ছে। 'সবাই আমরা বেশ ভাল আছি, জেনি—সত্যি বলছি। বাকি সবার মত আমাদের ওপরও

নার্ভ গ্যাস ব্যবহার করেছিল ওরা, যেভাবেই হোক প্রভাবটা আমরা এড়িয়ে গেছি।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'এ-ব্যাপারে বিশদ জানতে হলে রানা বা সোহানার কাছে আবেদন জানাতে হবে তোমার।' আস্তিনসহ একটা বাহু জেনির মুখের কাছে উঁচু করল সে। 'নাও, চোখ মোছ। আমার রুমালটা পর্যন্ত নিয়ে গেছে ওরা।'

আবার খানিকটা হাসল জেনি, ফোঁত্ ফোঁত্ করে নাক টানল 'আমার কাছে আছে একটা।' রুমাল বের করে চোখ-মুখ মুছল সে, নাক ঝাড়ল, তারপর সোহানার দিকে মুখ ফিরিয়ে জানতে চাইল, 'আমাদের অবস্থাটা কি?' উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল আশরাফ, অনুভব করতে পেরে বাধা দিল জেনি, 'না, তুমি বানিয়ে বলবে। রানাও শুধু ভাল ভাল কথা শোনাবে। আমি সোহানার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। অবশেষে মুখ খুলল সোহানা, 'অবস্থা ভাল নয়, জেনি। তবে আরও খারাপ হতে পারত। এখনও আমরা কেউ আহত হইনি। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, এখুনি আমাদের কাউকে মেরে ফেলার কথা ভাবছে না পাইথন। কাজেই হাতে খানিকটা সময় পাব আমরা।'

'কি জন্যে সময় পাব?' দ্রুত জানতে চাইল আশরাফ। 'পালাবার, নাকি ওদেরকে শায়েস্তা করার?'

'হ্যাঁ, আমিও জানতে চাই, আসলে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি হবে?' বলল জেনি।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল সোহানা, তারপর বলল, 'দু'জনের একটা ছোট দল হলেও একজন দলনেতা না থাকলে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। তোমরা রানাকে প্রশ্ন করো, সেই আমাদের নেতা।'

জেনি ও আশরাফ রানার দিকে ফিরল।

'প্রথম কাজ বেঁচে থাকা। এটাকে তোমরা পালানোও বলতে পারো।'

'ওদের এই ঘাঁটির বাইরে কয়েক শো মাইল শুধুই মরুভূমি, পালাব কিভাবে?' চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করল আশরাফ।

'সব কথা এখুনি ব্যাখ্যা করে বলা যাচ্ছে না। তবে কথা দিচ্ছি, তোমাদেরকে আমরা বহাল-তবিয়তে বের করে নিয়ে যাব এখান থেকে।'

রানার দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা, উপলব্ধি করল ওর মুখের কথার সঙ্গে মনের চিন্তায় বিস্তর ফারাক। কথা দিচ্ছে রানা, তারমানে প্রাণপণ চেষ্টা করবে ও। যেমন সহজভাবে বলল, বেঁচে থাকার বা পালানোর কাজটা তত সহজ হবে না। উপায় একটা হবেই, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই সোহানার। উপায় একটা সব সময়ই থাকে। এর আগেও উষর মরুভূমি পাড়ি দিয়েছে ও, রানার সঙ্গেই। দু'জনেই ওরা জানে, কৌশলগুলো জানা থাকলে মরুভূমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। তবে আশরাফ আর জেনিকে নিয়ে সাহারা পাড়ি দেয়া ভয়ানক একটা অভিজ্ঞতা হবে। চিন্তা থেকে বিপজ্জনক শব্দটাকে বাদ দিয়ে রাখল সোহানা

কিন্তু রানা শুধু আশরাফ আর জেনির কথা ভাবছে না ; প্রফেসর হোয়াইটস্টোন সহ তাঁর পুরো টীমটার কথা ভাবছে ও। ওদেরকে রক্ষা করা একটা নৈতিক

দায়িত্ব। তার মানে পালানোর কাজটা আরও কঠিন। ওরা কেউ সুস্থ বা সক্ষম নয়, কাজেই ওদের কাছ থেকে কোন সাহায্যও পাওয়া যাবে না। চারদিকে একবার চোখ বুলাল রানা। এখানে কোথাও মিসেস হোয়াইটস্টোনও আছেন। বিছানায় যারা শুয়ে আছে কেউ তারা নড়েনি। আগের মতই বিছানার কিনারায় বসে আছেন প্রফেসর হোয়াইটস্টোন, পা ঝুলিয়ে। তাঁর ভুরু দুটো কুঁচকে আছে, আঙুল দিয়ে চিবুকটা ঘষছেন অনবরত, চোখ দেখে মনে হলো গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছেন। 'মিসেস স্টোন কোথায় বলতে পারো?' জেনিকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওদিকে,' হাত তুলে পিছন দিকটা দেখাল জেনি 'শেষ মাথায়, আমাদের জন্যে আলাদা একটা জায়গা আছে। মিসেস স্টোন এখনও খানিকটা সুস্থ আছেন। কর্নেল তাঁকে মেমসাহিব বলে ডাকে। তাঁর ওপরও অত্যাচার হয়েছে, তবে খুব শক্ত বলে এখনও মাঝে মধ্যে কথা বলতে পারেন।'

জেনির একটা হাত ধরল রানা। 'চলো, তাঁর সাথে দেখা করে আসি। সবচেয়ে আগে দরকার তথ্য।' সোহানার দিকে ফিরল ও। 'বেশি লোক দেখলে উনি হয়তো ঘাবড়ে যাবেন, তোমরা বরং একটা বিছানায় বসো। চেষ্টা করে দেখ, কাউকে কথা বলাতে পারো কিনা।'

সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল সোহানা, জেনিকে নিয়ে কমন রুমের শেষ প্রান্তের দিকে এগোল রানা।

ঘুরে দাঁড়াল আশরাফ, সোহানার পাশে চলে এল। 'যাক, অন্তত জেনিকে ওরা দাওয়াইটা দিচ্ছে না,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল সে।

'দিচ্ছে না, কারণ জেনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না।'

চোখের ওপর একটা হাত ঘষল আশরাফ। অভিযোগের সুরে বলল সে, 'জেনিকে তুমি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছ, ওকে দিয়ে ওরা কিছু করাবার চেষ্টা করেছে কিনা।'

'ভুলিনি,' বলল সোহানা। 'জেনি কি জানে না জানে যে-কোন সময় জেনে নিতে পারব আমরা। প্রথমে আমাদের পেতে হবে জেনি জানে না, এরকম একটন তথ্য। ক্যাম্প বেড়ে শুয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে তাকাল ও। 'এসো, ওদেরকে কথা বলাবার চেষ্টা করি।'

বিছানাগুলোর দিকে এগোচ্ছে ওরা, বাইরে থেকে দরজার বার সরানোর আওয়াজ হলো। তাকাতেই দেখল, দরজাটা খুলে যাচ্ছে। ছোট একটা প্যাকেট ও ভাঁজ করা একটা চাদর নিয়ে ভেতরে ঢুকল এক লোক। মাত্র এক সেকেন্ডের মত খোলা থাকল দরজাটা, চাঁদের আলোয় বাইরে একজন গার্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল আশরাফ, এক হাতে সাবমেশিনগান, দরজার দিকে তাক করা, অপর হাতে ছোট্ট একটা অ্যারোসল স্প্রে।

বন্ধ হয়ে গেল দরজা, বাইরে থেকে ব্রাকেটে ঢোকানো হলো বারগুলো। এতক্ষণে আগন্তুকের দিকে তাকাল আশরাফ। রাগে তার পিত্তি জ্বলে উঠল। এইমাত্র কমন রুমে ঢুকেছে বিল ওয়াটসন।

সোহানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল পাইলট। 'ভাল চাদর পেলে খুশি হও,

ম্যা'ম?' জানতে চাইল সে।

মাথা নাড়ল সোহানা, আশরাফ দেখল থমথম করছে ওর চেহারা। আরেকবার মাথা ঝাঁকিয়ে ওদেরকে পাশ কাটাল ওয়াটসন। একটা খালি বিছানার সামনে থামল সে, ভাঁজ খুলে চাদরটা বিছাল, প্যাকেটটা বিছানার মাথার কাছে রাখল, তারপর সেটায় মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। একটা সিগারেট ধরাল সে।

হেঁটে এসে বিছানাটার এক ধারে দাঁড়াল সোহানা, তার পাশে আশরাফ। হাতের সিগারেট উঁচু করে ওদেরকে দেখাল ওয়াটসন, মাথা নাড়ল দু'জনেই। তারপর সোহানা জানতে চাইল, 'রাতে তুমি এখানেই ঘুমাও নাকি, ওয়াটসন?'

'শিওর। হয় এখানে, নয়তো ক্রুনেলের সাথে। গরিলাটা চায় না আশপাশে কেউ ঘুর-ঘুর করুক। কমন রুমটাই বেছে নিয়েছি আমি। ক্রুনেল লোকটা নাক ডাকে।' সিগারেটে টান দিল সে।

'তাহলে সেসনার ওপর নজর রাখে কে?' ওয়াটসন জবাব না দেয়ায় সোহানা আবার জিজ্ঞেস করল, 'সেসনায় ফুয়েল ভরা হয়েছে?'

চেহারায় অসন্তোষ, ওয়াটসন বলল, 'প্লীজ, ম্যা'ম।' বলতে চায়, এমন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি নয় সে যাতে তার মনিবের স্বার্থহানি ঘটতে পারে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে তার কাছ থেকে সরে এল সোহানা, পিছু নিল আশরাফ। সামনে খালি তিনটে বিছানা দেখা গেল, তার একটায় বসল আশরাফ, ইঙ্গিতে পাশেরটা দেখিয়ে দিল সোহানাকে। 'তুমি ওই ব্যাটাকে কিছু বললে না কেন?' রাগে হিসহিস করে উঠল সে। 'তাহলে কিসের ট্রেনিং পেয়েছ তুমি! আমি তো ভেবেছিলাম এই সুযোগে তুমি ব্যাটার ঘাড় মটকাবে।'

চেহারা দেখে মনে হলো না সোহানা অবাক হয়েছে। 'মটকাতাম, যদি দেখতাম তাতে কোন লাভ হবে।'

'মানে! ওই ব্যাটাই তো ফাঁদে এনে ফেলেছে আমাদের!'

মাথা নাড়ল সোহানা। 'ফাঁদে আমরা নিজেরা এসে পড়েছি। ওয়াটসন শুধু আমাদেরকে সাবধান করেনি। সাবধান করার উপায় ছিল না তার, কারণ সে এক ধরনের সৎ লোক। সে তার মনিবের প্রতি বিশ্বস্ত, যে তাকে টাকা দেয়। বড়জোর বলতে পারো, সততার নিজস্ব একটা সংজ্ঞা আছে তার।'

হতভম্ব হয়ে সোহানার দিকে তাকিয়ে থাকল আশরাফ। এক মিনিট পর কাঁধ ঝাঁকাল সে, বিছানা ছেড়ে হেঁটে এল প্রফেসর হোয়াইটস্টোনের কাছে। 'আমি আশরাফ,' নরম সুরে বলল সে। 'আমরা সবাই আসলে খুব বিপদের মধ্যে আছি। ভাবছিলাম, আপনি হয়তো বলতে পারবেন ঠিক কি ঘটছে এখানে।'

তার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন প্রফেসর হোয়াইটস্টোন, তারপর অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বললেন, 'আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, আমি ক্লান্ত? কত কাজ পড়ে আছে জানেন? আজ খাওয়ার সময় পাইনি, কাল তো দম ফেলারও সময় পাব না।' কাত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি, একটা চাদর টেনে নিয়ে মুখ লুকালেন।

ওদিকে ছোট কামরাটায় একটা বিছানার ওপর বসে রয়েছে রানা ও জেনি।

ওদের সামনে রোগা, অভিজাত চেহারার এক ভদ্রমহিলা। তাঁর হাড়গুলো চওড়া, রোদে পোড়া চামড়া হাড়ের ওপর টান টান হয়ে আছে। কাঁচাপাকা চুল মাথার পিছনে খোঁপা করা।

মিসেস হোয়াইটস্টোন আত্মমর্যাদা বজায় রেখে কথা বলার চেষ্টা করছেন, যদিও কাঁপুনিটা থামাতে পারছেন না। 'আমি আমার স্বামীর জন্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এখন তো সে প্রায় কথাই বলতে পারে না। ওর জন্যে এটা একটা...,' তাঁর গলা কেঁপে গেল। '...এটা একটা সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা আর বেচারা ছেলেগুলোরই বা কি অবস্থা করেছে ওরা! কত আগ্রহ নিয়ে এল ওরা, কি উৎসাহ এক-একজনের! সব ভূত হয়ে গেছে। শুরুতেই আমি ডেভিডকে বলেছিলাম, ড. জিমসনের কথায় রাজি হওয়া উচিত হচ্ছে না। মাস প্যাপিরাসের পাতা ক'টা অনুবাদ না করাটা অত্যন্ত বোকামি হয়েছে।'

জেনির দিকে তাকাল রানা, বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল সে, অর্থাৎ এ-প্রসঙ্গে তার কিছু জানা নেই। 'প্যাপিরাসে এমন কিছু ছিল,' জানতে চাইল রানা। 'যা প্রকাশ করা হয়নি?' ওর চেহারায় আগ্রহ।

'হ্যাঁ, তবে আর বলছি কি! আমার স্বামীকে বোঝানো হয়েছিল, গারামান্টেস গুপ্তধনের একটা অংশ শুধু জনহিতকর কাজে ব্যবহার করা হবে, কোন সরকারকে নিতে দেয়া হবে না, বা কোন মিউজিয়ামকেও দান করা হবে না। সেজন্যেই ব্যাপারটা গোপন রাখতে রাজি হয় ডেভিড।'

'গারামান্টেস গুপ্তধন?'

'হ্যাঁ। গারামান্টেস থেকে শুধু জুয়েল এসেছিল, অবশ্যই সোনা, রূপো বা অন্য সমস্ত কিছু কয়েক বছর ধরে ডোমিটিয়ান মাস সংগ্রহ করেছিল। আমার স্বামীকে নিয়ে সত্যি আমি খুব চিন্তায় আছি। কথা বলা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে সে...,' ধীরে ধীরে মিসেস হোয়াইটস্টোনের গলা নিস্তেজ হয়ে এল, তারপর একবারে থেমে গেল। নীল চোখে শূন্য দৃষ্টি, তাকিয়ে আছেন অথচ কিছু যেন দেখতে পাচ্ছেন না।

'উনি আর কথা বলবেন না,' শান্ত গলায় বলল জেনি। 'মাঝে মধ্যে কথা বলেন, তারপর হঠাৎ এরকম চুপ করে যান।'

বিছানা ছেড়ে দাঁড়াল ওরা। বড় কামরাটায় ফিরে এল।

পাশাপাশি দুটো বিছানায় শুয়ে রয়েছে সোহানা আর আশরাফ, চুপচাপ। রানা আর জেনিকে দেখে উঠতে যাচ্ছে ওরা, রানা বলল, 'না, থাকো ওখানে।' সোহানার বিছানায় এসে বসল ও, দেখল এক ধারে সরে গিয়ে জেনিকে নিজের পাশে বসতে দিল আশরাফ। 'কাউকে তাহলে কথা বলাতে পারোনি,' বলল ও।

মাথা নাড়ল সোহানা। 'ওদের অবস্থা শোচনীয়, রানা।' চোখ তুলে এক সারি বিছানার দিকে তাকাল ও। 'এখানে আমাদের সাথে ওয়াটসনও রয়েছে।'

'কথা হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'কাজটার জন্যে একুশ হাজার ডলার পাচ্ছে ও। আমি ত্রিশ হাজার অফার করেছি।' কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা।

'হুঁ। ট্রান্সপোর্ট সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছ?'

'দুটো ল্যান্ড-রোভার আর একটা ট্রাক। শয়তানগুলো যেখানে থাকে তার পিছনে কোন টানেলে রাখা হয় ওগুলো। চাবি থাকে পাইথনের কাছে। সেসনাটাকেও অচল করে রাখা হয়। ওয়াটসনের ওপর নির্দেশ আছে, প্লাগ খুলে আনতে হবে। রাতে ওগুলো পাইথনের কাছে থাকে।' সোহানার শেষ কথাটা কেমন যেন শুকনো লাগল আশরাফের কানে, সূক্ষ্ম কোন সঙ্কেত যদি থেকেও থাকে, আশরাফ অর্থ করতে পারল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল রানা। সোহানাও কথা বলছে না। তবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। আশরাফের মনে হলো, দু'জনই নিজেদের ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় এই মুহূর্তে। নিজেদের মধ্যে অন্য এক স্তরে যোগাযোগ করছে রানা ও সোহানা, যে স্তরে মৌখিক ভাষার কোন প্রয়োজন হয় না। এভাবে যোগাযোগ করতে আগেও ওদেরকে দেখেছে আশরাফ, সেজন্যেই বুঝতে পারল, ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। পরিস্থিতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে ওরা, বিবেচনা করছে কি ধরনের তথ্য দরকার হবে ওদের, কিভাবে সেগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব। দুটো মনের মাঝখানে প্রায় টেলিপ্যাথিক একটা যোগাযোগ, আড়িপাতা যন্ত্রের সাহায্যে শুনে ফেলার কোন উপায় নেই।

আশরাফ আন্দাজ করল, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় প্রখর হওয়ায় পরিস্থিতিটা টের পেয়ে গেছে জেনি। হাত দুটো কোলের ওপর রেখে সে-ও চুপচাপ বসে আছে, কেউ কোন কথা না বললেও মাথাটা একদিকে সামান্য কাত করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছে সে।

রানা বলল, 'গোটা ব্যাপারটা গুপ্তধন নিয়ে, সোহানা। পরিমাণে বিপুল, তবে উনি শুধু গারামান্টেস মণিমুক্তোর কথা বললেন।'

নরম সুরে সোহানা বলল, 'ওহ্ গড!'

তাড়াতাড়ি স্মৃতি হাতড়াতে শুরু করল আশরাফ। কেমব্রিজে কিছুদিন ইতিহাসও পড়েছে সে। গারামান্টেস?...হ্যাঁ, চোদ্দ শো শতকের দিকে গারামা নামটা ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যায়। এখন জায়গাটার নাম জারমা, এখান থেকে প্রায় চারশো মাইল পুবে, ফেজ্জান-এ। সেই প্রাচীন কালে, রোম যখন উত্তর আফ্রিকা শাসন করত, কর্নেলিয়াস বালবুস দক্ষিণ দিকে অভিযানে বেরিয়ে গারামান্টেস দখল করে নেন। গারামান্টেস ছিল আরও সামনের ঐশ্বর্যবহুল ব্ল্যাক আফ্রিকায় পৌঁছুনোর জন্যে সাহারার ওপর একমাত্র করিডর।

সোনা, রূপো, আইভরি, ক্রীতদাস...মণিমুক্তো? হ্যাঁ, অবশ্যই। 'গারামান্টেস-এর চুনি' নামে ছোট্ট একটা পরিচ্ছেদও পড়া আছে তার। সামান্য হলেও বিস্মিত হলো আশরাফ, প্রাচীন যুগের রত্ন ইত্যাদি সম্পর্কেও রানা ও সোহানা খবর রাখে নাকি! ওদের আলোচনা শুনে সেরকমই মনে হলো। অথচ বিষয়টা প্রায় পৌরাণিকই বলা চলে, ইতিহাসে বিশ্বাসযোগ্য কোন রেকর্ড নেই। তারপর তার মনে পড়ল, সোহানার পেন্টহাউসে একটা লাইব্রেরি আছে।

হঠাৎ রানার একটা কথা শুনে কান খাড়া হয়ে উঠল আশরাফের।

'আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আছে।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, কঠিন হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'অত্যন্ত গুরুতর। পরে ওটার একটা বিহিত করতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

তারপর নিস্তব্ধতা নেমে এল। অবেশেষে খুক করে কেশে, ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করতে হলো আশরাফকে, 'জেনি বোধহয় আশা করছে ব্যাপারটা কি নিয়ে তাকে বলা হবে। আর আমি বুঝি, আমার জানার অধিকার আছে।'

আশরাফের দিকে তাকাল রানা, মৃদু হাসল, তারপর বলল, 'দুঃখিত, আশরাফ। আমরা স্যার ভিক্টর ক্যানিং সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম।'

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করল আশরাফ। 'স্যার ভিক্টর ক্যানিং? কই, নামটা তো আমি উচ্চারিত হতে শুনলাম না।'

'তার কথা ভাবছিলাম আমরা। টীমের লোকদের নিজে বাছাই করেছেন তিনি। বিল ওয়াটসনের কথা তিনি নিজেই আমাদেরকে বলেছেন।'

এক মুহূর্ত পর আশরাফ বলল,'তো কি হলো?'

রানাকে বিস্মিত দেখাল। 'যার হাতে ছড়ি থাকে শুধু তার পক্ষে কাজ করে ওয়াটসন। আর কারও নয়।'

'সবার মাথার ওপর তো ছড়ি ঘোরাচ্ছে পেনিফিদার আর পাইথন।'

'না। ওদের মাথার ওপরও ছড়ি ঘোরাচ্ছে অন্য এক লোক—স্যার ক্যানিং। ওয়াটসনকে তিনি বাছাই করেছেন। তার সাথে আমার কি কথা হয় আমি তা সোহানাকে বলেছি, তুমি সোহানার কাছে শুনেছ।' চুপ করল রানা, যেন যতটুকু বলার প্রয়োজন ছিল সব বলা হয়ে গেছে।

আশরাফের দিকে তাকাল সোহানা, বুঝিয়ে দেয়ার নরম সুরে বলল, 'ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। তারমানে হচ্ছে কেউ ওদেরকে জানিয়েছে আমরা আসছি। যে লোক ওদেরকে কথাটা জানিয়েছে সে-ই ওয়াটসনকে বলেছে কোথায় আমাদেরকে নামিয়ে দিতে হবে। কাজটা মাত্র একজনের পক্ষে করা সম্ভব। ভিক্টর ক্যানিং।'

'স্যার ভিক্টর ক্যানিং?' ব্যাপারটা হজম করতে পারছে না আশরাফ। 'কিন্তু...কিন্তু তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি! বিশাল একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাম্রাজ্যের অধিপতি! জনহিতকর কাজে তাঁর মত সুনাম কারও নেই!'

'দান করার সামর্থ্য তার আছে,' ম্লান গলায় বলল রানা। 'এমন লোকের কথা শোননি, বই চুরি করে বেচে, টাকাটা ভিখারিকে দিয়ে দেয়? পার্থক্যটা আসলে ডিগ্রীর।'

হেসে ওঠার উন্মত্ত একটা ঝোঁক চাপল আশরাফের। সেটাকে দমিয়ে রেখে বলল, 'পার্থক্যটা ডিগ্রীর! আচ্ছা! কি জান, মাঝে মধ্যে ঠিক বুঝতে পারি না তোমাদের কৌতুকবোধ অসম্ভব গভীর, নাকি আমারই মাথা খারাপ।'

'ক্যানিং আমাদেরকে বলেছেন, রেডিও কমিউনিকেশনের জন্যে এই জায়গাটা একটা ডেড স্পট। পাইথনের কামরায়, যেখানে ওরা আমাদেরকে সার্চ করল,

একটা রেডিও আছে। তুমি দেখনি?'

চোখ বন্ধ করে সাবধানে বলল আশরাফ, 'হ্যাঁ, দেখেছি, তবে তাৎপর্যটা বুঝতে পারিনি। প্রকাশ্যেই রাখা হয়েছে, যেমনটি রাখা উচিত, সেজন্যেই মনটা খুঁত খুঁত করেনি।'

'ওটা সম্ভবত ক্যানিঙের সাথে ডাইরেক্ট লিঙ্ক,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'ওই রেডিও থেকেই ওরা জানতে পেরেছে, আমরা আসছি।'

ধীরে ধীরে উপসংহারটা মেনে নিল আশরাফ। ড. জিমসন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, নিজের সন্দেহের কথা খুলে বলেছিলেন ভিক্টর ক্যানিংকে, ফলে পাইথনের হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছে তাঁকে। তারপর রানা উদয় হলো ক্যানিঙের সামনে, মন ভরা সন্দেহ নিয়ে, মাসে এসে তদন্ত করতে চায়। মনে মনে ভারি খুশি হলেন ভিক্টর ক্যানিং। এবার আর পাইথনকে পাঠাবার দরকার নেই, শিকারগুলোই তার কাছে যেতে চাইছে। 'বাট ফর গডস্ সেক্, নিজেকে তিনি কোনভাবেই রক্ষা করতে পারবেন না! মারভিন লংফেলো জানেন আমরা এখানে আছি। সবাই জানেন প্রফেসর হোয়াইটস্টোন ও তাঁর টীম এখানে কাজ করছে। ক্যানিং যদি আমাদের সবাইকে খুনও করে ফেলেন, তাঁকে ধরা পড়তে হবে!'

'তাঁর ইচ্ছেও তাই,' বলল রানা, একটু যেন অন্যমনস্ক। 'পাইথনের ওপর তাঁর নির্দেশ আছে, জেনি গুপ্তধন খুঁজে পাবার সাথে সাথে সবাইকে মেরে ফেলতে হবে। কিন্তু কেন বলছ, ধরা তাঁকে পড়তেই হবে? আমরা স্রেফ গায়েব হয়ে যাব। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল অথবা আগাথা ক্রিস্টির একটা মিস্টরি। কিংবা, পাথর ধসে আমরা চাপা পড়ে গেছি, এমন হতে পারে না? ক্যানিং ঠিকই বুদ্ধি খাটিয়ে বেঁচে যাবেন। কে তাঁকে সন্দেহ করবে?'

কথা বলল না কেউ। খানিক পর নিস্তব্ধতা ভাঙল জেনি। 'দেখা যাচ্ছে গুপ্তধনটা আমার খুঁজে পাওয়া চলবে না।'

তার হাতে হাত রাখল আশরাফ। 'ওদেরকে তুমি বোকা বানাতে পারবে, জেনি?'

'মনে হয় পারব।' কমন রুমের নিস্তেজ আলোয় জেনির চেহারা ম্লান দেখাল। 'প্রতিদিন আমাকে দিয়ে পরীক্ষা করানোর জন্যে খানিকটা করে জায়গা চিহ্নিত করে রেখেছে ওরা। প্রথম দিকে একটা করে বিরাট এলাকা পরীক্ষা করতে হয়েছে আমাকে। মূল্যবান মেটাল খুঁজেছি, তাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। ক'দিন পর কিছুই আর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ওরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারে যে আমি ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করছি না, এলাকা কমিয়ে অর্ধেকে নামিয়ে আনে। এখন আমি আধ ঘন্টায় যতটুকু সম্ভব পরীক্ষা করি, দিনে তিনবার।'

রানা জানতে চাইল, 'এভাবে গোটা মাস কাভার করতে কতদিন লাগবে?'

'এলাকাটা কত বড় দেখতে পাচ্ছি না আমি। তবে ক্রনেল বলছিল আরও দশদিন লাগবে।'

রানা ও সোহানা পরস্পরের দিকে তাকাল। আবার যেন নিঃশব্দে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করল ওরা। খানিক পর রানা শুধু বলল, 'পাইথন।'

উত্তরে সোহানা শুধু মাথা ঝাঁকাল।

বিছানার ওপর ঝট করে উঠে বসল আশরাফ। 'পাইথন কি?' চাপা গলায় প্রায় গর্জে উঠল সে। 'তোমাদের নীরব আলোচনায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা না হয় নেই আমাদের, কিন্তু আমরা জানতে চাই ঠিক কি ধরনের বিপদের মধ্যে পড়তে যাচ্ছি। বলো, পাইথন কি?'

'পাইথনকে বাছাই করেছেন ক্যানিং,' বলল সোহানা, এখনও তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'গুপ্তধন মাটির তলা থেকে উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত সম্ভবত সে-ই এখানে সবার বস্ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। পেনিফিদারকে আনা হয়েছে অন্য উদ্দেশ্যে, তার দায়িত্ব গুপ্তধন এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করা।'

'না, রানা ঠিক এ-কথা বলতে চায়নি,' প্রতিবাদ করল আশরাফ।

'যা বলতে চেয়েছ, এ তারই একটা অংশবিশেষ। আমরা বুঝতে পারছিলাম না পেনিফিদার ও পাইথন কে কার অধীনে কাজ করছে। এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এর একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এই পর্যায়ের কাজের দায়িত্ব রয়েছে পাইথনের ওপর।'

'তো?'

'সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। যে-কোন কাজই তাকে দেয়া হোক, সেটা নিখুঁতভাবে করে সে, এবং তারপরও হাসি-তামাশার জন্যে প্রচুর সময় বের করে নেয়। জেনি এইমাত্র বলেছে, দশদিন। তারমানে এই নয় যে এখান থেকে পালাবার একটা উপায় বের করার জন্যে দশটা দিন সময় আছে আমাদের হাতে।'

রানার দিক থেকে আশরাফের দিকে তাকাল সোহানা 'তার আগেই নিজেকে আনন্দদানের কাজ শুরু করবে পাইথন। ভেবে দেখ না, তা না হলে অন্য কি কারণে আমাদেরকে সে বাঁচিয়ে রেখেছে?'

চার

মাথা ভাঙা পিলারটার গায়ে একটা তক্তা খাড়া করেছে কোর্সিনেজ। প্রাচীন কালে পাথুরে স্তম্ভশ্রেণীর একটা অংশ ছিল পিলারটা। তক্তার গায়ে, বিভিন্ন উচ্চতায়, সাদা চক দিয়ে বৃত্ত এঁকেছে সে। হাতে তীক্ষ্ণমুখ অসি, তক্তার ওপর খুদে টার্গেটগুলোয় আকস্মিক খোঁচা মারা প্র্যাকটিস করছে। কাজটা সে এক ঘণ্টার ওপর হলো ক্লান্তিহীন ভাবে করে যাচ্ছে।

পনেরো গজ দূরে একটা বোল্ডারের ওপর বসে রয়েছে একজন গার্ড, হাতে হালকন সাবমেশিনগান। অস্ত্রটা আর্জেন্টিনায় তৈরি, স্টক ভাঁজ করা যায়, ম্যাগাজিনে ত্রিশ রাউন্ড ·৪৫-ক্যালিবার কার্টিজ। একদল লেবারের ওপর নজর রাখছে লোকটা, দলটায় সোহানাও রয়েছে। আর আছেন প্রফেসর হোয়াইটস্টোন ও আর্কিওলজিকাল টীমের তিনজন তরুণ। প্রাচীন নগরীর নেক্রোপোলিস অর্থাৎ

গোরস্থানে কাজ করছে ওরা।

সিকি মাইল দূরে আরেকটা দলের সঙ্গে কাজ করছে রানা ও মিসেস হোয়াইটস্টোন, দলে আর্কিওলজিকাল টীমের বাকি সদস্যরাও আছে। বিধ্বস্ত ছোট একটা মন্দিরের চারপাশটা খুঁড়ছে ওরা। কাছেই রয়েছে গোল একটা ধুলোময় ধ্বংসস্তূপ, এককালে সার্কাস বা অ্যারেনা ছিল। ভারি পাথর তোলার জন্যে কপিকল ব্যবহার করছে ওরা।

দুটো দলের মাঝখানে চিহ্নিত জমিনের ওপর দিয়ে ধীর পায়ে হাঁটছে জেনি। তার দুই হাতে একটা করে কপার টিউব ও স্টীল ওয়্যার দিয়ে বানানো লোকেটর। তার সঙ্গে, কনুইয়ের কাছে, সারাক্ষণ উপস্থিত রয়েছে পেনিফিদার। রোদ বলে মাথায় আজ একটা স্ট্র হ্যাট পরেছে পেনিফিদার, শার্টের আস্তিন কব্জি পর্যন্ত নামানো।

পাইথন মার্কাস বা আশরাফ চৌধুরীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

গোরস্থানের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল ক্রনেল, লেবার পার্টির কাজ দেখছে। ঢোলা শর্টস পরেছে সে, মাথায় হেলমেট, গায়ে শার্ট নেই, কোঁকড়ানো জ্যাকেটটা খোলা। কয়েক মুহূর্ত দেখার পর সে তার কালো নোট-বুকটা বের করল, যত্ন করে কিসে যেন টিক চিহ্ন দিল এক পাতায়, আরেক পাতায় সাবধানে কি যেন লিখল। গোছাল লোক ক্রনেল, কাজকর্মে শৃঙ্খলা ভালবাসে, এই নোট-বুক তার কাছে বাইবেলের মত।

খাড়া করা তক্তার কাছ থেকে সরে এল কোর্সিনেজ, হাতে তলোয়ার। নিঃশব্দে হেসে ক্রনেল বলল, 'স্টেজ থ্রী, সেকশন ফোর, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে কাজ।'

'পাইথনকে আমি বুঝি না,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল কোর্সিনেজ। 'আন্দাজের ওপর নির্ভর করে খোঁড়াখুঁড়ি নেহাতই বোকামি হচ্ছে। অন্ধ মেয়েটা লোকেশন খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত আমাদের।'

'অথচ তুমি একজন সামরিক অফিসার!' হতাশ ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্রনেল। 'বন্দীদের ব্যস্ত রাখার গুরুত্ব বোঝ না?'

'এই বন্দীদের?' কোর্সিনেজের গলায় তীব্র ব্যঙ্গ। 'তোমার বুঝি ধারণা মাসুদ রানা ওদের ঘুম ভাঙাবে, তারপর বিদ্রোহ করার জন্যে প্ররোচিত করবে?'

হেসে উঠল ক্রনেল। 'তা হয়তো নয়।' সোহানার দিকে তাকাল সে, মাত্র কয়েক ফুট দূরে। কঠিন মাটি থেকে শাবল দিয়ে খুঁচিয়ে একটা পাথর আলগা করছে ও। 'তুমি যদি একা হতে বা রানা একা হত, রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারতাম আমি, সুন্দরী। তোমরা দু'জন হওয়ায় আমার আরাম হারাম হয়ে গেছে।'

সোহানা কথা বলল না। কয়েক সেকেন্ড ওর দিকে তাকিয়ে থাকল কোর্সিনেজ, খুঁটিয়ে দেখল, তারপর মাটি ও পাথরের স্তূপ ডিঙিয়ে এগিয়ে এল। সোহানার হাতে শাবল রয়েছে, তবে সেজন্যে ভয় পাচ্ছে না। শুধু আত্মহত্যা করতে চাইলে ওটা ব্যবহার করবে ও। নিজে তো মরবেই, সঙ্গে আরও দু'একজনকে নিয়ে যাবে। বন্দীদের সব সময় দু'ভাগে আলাদা করে রাখা হয়,

একদলের ভাল আচরণের ওপর নির্ভর করে অপর দলের নিরাপত্তা। তাছাড়া, নিজের ওপর আস্থা আছে কোর্সিনেজের, তার হাতে তলোয়ার থাকলে দুনিয়ার কাউকে ভয় পায় না সে।

সোহানা তার দিকে তাকাচ্ছে না, নিজের কাজ করে যাচ্ছে।

'শুনতে পেলাম তুমি নাকি ফেনসিং জানো? খুব নাকি ভাল খেলতে পারো?' জিজ্ঞেস করল কোর্সিনেজ।

মুখ তুলে তাকাল না সোহানা, হাতও থামল না। 'এক-আধটু পারি।'

'তাহলে আমার সাথে খেলবে তুমি,' বলার সুর আদেশের, কোর্সিনেজের মুখে হাসি নেই। 'আমার কাছে আরেকটা তলোয়ার আছে।'

সিধে হলো সোহানা। 'কার নির্দেশ মানতে হবে আমাকে? তোমার, নাকি পাইথনের?'

রাগে লালচে হয়ে উঠল কোর্সিনেজের চেহারা।

ক্রনেল বলল, 'পাইথন বা পেনিফিদারের নির্দেশ মানবে তুমি, সুন্দরী। তবে কোর্সিনেজের প্রস্তাবটা ওদের পছন্দও হতে পারে। তোমাদের সংখ্যা একটা করে কমাবার দরকার আছে। ভেব না কোর্সিনেজের সাথে দাঁড়াতে পারবে তুমি; দুনিয়ার সেরা ফেনসারদের একজন ও।' সোহানার শরীরে লোলুপ দৃষ্টি বুলাল সে।

'আমরা লড়ব,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কোর্সিনেজ। 'লড়ব ফয়েল-এর রুলস অনুসারে। লাইটওয়েট মেইল দিয়ে তৈরি একটা জ্যাকেট আছে আমার কাছে, টার্গেট এরিয়া ঢাকার জন্যে ওটা তুমি পরতে পারো।'

কোর্সিনেজের দিকে তাকাল সোহানা, ভুরু দুটো সামান্য উঁচু করল। 'আর তুমি?'

ঠোঁট ফাঁক না করে হাসল কোর্সিনেজ। 'আমার কিছু লাগবে না, হাতের এই তলোয়ারই যথেষ্ট।'

ক্রনেলের দিকে তাকাল সোহানা। 'আমাকে কি লড়তেই হবে?'

'হবে, শুধু যদি দৈত্য বা পেনিফিদার আপত্তি না করে।' কোর্সিনেজের জেদ লক্ষ করে কৌতুক বোধ করছে ক্রনেল।

কাজ শুরু করার জন্যে ঘুরল সোহানা, তারপর দেখল প্রফেসর হোয়াইটস্টোন মাটিতে গাঁথা একটা পাথর থেকে আঙুলের কোমল স্পর্শে বালি সরাচ্ছেন। পাথরটার গায়ে নিওলিথিক আমলের একটা দৃশ্য খোদাই করা রয়েছে, কয়েকজন শিকারী হত্যা করছে একটা জিরাফকে। খাঁজগুলো কালের আঁচড়ে ভোঁতা হয়ে গেছে। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে খোদাই করা হয়েছে ওগুলো, সাহারা যখন উর্বর বনভূমি ছিল। পাথরটার গায়ে হাত বুলাচ্ছেন প্রফেসর, আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছে। হাঁটু গেড়ে বসে আছেন তিনি, তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল সোহানা, নরম সুরে বলল, 'ওটা আপনি আরেকদিন পরীক্ষা করবেন, প্রফেসর। এখন আমাদের সবাইকে মাটি খুঁড়তে হবে।'

মুখ তুলে তাকালেন তিনি, চেহারায় বিমূঢ় ভাব। তারপর লক্ষ করলেন, কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্রনেল ও কোর্সিনেজ। কোটরের ভেতরে ঢুকে যাওয়া চোখ

দুটোয় আতঙ্ক ফুটে উঠল, মাথা ঝাঁকিয়ে তাড়াতাড়ি শাবলটা তুলে নিলেন পাশ থেকে। 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। খুঁড়তে হবে।' তাঁর গলা অত্যন্ত চড়া ও কাঁপা কাঁপা। তরুণ তিনজনের দিকে তাকালেন তিনি। 'খুঁড়ুন, জেন্টলমেন!'

তাদের একজন অলসভঙ্গিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, চোখে সামান্যতম কৌতূহলও নেই। বাকি দু'জন তাঁর কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।

খিক খিক করে হাসল ক্রুনেল, ঘুরে দাঁড়িয়ে অপর দলটার দিকে এগোল। কোর্সিনেজ, তার ঠোঁট পরস্পরের সঙ্গে শক্তভাবে সেঁটে আছে, নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে আবার প্র্যাকটিস শুরু করল।

শাবল রেখে কোদাল দিয়ে আলগা মাটি ও পাথর তুলল সোহানা একটা হুইলব্যারো-তে। আজ নিয়ে তিনদিন হলো এখানে বন্দী ওরা, হতাশার কালো ছায়া ডানা মেলার চেষ্টা করছে দেখে শুরুতেই সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে ও। গত ষাট ঘণ্টায় অনেক কিছু জানতে পেরেছে ওরা, কিন্তু কোন তথ্যই ওদেরকে পালানোর রাস্তা দেখাতে পারেনি।

রানা ও সোহানা সাবধানে গার্ডদের পরীক্ষা করে দেখেছে। না, ওদেরকে ঘুষ দেয়া সম্ভব নয়। একে একে আটজন আলজিরিয়ানকেই দেয়া হয়েছে প্রস্তাবটা। কারও আগ্রহ নেই। অনির্ধারিত একটা সময়ে টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রাখতে রাজি নয় তারা। সবচেয়ে বড় কথা, পাইথনকে তারা যমের মত ভয় পায়। প্রস্তাবটার কথা আজ সকালে তারা তাকে বলেও দিয়েছে। শুনে ভারি কৌতুক বোধ করেছে পাইথন। হাসতে হাসতে নির্দেশ দিয়েছে, গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে আরেকবার ওদের তিনজনের যত্ন নিতে হবে। তিনজন মানে রানা, সোহানা আর আশরাফ।

বিষয়টা নিয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করল সোহানা। তারমানে আবার একবার অজ্ঞান করতে হবে আশরাফকে। এ-ব্যাপারে রানাকে সাবধান করার দরকার নেই, তবু একবার করবে ও। ক্যারটিড-এ বেশিক্ষণ চাপ দিলে আশরাফের ব্রেনে অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে।

হুইলব্যারোটা ভরে গেছে। উঁচু-নিচু জমিনের ওপর দিয়ে টেনে আবর্জনার স্তূপের কাছে নিয়ে আসছে ওটাকে, মন্দিরের পাশেই। আবর্জনার ওই স্তূপটার ভেতরও আর্কিওলজিকাল গুপ্তধনের টুকিটাকি অনেক কিছু লুকিয়ে আছে, যেমন—হাড়ের বড়শি, পাথর ঘষে তৈরি করা তীরের মাথা, হাঁড়ি-বাসনের টুকরো, কুঠারের ভাঙা মাথা। আরও আছে, পরবর্তী সময়ের, রোমান ঢাল-এর ওপরের অংশ, ছুরির ফলা, রোমান তরোয়ালের তীক্ষ্ণ ডগা ইত্যাদি।

উপত্যকার মাঝামাঝি জায়গায় ধীর পায়ে হাঁটছে জেনি, লোকেটর দুটো দু'হাতে ধরে আছে। মেয়েটির জন্যে করুণা বোধ করল সোহানা। জেনিই ওদের জন্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে। গুপ্তধন খোঁজার এই কাজটা তার নার্ভের ওপর সাংঘাতিক চাপ সৃষ্টি করছে। তবে রাতের বেলা, ওরা সবাই যখন এক হয়, তাকে দেখে মনে হয় না নার্ভাস ব্রেক ডাউনের শিকার হতে যাচ্ছে সে। কখনও রানার বিছানায় বসে সে, কখনও আশরাফের, তবে বেশিরভাগ সময়

চুপচাপ থাকে।

সোহানা ভাবল, জেনি বোকা নয়। সে জানে, প্রয়োজন ফুরালে ওদেরকে মেরে ফেলা হবে। খুশির কথা হলো, নিজের ভেতর একটা পাঁচিল তুলে দিয়ে মৃত্যুচিন্তাটাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে সে, পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। রানার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস, তবে দুর্বল সে আশরাফের ওপর। আশরাফের কৌতুক দারুণ উপভোগ করে মেয়েটা। আশরাফের কথা ভেবে আপনমনে হাসল সোহানা। জেনিকে হাসাবার জন্যে কত কি-ই না করে সে–মাঝে মধ্যেই কৃত্রিম বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়ছে, একদল শিয়ালের মাঝখানে হঠাৎ যেন এসে পড়েছে একটা বোকা ভেড়া। আবার কখনও কাপুরুষ হবার ভানও করে। এ-সবই হাসির খোরাক যোগায় জেনিকে, গুরুতর বিপদের কথা ভুলে থাকতে সাহায্য করে। লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, আশরাফকে ভালবাসতে শুরু করেছে জেনি।

খালি হুইলব্যারোটা ফিরিয়ে আনল সোহানা, তুলে নিল শাবলটা। রানার কথা ভাবল সে, পরমুহূর্তে ভয়ের হিমশীতল একটা ছোঁয়া অনুভব করল হৃৎপিণ্ডে। এই মুহূর্তে একা শুধু রানাই সবচেয়ে বেশি বিপদে রয়েছে। আপাতত আর কারও ওপর নয়, একা শুধু রানার ওপর নজর রয়েছে পাইথনের। সময় নিয়ে, প্রতিটি প্রলম্বিত মুহূর্ত উপভোগ করছে, রানার সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধের একটা ক্ষেত্র তৈরি করছে পাইথন। একমাত্র রানাকেই সে তার ব্যক্তিগত শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করছে। ওকে খুন করে বিপুল আনন্দ পাবে সে।

আমি সোহানা, রানাকে আমি রক্ষা করব। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল ও। কিন্তু কিভাবে?

পাইথনের মধ্যে হাস্যরসের কোন অভাব নেই। সুযোগ পেলেই রানাকে ব্যঙ্গ করছে সে, খোঁচা মেরে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে, মনে করিয়ে দিচ্ছে তিক্ত অতীতের কথা; তার হাসির মধ্যে থাকছে তীব্র অপমান ও চ্যালেঞ্জ।

গতকাল মাটিতে গাঁথা একটা বড় পাথর তোলার চেষ্টা করছিল রানা। একজনের পক্ষে পাথরটা তোলা সম্ভব নয়, কমপক্ষে তিনজন লাগার কথা। ভারি পাথর তোলার সরঞ্জামগুলো অন্য জায়গায় কাজে লাগানো হয়েছে দেখে রানা একাই চেষ্টা করে দেখছিল তুলতে পারে কিনা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল পাইথন, তারপর ট্রেঞ্চে নেমে এসে অবলীলায় এক হাত দিয়ে টেনে তুলে ফেলল পাথরটা, রানার মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। সবাই তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল, এমন কি রানার চোখেও নগ্ন বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখেছে ওখানে যারা উপস্থিত ছিল। তারপর রানার দিকে ফিরল পাইথন, সহাস্যে বলল, 'বীরত্ব দেখাবার চেষ্টা কোরো না, বুঝলে। তুমি আহত হলে আমাদের কাজ পিছিয়ে যাবে, সেটা আমি বরদাস্ত করব না। মনে থাকে যেন।'

ঘটনার সময় ওখানে সোহানা ছিল না, পরে আশরাফের মুখ থেকে শুনেছে। বলার সময় উদ্বেগে থমথম করছিল আশরাফের চেহারা। পাইথনের হাতে রানা অতীতে একবার মার খেয়েছে, এ-কথা তার জানা নেই, তবু তার মনে হয়েছে

অশুভ কি যেন একটা ঘটতে যাচ্ছে।

এত কিছুর পরও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছে রানা। সেজন্যে ওর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল সোহানা। পাইথনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নীরবে হজম করছে রানা, অপমান ও চ্যালেঞ্জ গায়ে মাখছে না, ওকে যা করতে বলা হচ্ছে তাই করে যাচ্ছে। এ থেকেই বোঝা যায়, পাইথন সম্পর্কে ওর কি ধারণা। এই মুহূর্তে পাগলটাকে ঘাঁটাবার কোন ইচ্ছে-ওর নেই। জানে, কৌশল ছাড়া তার সঙ্গে কোনভাবেই পারবে না ও; এখন যদি লড়তে বাধ্য হয়, স্রেফ খুন হয়ে যাবে।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে রানা, তার মানে হলো হাল ছাড়েনি। জেনি আর আশরাফের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে ও, প্রফেসর আর তার টীমের সদস্যদের সঙ্গে নরম আচরণ করে। পরিস্থিতি সম্পর্কে সোহানার সঙ্গে পরামর্শও চালিয়ে যাচ্ছে। তবু বোঝা যায়, খুবই চিন্তায় আছে রানা।

সোহানার মত রানাও জানে, দশ বছর আগের অসমাপ্ত কাজটা এখন সমাপ্ত করার কথা ভাবছে পাইথন। যেভাবে শুরু করেছিল, ঠিক সেভাবেই শেষ করতে চায় সে, লাথি মেরে ধীরে ধীরে হত্যা করবে রানাকে। পরিস্থিতির বাস্তবতা মেনে নিয়েছে রানা, এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালাতে না পারলে ঘটনাটা ঘটবেই। কাজেই বিপদের কথা ভুলে কিভাবে পালানো যায় তাই নিয়ে পরামর্শ করছে সোহানার সঙ্গে, সুযোগ পেলেই।

কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন উপায় দেখতে পায়নি ওরা। অথচ আজ তিনদিন পেরিয়ে যাচ্ছে।

মাটিতে শাবলের একটা ঘা মারল সোহানা। তলপেটের মোচড় অসুস্থ করে তুলছে ওকে। ভাবল, পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারত। শো-ডাউন স্থগিত রাখতে বিরাট সাহায্য করছে আশরাফ। পাইথনকে নিয়মিত হাসির খোরাক যোগাচ্ছে সে, কাজটা করছেও দক্ষতার সঙ্গে। নিজেকে রাজ-দরবারের একটা ভাঁড় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে সে, ভীত-সন্ত্রস্ত ও মোটা বুদ্ধির এক লোক, তবে আচরণে খানিকটা আভিজাত্য ও সংস্কৃতির ছাপ বজায় রাখছে—পাইথনকে নাড়াচাড়া করার জন্যে আদর্শ একটা হাতল।

সোহানা ভাবল, এই অভিনয় কতক্ষণ চালিয়ে যেতে পারবে আশরাফ।

দূরে তাকাল ও, দেখল পেনিস্ফিদারের সামনে থেমে আলাপ করল ক্রনেল, তারপর নোট-বুকে কি যেন লিখল। মাথা ভাঙা পিলারের কাছে এখনও অক্লান্তভাবে প্র্যাকটিস করে চলেছে কোর্সিনেজ।

একটা চিন্তা এল সোহানার মাথায়। রানাকে বাঁচাবার একটা উপায় যেন আছে কোথাও, ঠিক ধরা দিচ্ছে না। পরিস্থিতিটা নিয়ে ভাবতে শুরু করল ও। ক্রনেল আর তার নোট-বুক; প্রফেসর হোয়াইটস্টোন আর তাঁর নিস্তেজ আর্কিওলজিকাল টীম; কোর্সিনেজ আর তার তলোয়ার; বিল ওয়াটসন আর তার সেসনা; গ্যাস চেম্বারে কাপড় খুলে সার্চ করার সময় ক্রনেল ওর গায়ে হাত দিয়েছে; পাইথন আর রানা।

আইডিয়াটা অবয়ব পেতে শুরু করল সোহানার মনে। পাইথনকে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে একটা ডাইভারশন দরকার, তার দৃষ্টি যাতে রানার ওপর থেকে সরে যায়।

সোহানা উপলব্ধি করল স্থির দাঁড়িয়ে আছে সে, কোন কিছু দেখছে না; তাড়াতাড়ি আবার কাজ শুরু করল ও। উত্তেজনা ও উদ্বেগের শেষ চাপটুকুও স্নায়ু ও পেশী থেকে দূর হয়ে গেল, সিদ্ধান্তে পৌছুনোর পর শীতল শান্ত ভাব ফিরে এসেছে মনে। অন্ধের মত হাতরানোর সময় পেরিয়ে এসেছে ও, চমৎকার একটা চাল দেয়ার সুযোগ দেখতে পাচ্ছে।

ছকটা সাবলীলভাবে আঁকা হয়ে যাচ্ছে ওর মনে। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল বারবার। সাজানোয় কোন ভুল নেই, তবে একটা ঘুঁটি পাওয়া যাচ্ছে না। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘুঁটি। অবশ্য খেলা শুরু হলে সেটা নিজে থেকেই বেরিয়ে আসবে। পানির বোতলটা নিতম্বে ঝুলছে, সেটা মুখের কাছে তুলে দু'ঢোক খেল ও। প্রতিদিন কাজের বিরতির সময় দশ পাইন্ট করে পানি পায় বন্দীরা, বাকি পাঁচ পাইন্ট দেয়া হয় সন্ধের দিকে, ক্যানে ভরে।

বোতলে ছিপি লাগিয়ে ছকটা আরেকবার পরীক্ষা করল সোহানা। ব্যাপারটা রানার পছন্দ হবে না। সেজন্যেই ওকে কিছু বলবে না সোহানা। আমি সোহানা, ভাবল ও, বুঝতে পারছি রানার সামনে মহা একটা বিপদ ওত পেতে রয়েছে, কাজেই আমার প্রথম কাজ ওকে রক্ষা করা। ব্যাপারটা পছন্দ করবে না আশরাফও, সে সাংঘাতিক ভয় পাবে, রেগেও যাবে। ওরা যাতে ওকে বাধা দিতে না পারে সে-ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে প্রথমেই একটা চাল দেবে সোহানা, ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করলে ওদের কারও আর কিছু করার থাকবে না।

প্লাস্টিকের বড় প্লেটটায় উঁচু স্তূপ হয়ে আছে খাবার। সবই ক্যান-এর খাবার, রাখা হয় দু'হাজার বছর আগে বানানো শীতল পাথুরে ট্যাংকের ভেতর। প্লেটটা সাবধানে পাইথনের সামনে নামিয়ে রাখল আশরাফ। নামিয়ে রাখার সময় ছুরিটা ওর হাতের কয়েক ইঞ্চির মধ্যে চলে এল। ইচ্ছে করলেই ওটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে পাইথনের গলায় বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে পারে সে। কিন্তু চেষ্টাটা ব্যর্থ হবে। পাইথনের অন্যমনস্ক ভাবটা দারুণ সন্দেহজনক। সে বোধহয় ধরেই নিয়েছে, আশরাফ এরকম একটা সুযোগ বোধহয় হাতছাড়া করবে না। চেষ্টা করলে তার পরিণতি কি হবে আন্দাজ করতে পারল আশরাফ। হাতির পায়ের মত মোটা ওই দুই হাত দিয়ে তার কনুই ও কব্জি মট মট করে ভেঙে ফেলবে পাইথন।

পিছু হটল আশরাফ, ঠোঁটে ব্যগ্র হাসি ফুটিয়ে জানতে চাইল, 'সব ঠিক আছে তো?'

'কখনও যদি কিছু ঠিক না থাকে,' বলল পাইথন, তুলে নিল ছুরি আর ফর্ক, 'ধরে নিতে পারো কোন না কোনভাবে তোমাকে আমি ঠিকই জানাব।' ইঙ্গিতে একটা ফোল্ডিং ক্যানভাস চেয়ার দেখাল সে। 'বসো।'

প্রচুর খায় পাইথন, প্রায় পাঁচজনের খাবার একা, কিন্তু গোগ্রাসে গেলে না,

খায় ধীরে ধীরে। খাওয়ার সময় আশরাফ সামনে থাকলে মজা পায় সে। আশরাফ তাকে হাসির খোরাক যোগায়।

'তুমি হয়তো লক্ষ করে থাকবে,' খোশ-আলাপের সুরে বলল পাইথন। 'আমি যখন দাঁড়াই, আমার হাত দুটো প্রায় হাঁটু ছাড়িয়ে যেতে চায়। ব্যাপারটা তোমাকে কিসের কথা মনে করিয়ে দেয়, বলো দেখি, আশরাফ?'

ব্যাকুল দেখাল আশরাফকে, খানিকটা সন্ত্রস্তও। এরকম দেখানোটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চেহারায় এ-সব ফুটিয়ে তোলা তার জন্যে তেমন কঠিন নয়। পাইথনকে সঙ্গে নিয়ে রশির ওপর দিয়ে হাঁটছে সে, ভারসাম্য বজায় রাখা খুবই ভীতিকর একটা ব্যাপার। 'মনে করিয়ে দেয়,' এমন সুরে বলল সে, যেন স্মৃতি হাতড়াচ্ছে। 'মনে করিয়ে দেয়...একজন অ্যাক্রোব্যাট-এর কথা।'

'সত্যি?' উৎফুল্ল দেখাল পাইথনকে। 'কেন?'

'কেন তা ঠিক বলতে পারব না,' গলায় সামান্য বেপরোয়া ভাব আনল আশরাফ। 'আমার ধারণা রশি ধরে ঝোলাঝুলি করলে মানুষের হাত লম্বা হয়।'

'ব্যাপারটা তোমাকে মানুষ আকৃতির কোন পশুর কথা মনে করিয়ে দেয় না, এই যেমন ধর গরিলা?' পাইথনের কুৎসিত মুখে গাল ভরা হাসি।

'জেসাস, নো!' তাড়াতাড়ি বলল আশরাফ। দম ফেলার জন্যেও থামল না সে, তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে এমন ভাব দেখাল যেন তার চিন্তাজগতে বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে, 'বলছিলাম কি, টুয়ারেগদের সম্পর্কে জানেন আপনি? ওরা যে-কোন বয়সের মেয়েদের সঙ্গে জোট বাঁধে, কেউ কোন প্রশ্ন তোলে না। দ্য ফাউকল্ড নামে এক লোক ছিল, নিজেদের তামাহ্‌ক ভাষায় একটা অভিধান লেখে সে। জানেন, তাতে কৌমার্য বলে কোন শব্দই রাখা হয়নি? নৈতিকতার ধারণা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।'

'এ-ধরনের প্রবণতায় সম্পূর্ণ সায় আছে আমার,' বলল পাইথন, খাবার চিবানোয় কোন বিরতি নেই। 'তুমি ঠিক জানো, আমাকে দেখে গরিলার কথা মনে পড়ে না তোমার?'

তিন দিন না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়িতে আঙুল ঘষল আশরাফ। 'না।' এক সেকেন্ড ইতস্তত করল সে। 'তবে ক্রনেলকে দেখে মনে পড়ে। ছোট, ব্যস্ত একটা গরিলা।'

হাসির ধমকে ঝাঁকি খেল পাইথন, ভেজা ভেজা বাম চোখটা মুছল। 'তুমি হলে গিয়ে আপাদমস্তক সতর্ক মানুষ, আশরাফ। বিপদ সম্পর্কে ভারি সাবধান।'

আশরাফ মুছল তার ভুরু। স্বস্তির হাসি দেখা গেল মুখে, তবে কথা বলল না। মাছিগুলো তার মুখের চারপাশে ভনভন করছে। গরম আর তেষ্টার চেয়েও খারাপ এগুলো, এমনকি মাঝে মধ্যে উন্মাদ করা ভয়ের চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক। ওগুলোকে তাড়াবার জন্যে সারাক্ষণ হাত ঝাপটাচ্ছে সে। পাইথন অবশ্য তাড়ায় না। তার প্রকাণ্ড মুখে অবাধে ঘুরে বেড়ায় মাছিগুলো, ওগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে সে যেন এতটুকু সচেতন নয়

'অল্প বয়সে আমি যখন কলেজে পড়ছি,' স্মৃতি রোমন্থনের সুরে বলল পাইথন।

'সবাই আমাকে কিং কং বলত। ব্যাপারটা আমি একেবারেই পছন্দ করতাম না।'

চেহারায় এমন কৌশলে আহত ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলল আশরাফ, দেখে যাতে মনে হয় এটা তার ভান।

'পছন্দ করতাম না বললে আসলে কিছুই বলা হয় না,' মুখে উৎফুল্ল হাসি, খেতে খেতে বলে চলেছে পাইথন। 'রাগে আমার সারা শরীরে আগুন জ্বলে উঠত। আমি যে দেখতে কুৎসিত, এ-কথা বলতে দ্বিধা করত না কেউ। বললে তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, আশরাফ, কুৎসিত বলে নিজের ওপর ঘৃণায় আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করত আমার।' হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠল সে। 'তারপর কি হলো, জানো? জানো, কি আবিষ্কার করলাম আমি?'

'কি আবিষ্কার করলেন?' কৌতূহল প্রকাশ করেই গম্ভীর হয়ে উঠল আশরাফ।

'আবিষ্কার করলাম বরং বুদ্ধিমানই বলা যায় আমাকে, আশপাশে যাদেরকে দেখতে পাই তাদের সবার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী আমি, এবং আমার ভেতর অসহায়বোধ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। ব্যথার নরম স্নায়ুগুলোকে ঘিরে রেখেছে মোটা চামড়ার আবরণ, ফলে কোন কিছুতেই আমি ব্যথা পাই না। এর বোধহয় একটা মেডিকেল টার্মও আছে।'

সামান্য হতভম্ব দেখাল আশরাফকে। 'হঠাৎ করে আপনি আবিষ্কার করতে পারেন না। আপনি আসলে প্রথম থেকেই জানতেন। ব্যথা অনুভব না করার প্রসঙ্গে বলছি।'

'হ্যাঁ, জানতাম। তবে আমার কুৎসিত চেহারা ব্যাপারটার তাৎপর্য অনুধাবন করতে দেয়নি আমাকে। কাজেই আমার কাছে ব্যাপারটা আবিষ্কারের মতই ছিল।' চেয়ারটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে প্রতিবাদ জানাল, শব্দ না করে হাসছে পাইথন। 'আমার ছ'জন সহপাঠি সিদ্ধান্ত নিল, কিং কংকে খোঁচাবে। গোটা ব্যাপারটা বীভৎস একটা চেহারা পেয়ে যায়। দেখলাম, কিছুই আমাকে করতে হলো না, শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা বাদে। তাতেই গুরুতরভাবে আহত হলো ওরা। অথচ আমার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। এমন নয় যে ওরা ওদের সাধ্যমত লড়েনি। শেষ পর্যায়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, সন্দেহ নেই।'

'তারপরই ব্যাপারটার তাৎপর্য ধরা পড়ে গেল আপনার কাছে?'

'হ্যাঁ, তারপরই। আমার কদর্যতা শুধু চেহারার মধ্যেই নিহিত নয়। তার শিকড় আরও অনেক গভীরে। ব্যথা অনুভব না করা ছাড়াও, এমন সব আঘাত এত বিপুল পরিমাণে সহ্য করতে পারি আমি যে তার সিকি ভাগ আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা অন্য কোন মানুষের নেই—তার আগেই হয় জ্ঞান হারাবে তারা, নয়ত মারা যাবে।' ঠোঁট মুড়ে হাসল পাইথন। 'রানা ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারে, বছর কয়েক আগে।'

মাথা ঝাঁকাল আশরাফ। তার একটা সন্দেহ সম্পর্কে নিশ্চিত হলো সে। সত্যিই তাহলে অতীতে একবার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল রানা ও পাইথন।

'আমি আরও বুঝতে পারি,' বলে চলেছে পাইথন। 'আমার মনটাও আর সবার চেয়ে আলাদা। মেয়েমানুষ, মদ, ড্রাগ, এসবের কোনটারই কোন অ্যাডিকটিভ

এফেক্ট আমার ওপর নেই। বাঁধা না পড়ার সামান্যতম ভয় ছাড়াই এ-সব আমি ব্যবহার করতে পারি।' আশরাফের দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসল সে। 'কাজেই আমি বদলে গেলাম। বলা যায়, প্রায় আমূল।'

এক মুহূর্ত পর মিনমিন করে, যদিও অনুমোদনের সুরে, বলল আশরাফ, 'নিজকে চিনতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ বৈকি। তারপর থেকে নিজের ওপর আপনার আর কোন ঘৃণা থাকল না, কেমন?'

'ঘৃণা তো থাকলই না, বরং শ্রদ্ধা এসে গেল।' হাসল পাইথন। খাবারের শেষটুকু মুখে পুরল সে। চিবিয়ে ঢোক গেলার পর খুশি মনে বলল, 'শুধু মৃত্যুর প্রতি আকর্ষণটা একটা পর্যায় পর্যন্ত থেকেই গেল আমার ভেতর। আগে নিজের মৃত্যুর কথা ভাবতাম, অর্থাৎ আত্মহত্যার প্রবণতা ছিল; এখনও মৃত্যুর কথাই ভাবি, তবে নিজের নয়, এই যা পার্থক্য। সত্যি কথা বলতে কি, মৃত্যু আমাকে টানে। মানুষকে মরতে দেখলে আমার ভাল লাগে। মানুষের মৃত্যু ঘটাতে ভালবাসি আমি। এবার বলো, আমার কাহিনীটা দারুণ ইন্টারেস্টিং নয়?'

'ইয়ে...মানে...,' খিক খিক করে হাসল আশরাফ। 'ব্যাপারটা সামান্য হলেও উদ্বেগজনক।'

'তুমি ভারি চতুর লোক। তোমার জন্যে ব্যাপারটা আসলেও উদ্বেগজনকই বটে।' ছুরি আর কাঁটা-চামচ রেখে চেয়ারে হেলান দিল পাইথন, অদ্ভুত এক অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আশরাফের দিকে।

গা গরম হয়ে উঠল আশরাফের, তেষ্টা পেল, ভয় লাগল—চেহারায় এ-সব প্রকাশ পেতে দিল সে। কাল লাঞ্চের সময়ও এরকম একটা অধিবেশনে পাইথনের সঙ্গে বসতে হয়েছিল তাকে। সেটা এখনকার চেয়ে অনেক সহজ ও নিরাপদ ছিল, কারণ সময়টা বেশিরভাগই ব্যয় হয়েছিল ফটোস্ট্যাট করা কয়েকটা কাগজ পড়ে। অনূদিত মাস প্যাপিরাসের হারানো পাতা থেকে করা। মাসে কি বিপুল পরিমাণ গুপ্তধন লুকানো আছে, আশরাফের কাছে তা প্রকাশ করে নিয়ে ভারি পুলক ও আনন্দ লাভ করেছে পাইথন। ওগুলো পড়ে শোনাবার পর বলেছে, গুপ্তধনের পরিমাণ এত বেশি হওয়ার কারণেই তার পক্ষে কোন সাক্ষীকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কারণ কেউ বেঁচে থাকলেই দুনিয়ার লোককে সব কথা বলে দেবে।

অনুবাদ করা অংশটা মুখস্থ করে রেখেছে আশরাফ।

'...অতএব, আমি, ডোমিটিয়ান মাস, রোমের একজন শাসক, ফেবিয়াস-এর পুত্র, নুমিডিয়া-র একজন ম্যাজিস্ট্রেট, দেহরক্ষী নিয়ে আফ্রিকা নোভা ছাড়িয়ে অজানা দেশে অভিযানে বেরুলাম এবং দক্ষিণের রাজকুমারীর কথা জানতে পারলাম, যিনি ওই এলাকায় বসবাসরত আউরিঘা জাতিকে শাসন করেন। কোন কোন জাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো আমার, আমার বাবা ফেবিয়াস সেই উদ্দেশ্যেই আমাকে পাঠিয়েছেন। এলাকাগুলো বেশিরভাগই খালি ও অনুর্বর, অথচ দু'এক জায়গায় মাটি ফুঁড়ে প্রচুর পানি বেরিয়ে আসে, ফলে গাছপালা জন্মায়...'

অভিযানের তৃতীয় বছরে বার্বার জনগোষ্ঠীর একটা উপজাতির সাক্ষাৎ পায় মাস, গোটা একটা উপত্যকা জুড়ে বসবাস করছে তারা। পরে এই উপত্যকাটা

তার নামে পরিচিতি পাবে। উপজাতির সর্দারের মেয়েকে বিয়ে করে সে, তার ভাষায় যাকে দক্ষিণের রাজকুমারী বলা হয়েছে। তারপর দ্রুত, রোমান দক্ষতা ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে, এলাকায় নিজের একটা খুদে সাম্রাজ্য স্থাপন করে ডোমিটিয়ান মাস। দক্ষিণ থেকে ক্রীতদাস আনা হলো, নতুন ঈশ্বরদের নাম ও গুণ প্রচার করা হলো, প্রতিষ্ঠিত হলো রোমান প্রশাসন।

কিন্তু এইটুকুই সব নয়। বাবার আকাঙ্ক্ষা বিশ্বস্ততার সঙ্গে পূরণ করার চেষ্টা করল যুবক মাস। তার বাবা নুমিডিয়া প্রদেশের ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করার সময় নিজেদের জন্যে একটা ঠিকানা খুঁজে পাবার পরিকল্পনা করছিলেন। এ ব্যাপারে বাবার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল মাসের। এক পর্যায়ে নিজেদের জন্যে ঠিকানা খোঁজার দায়িত্বটা বাবার বদলে ছেলের কাঁধে চাপল, পদোন্নতি পেয়ে তার বাবা রোমে বদলি হয়ে যাওয়ায়।

তারপর, পরবর্তী দশ বছর ধরে, আফ্রিকা চষে যেখানে যত মূল্যবান সম্পদ ও সামগ্রী পেয়েছেন, ক্যারাভানের সাহায্যে সবই ছেলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন ফেবিয়াস। বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী মানুষের জন্যে লুঠপাট করার সুযোগ সব সময়ই থাকে। রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতিরা ফেজান, মৌরিতানিয়া প্রভৃতি আফ্রিকান শহরগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ সংগ্রহ করছিলেন, সেগুলোর বেশিরভাগই ফেবিয়াসের মাধ্যমে রোমে পৌঁছুনোর ব্যবস্থা করা ছিল। কিন্তু তা পৌঁছায়নি।

ফেবিয়াস আততায়ীর হাতে মারা যান। ছেলে মাস সিদ্ধান্ত নেয় যেখানে আছে সেখানেই থাকবে সে, লম্বা রোমান হাতের নাগালের বাইরে। পাথুরে শহরের নিচে কোথাও দু'হাজার বছর ধরে পড়ে আছে তাদেরই সেই বিপুল গুপ্তধন।

জীবনের শেষ দিকে গুপ্তধনের একটা তালিকা তৈরি করে মাস। তালিকায় সোনা ও রূপো ছিল, ছিল মুদ্রা, প্লেট, বার্বার জাতির মৃৎশিল্প, অলঙ্কার, আইভরি, অ্যান্টিকস, অস্ত্র বা হাতিয়ার, ঢাল ও তলোয়ার, সোনার বাসন, রত্নখচিত রূপোর অলঙ্কার আর মূল্যবান পাথর। তালিকায় গারামান্টেস পাথর সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। '...অত্যন্ত খাঁটি চুনি পাথর, এবং আকারে সেগুলো এত বড় যে দু'হাত এক করা অবস্থায় একজন মানুষ খুব বেশি হলে মাত্র গোটা দশেক ধরতে পারবে, সংখ্যায় প্রায় ছ'শোর কাছাকাছি হবে।'

শুধু চুনি নয়, অন্যান্য পাথরও ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আফ্রিকার উপকূল শাসন করেছে ফিনিশিয়ান, পারশিয়ান, গ্রীকরা; এমন একটা সময়ে মানুষ যখন তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের সঙ্গে বহন করত। কিছু কিছু অমূল্য রত্ন, বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, কাটা ও পালিশ করা হয়েছে দুনিয়ার পুব দিকে। প্রথমে এগুলো গ্রীকদের হাতে পড়ে, তারপর রোমান বিজয়ীদের হাতে। সবগুলো জড় হয় এক জেনারেলের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়, তারপর হয় চুরি যায় নয়ত হারিয়ে যায় এক যুদ্ধে—ডোমিটিয়ান মাস তখনও জন্মগ্রহণ করেনি। এগুলোও এ সময় তার তৈরি শহরে এসে পৌঁছায়।

আজ সে-সব পাথরের মূল্য আন্দাজ করা সত্যি কঠিন। কয়েকশো মিলিয়ন

স্টার্লিং পাউন্ড হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। তবে দুঃখের বিষয় হলো মাস তার ডায়েরীতে গুপ্তধনের সঠিক অবস্থান উল্লেখ করে যায়নি।

'ব্যাপারটা যে ইন্টারেস্টিং, এ-ব্যাপারে আশা করি তুমি আমার সাথে একমত হবে,' আশরাফের পড়া শেষ হতে মুখ খুলল পাইথন। 'খর্বকায় ও অল্পবুদ্ধি ড. জিমসন গুপ্তধন সম্পর্কে লেখা পাতাগুলো লুকিয়ে রেখেছিল। ব্যাটা ছিল ইহুদি! হোয়াইটস্টোনও তাই। ওরা গোপনে পরামর্শ করেছিল, গুপ্তধন উদ্ধার করে ইসরায়েলি সরকারের হাতে তুলে দেবে, গুপ্তধন বেচা টাকা দিয়ে তারা যাতে ইসরায়েলের অর্থনীতিকে চাঙা করতে পারে। তাদের ভাষায়, এটা একটা জনহিতকর কাজ।' চওড়া হাসি ফুটল পাইথনের কুৎসিত মুখে। 'এ-কথা তো আলজিরিয়ান সরকারকে বলা সম্ভব নয়। তবে স্যার ভিক্টর ক্যানিংকে না বলে উপায় ছিল না, কারণ মাটি খুঁড়ে শহরটাকে বের করতে একজন ধনী লোকের সাহায্য তো দরকার। এত লোক থাকতে ভিক্টর ক্যানিংকে বেছে নিল ওরা। ক্যানিংকে, ওহ্ মাই গড!' শব্দহীন অদম্য হাসিতে কাঁপতে লাগল প্রকাণ্ড দৈত্য। ঘটনাটা তাকে বিপুল আনন্দ দিয়েছে।

অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এল আশরাফ, দেখল তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে পাইথন।

'ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত,' নরম সুরে বলল পাইথন। 'এইমাত্র তুমি যখন আনমনা হয়ে ছিলে, তোমাকে রীতিমত ইন্টেলিজেন্ট দেখাচ্ছিল।'

নিজেকে অভিশাপ দিল আশরাফ। অকস্মাৎ মুখভাব বদলানো উচিত হবে না, বুঝতে পারল সে। ধীরে ধীরে মেরুদণ্ড সিধে করল, পাইথনের দিকে তাকাল চেহারায় সামান্য রাগ মেশানো বিহ্বল ভাব ফুটিয়ে। 'আমাকে বোকা বলে মনে করা হয়, এ আমি বিশ্বাস করি না। কারণ আমি তা নই।'

ফিক ফিক করে হাসল পাইথন। 'তা বোধহয় নও,' বলল সে, হাবভাব দেখে মনে হলো চিন্তিত। 'তা বোধহয় সত্যি নও।'

প্রকাণ্ড আঙুলগুলো টেবিলের ওপর কিছুক্ষণ ড্রাম বাজাল, তারপর ইঙ্গিতে খালি প্লেটটা দেখাল সে। 'টেবিলটা পরিষ্কার করো, তারপর চলো দেখে আসি লেবাররা কি রকম কাজ করছে।'

পাঁচ

আশরাফের চেহারায় সমীহ, নরম সুরে জানতে চাইল, 'মাসে পানির সরবরাহ সম্পর্কে আপনার স্বামী কিছু জানতে পেরেছেন, মিসেস হোয়াইটস্টোন?' আজ সন্ধ্যায় গ্যাস চেম্বারে আবার ওদের যত্ন নেয়া হবে, ব্যাপারটা ভুলে থাকার জন্যে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে সে।

স্বামীর বিছানায় বসে আছেন ভদ্রমহিলা। রাতে ঘুমানো ছাড়া বেশিরভাগ সময় এখানেই কাটান তিনি। স্ত্রীর কথার প্রায় কোন জবাবই দেন না প্রফেসর, তাঁকে কথা বলাবার চেষ্টা করা হলে খেপে যান। আশরাফের ধারণা, ভদ্রলোকের মন ও মাথার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে।

টীমের তরুণ সদস্যরা নিজেদের মধ্যে এক-আধবার কথা বলে বটে, তা-ও অত্যন্ত অলস ও নিরাসক্ত ভঙ্গিতে। সাধারণত ইতিমধ্যে মাটি খোঁড়ার যে-সব কাজ করা হয়েছে সে-সব বিষয়ে আলোচনা করে তারা, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে নয়। বর্তমান তাদের কাছে আতঙ্ককর দুঃস্বপ্ন, সেদিক থেকে মন ফিরিয়ে নিয়েছে। নবাগত চারজন আগন্তুকের সঙ্গে খুবই কম কথা বলে তারা, তবে ভয় ও সন্দেহভরা দৃষ্টিতে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

এখানে বেশিদিন থাকতে হলে সে-ও ওদের মত প্রাণহীন জড়পদার্থে পরিণত হবে, কল্পনা করে শিউরে উঠল আশরাফ। এখন দুপুর, কাজের বিরতি। ভোর থেকে একটানা বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত কাজ করেছে বন্দীরা, তারপর কমনরূমে এনে খাবার দেয়া হয়েছে তাদের। রোদের প্রখরতা কমলে আবার চারটের সময় কাজ শুরু করবে ওরা, সাতটা পর্যন্ত আর কোন বিরতি নেই।

মিসেস হোয়াইটস্টোনের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। স্বামীর দিকে তাকালেন তিনি, তারপর আশরাফের দিকে। ভদ্রমহিলার চোখ দুটো ভেতর দিকে ডেবে গেছে। চেহারায় বিহ্বল একটা ভাব। 'পানি?' বিড়বিড় করলেন তিনি 'হ্যাঁ, মনে পড়ছে, আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু ওকে আপনার বিরক্ত করা উচিত হবে না। ও কি আর নিজের মধ্যে আছে, মি.···দুঃখিত, আপনার নামটা আমি স্মরণ করতে পারছি না। ওকে নিয়ে ভারি চিন্তায় আছি।' স্বামীর কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে মৃদু চাপ দিলেন, দিনের পর দিন কোদাল আর শাবল চালিয়ে হাতের তালু ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে।

'না, ওঁকে আমি বিরক্ত করব না,' বলল আশরাফ। 'কিন্তু আপনার কি মনে নেই? ওয়াটার সাপ্লাই সম্পর্কে কি আলোচনা হয়েছিল?'

মুখের সামনে থেকে মাছি তাড়ালেন মিসেস হোয়াইটস্টোন। 'ও বলছিল···কি বলছিল?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। 'হ্যাঁ, ফোগারা সিস্টেম।' ফোগারা সিস্টেম কি, আশরাফ জানে না। ধারণা করল, রানা বা সোহানা হয়তো বলতে পারবে। 'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, কারণ আমরা জানতাম আরও অনেক পরে এই সিস্টেম চালু হয়।' কথা বলছেন বটে, তবে ভদ্রমহিলার চেহারায় কোন আগ্রহ নেই 'উৎসটা খুঁজে পাবার চেষ্টা করছিলাম আমরা। কাছাকাছি একটা নদী বা কুয়া থাকতে হবে। নিশ্চয়ই সেটা এক হাজার বছর বা আরও বেশিদিন আগে শুকিয়ে গেছে। তবে চিহ্ন থাকবে। তারপরই তো ওই লোকগুলো হাজির হলো···' হঠাৎ চোখ বুজে শিউরে উঠলেন তিনি, কয়েকটা ভাঁজ পড়ল মুখে। আশরাফ বুঝতে পারল, কান্না থামাবার চেষ্টা করছেন।

মৃদু, নরম গলায় বলল সে, 'হাল ছাড়বেন না, মিসেস হোয়াইটস্টোন। আমি আপনাকে বলছি, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ছোট কামরাটার দিকে যাচ্ছে আশরাফ, ওখানে জেনি আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে, না? ভাবছে সে। কিভাবে সব ঠিক হবে, শুনি? রানা ও সোহানাকে যতটুকু চেনে সে, ওরা জাদু জানে না। আর তাক লাগানো কয়েকটা জাদু দেখাতে না পারলে এখান থেকে উদ্ধার পাবার কোন সম্ভাবনা নেই ওদের। জাদু তো জানেই না, তার ওপর সমস্যাটাকে ওরা যে দৃষ্টিতে দেখছে তাতে উদ্ধার পাবার সম্ভাবনা আরও কমে তো বাড়ে না। রানা ও সোহানা, দু'জনেই শুধু নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর কথা ভাবছে না, ভাবছে কিভাবে সবগুলো বন্দীকে নিয়ে পালানো যায়। মুশকিল হলো, একটা নো-ম্যানস ল্যান্ডে রয়েছে ওরা। বাইরে থেকে সাহায্য পাবার কোন আশা নেই। তার ওপর, ওরা নিরস্ত্র।

আজ বিকেলে আবার পাইথনের সঙ্গে বসতে হবে তাকে, মনে পড়তেই ঘেমে গেল আশরাফ। এরচেয়ে অনেক ভাল ছিল মাটি খোঁড়ার কাজ পেলে। পাইথনের হাসির খোরাক হওয়া মানে প্রতি মিনিটে এক বছর করে আয়ু কমে যাওয়া। হতাশ ভাবটা মন থেকে মুছে ফেলে নতুন পাওয়া আইডিয়াটা নিয়ে ভাবল সে। সন্দেহ নেই, আইডিয়াটা কোন কাজের নয়, তবে অন্তত ডাইভারশন হিসেবে কাজ দিতে পারে। খিলানের নিচ দিয়ে ছোট কামরাটায় ঢুকল সে।

ঢুকেই বিব্রত বোধ করল আশরাফ। কাপড়চোপড় খুলে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে জেনি, হাতে বালি নিয়ে গায়ে ঘষছে। এটা হলো তাদের গোসলের বিকল্প, পদ্ধতিটা সোহানার কাছ থেকে শিখেছে। শরীর পরিষ্কার রাখার জন্যে খুব কাজ দেয়। ওদের সমস্ত জিনিস-পত্র কেড়ে নিয়েছে শত্রুরা, এমনকি একটা তোয়ালে বা টুথব্রাশ পর্যন্ত দেয়নি। ওদের দিন কাটছে আদিম মানুষদের মত। একটা কানাগলির শেষ মাথায় ল্যাট্রিনটা, কমনরূম থেকে যাওয়া যায়। প্রকৃতিরই তৈরি একটা গভীর ফাটল মাত্র, কিনারার কাছে স্তূপ করা আছে বালি, গজ দেড়েক চটও টাঙানো আছে সামনের দিকটায়।

নোংরা থাকতে হচ্ছে বলে আর্কিওলজিকাল টীমের কারও কোন অভিযোগ নেই, ব্যাপারটা তাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। তবে রানা ও সোহানার দলটা নিয়মিত স্যান্ড-বাথ নেয়। সোহানা বলেছে, পরিচ্ছন্ন থাকলে মনোবল অটুট থাকে।

খিলানের নিচে থমকে দাঁড়াল আশরাফ, বলল, 'দুঃখিত।'

'দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই, আশরাফ,' তাড়াতাড়ি কাপড় তুলে গা ঢাকল জেনি। 'আমার হয়ে গেছে। এক মিনিট শুধু পিছন ফিরে থাক, কাপড়টা পরে নিই।' চোখ সরাবার আগে আশরাফ দেখল, জেনির একহারা শরীরটা নিরেট ও অত্যন্ত সুগঠিত। ঘুরল না সে, অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে বিছানার দিকে এগোল।

বিছানার ওপর এক জোড়া লোকেটর পড়ে রয়েছে। 'আজ সকালে খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে, কাজ করার সময়?' জানতে চাইল সে।

'খুব বেশি না।' দ্রুত হাতে ব্রেসিয়ার পরল জেনি, কোমরে স্ল্যাকস্ তুলে আশরাফের দিকে তাকাল, শার্টটা হাতে। চেহারায় উদ্বেগ, বলল, 'তোমাদের কথা ভেবে খুব চিন্তায় আছি আমি, আশরাফ। আজ সন্ধেবেলা গ্যাস চেম্বারে ঢোকানো হবে তোমাদের।'

মনে করিয়ে না দিলেই ভাল হত, ভাবল আশরাফ। 'চিন্তা কোরো না,' জেনিকে অভয় দিল সে। 'আমার ব্যাপারটা রানা সামলাবে। আর নিজেদেরকে কিভাবে রক্ষা করতে হয়, দু'জনেই জানে ওরা।'

'তা বটে।' ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল জেনির ঠোঁটে। শার্টটা গায়ে দিয়ে বিছানায় আশরাফের পাশে এসে বসল সে। 'সবাই আমরা ওদের ঘাড়ে বোঝা হয়ে আছি, কোন কাজে লাগছি না। জানি না কিভাবে ওরা এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে আমাদের।'

'তুমি বড় অধৈর্য,' বলল আশরাফ, বলার সুরে আত্মবিশ্বাসের ভাব আনার চেষ্টা করল। 'ওদেরকে তুমি চেন না, ঠিকই একটা ব্যবস্থা করবে। হয়ত অযথা সময় নষ্ট, তবু আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করবে তুমি, জেনি? আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই।'

বড় কামরাটায় নিজের বিছানায় বসে রয়েছে রানা। ওর হাঁটুর ওপর চ্যাপ্টা ও সমতল একটা পাথর। কঠিন একটা অ্যারোহেড ঘষে তীক্ষ্ণ করার জন্যে ওটাকে কামারের নেহাই হিসেবে ব্যবহার করছে।

একটা তীর ইতিমধ্যে বানানো হয়ে গেছে। ট্রেঞ্চ থেকে মাটি ও পাথর তোলার জন্যে বেতের বড় আকারের ঝুড়ি ব্যবহার করা হয়, সেই ঝুড়ির একটা সরু বাঁশ চুরি করে এনে তৈরি করা হয়েছে ওটা। প্রথম অ্যারোহেডটাও ঘষে ধারাল করা হয়েছে। ওটা পাতা আকৃতির, মাঝখানে একটা আঙুলের মত মোটা বোঁটা আছে। বোঁটাটা বাঁশের গর্তে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, তারপর শক্ত করে বাঁধা হয়েছে সরু তার দিয়ে। তারটাও চুরি করা।

ধনুকটা এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। ধনুকের জন্যে কাঠ ব্যবহার করছে রানা। প্যাপিরাস আবিষ্কৃত হবার পর মাসে প্রথম এসেছিল আরব বেদুইনরা, বালি সরিয়ে তারাই উপত্যকায় ঢোকার প্রবেশ পথটা মুক্ত করে। সম্ভবত তাদেরই তাঁবুর একটা অংশ ছিল কাঠটা, ধনুক তৈরির জন্যে আদর্শ। ব্যবহার করার আগে আরও কিছু কাজ আছে ওটার ওপর—খানিকটা চাঁচতে হবে, আকৃতি ঠিক করার জন্যে বাঁকা করতে হবে আরেকটু। জ্যা বা ছিলা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এক ইঞ্চি চওড়া নাইলন, পাওয়া গেছে জেনির মোজা থেকে। পাক খাইয়ে শক্ত করা হয়েছে ওটাকে।

আশরাফের বিছানায় বসে রয়েছে সোহানা, রানার দিকে মুখ করে। ওর হাতে রানার তৈরি একটা ছুরি। হাতলটা কাঠের, তার দিয়ে আঁটো করে বাঁধা। ফলাটা লোহার। কয়েক শো বছর মাটির নিচে পড়ে থাকায় ভোঁতা হয়ে গেছে ফলার কিনারা। একটা পাথরের ওপর ধীরে ধীরে ঘষছে ও।

চোখে অস্বস্তি, সোহানার দিকে একবার তাকাল রানা, তারপর আবার নিজের কাজে মন দিল। চেহারা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই, অন্তত সাধারণ দৃষ্টিতে কিছুই ধরা পড়বে না, কিন্তু ওর মন-মেজাজে সূক্ষ্মতম তারতম্য ঘটলেও তা রানার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ওর চেহারায় অদ্ভুত একটা শান্ত ভাব দেখা দিয়েছে, লক্ষ করে

মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠেছে রানা। ও প্রায় নিশ্চিত, কিছু একটা করার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছে সোহানা। ব্যাপারটা ওকে জানায়নি, সেটাই রানার উদ্বেগের কারণ। এর একটাই অর্থ হতে পারে; প্ল্যানটা এমনই যে শুনলে বাধা দিতে পারে রানা। হয়তো অসম্ভব কোন ঝুঁকি নিতে চাইছে সোহানা।

জীবনে এই প্রথম নিজের ভেতর আত্মবিশ্বাসের অভাব বোধ করছে রানা। ও নিরস্ত্র, সেজন্যে নয়। পেনিফিদার ও ক্রনেল পুরানো শত্রু, এই সুযোগে প্রতিশোধ নেবে, কারণ সেটাও নয়। আসল কারণ পাইথন মার্কাস। ওই দানবের সঙ্গে লড়ে জিততে পারবে না ও, এটা প্রমাণিত সত্য। দু'জনের শারীরিক শক্তির মধ্যে কোন তুলনা চলে না, রানার মত চার-পাঁচজন লোককে একা সামলাতে পারবে পাইথন অনায়াসে। তবু স্বভাবসুলভ দৃঢ়তা হারায়নি রানা, মরার আগেই মরে যেতে রাজি নয় বা লড়ার আগেই কাবু হবে না। লড়তে যে হবে ওকে, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। লড়ার জন্যে মানসিকভাবে তৈরিও সে। জানে পারবে না, হেরে যাবে। আর পাইথনের সঙ্গে হেরে যাওয়া মানে মৃত্যু।

ও মারা গেলে কি ঘটবে? সমস্ত দায়িত্ব চাপবে একা সোহানার কাঁধে। সোহানার ট্রেনিং, নীতিবোধ, বিবেক সম্পর্কে জানে ও। রানা নেই দেখলেও ভয় পাবে না সে। শুধু একার প্রাণ বাচানোর চেষ্টা করবে না। কাজেই জিততে না পারুক, লড়ার সময় ওকে লক্ষ রাখতে হবে পাইথন যেন যত বেশি সম্ভব মারাত্মকভাবে আহত হয়। সোহানার কাজ তাতে খানিকটা হলেও সহজ হয়ে যাবে। আশরাফ আর জেনিকে বাঁচাতে হবে···

জেনিকে দেখতে পেল রানা, হাতে লোকেটর নিয়ে কমনরুমের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করছে। তার সঙ্গে আশরাফও রয়েছে। কি যেন একটা পরীক্ষা করছে ওরা, বেশ কিছুক্ষণ ধরে। রানা আন্দাজ করল, জেনিকে বিপদের কথা ভুলিয়ে রাখার জন্যে নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধি বের করেছে আশরাফ।

জেনির জন্যে মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। কি ভাল একটা মেয়ে। সরল, সাহসী, সুন্দর ও অন্ধ। অথচ কি সাংঘাতিক একটা বিপদে জড়িয়ে পড়েছে বেচারি। কাজ শেষ হয়ে গেলে ওকেও মেরে ফেলা হবে।

'ফোগারা কি, রানা?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল আশরাফ, রানার সামনে এসে দাঁড়াল।

'আন্ডার গ্রাউন্ড চ্যানেল, মরুভূমিতে পানি আনার জন্যে মাটি কেটে তৈরি করা হয়,' মুখ তুলে বলল রানা, কিছু না ভেবেই। 'কেন?'

'এমনি জিজ্ঞেস করছি। এ-ব্যাপারে আর কি জানো তুমি?'

'খানিক পর পর চিমনি রাখতে হয়, শ্রমিকরা যাতে দম নিতে পারে, পানি যাতে বাতাস পায়। খোলা চ্যানেলে পানি যেমন বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, পাতালে তা ঘটে না। সাহারায় এখনও প্রায় দু'হাজার মাইল ফোগারা আছে। এখানে-সেখানে প্রায় দেখা যায় ফাঁপা বালির দুর্গের মত মাথা তুলে আছে সারি সারি চিমনি।'

'হঠাৎ কেন তুমি জানতে চাইছ, আশরাফ?' প্রশ্ন করল সোহানা।

'না, মিসেস হোয়াইটস্টোন শব্দটা উচ্চারণ করলেন কিনা। আমি তাঁকে পানি

সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। শোন তাহলে, আমরা বোধহয় কিছু একটা পেয়েছি। বলা উচিত, জেনি পেয়েছে।'

দুটো বিছানার মাঝখানে চলে এল জেনি, বসল রানারটায়। 'এই কমনরুমেরই তলা দিয়ে একটা অ্যাকুইডাকট্ চলে গেছে। ওটায় পানি নেই প্রায়…কয়েক শো বছর, আমার ধারণা। তবে এককালে ছিল।'

রানা ও সোহানা পরস্পরের দিকে তাকাল।

আশরাফ বলল, 'চিন্তাটা আমার মাথায় এভাবে এল। আমাদের বন্ধু মাস এবং তার প্রজারা যখন এখানে বসবাস করছিল, তখন নিশ্চয়ই সব জিনিসের অঢেল সাপ্লাইও ছিল। তারপর আমার মনে হলো, দু'জন রোমান এক হলে সব সময় প্রথমে যে কাজগুলো করত, তার মধ্যে একটা হলো অ্যাকুইডাকট্ তৈরি।'

ভোঁতা ছুরি আর পাথরটা চাদরের ভাঁজে লুকিয়ে রাখল সোহানা। 'এখানে?' জানতে চাইল সে, পায়ের আঙুল দিয়ে কমনরুমের মেঝেতে টোকা দিল, তাকাল আশরাফের দিকে। 'এটা নিরেট নয়, বলতে চাইছ?'

'বেশিরভাগই নিরেট।' লম্বা চেম্বারের একটা পাশ হাত তুলে দেখাল আশরাফ। জেনি অ্যাকুয়েডাক্টটা পাবার পর ভাল করে দেখার জন্যে খানিকটা বালি সরালাম আমরা। পাথরের দু'সারি ফলক দেখেছি, মাটিতে গাঁথা, ওদিকে—দেয়ালের গা ঘেঁষে, একটা সমান্তরাল রেখা ধরে এগিয়েছে…'

লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল সোহানা, জেনিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আবেগে একটা চুমো খেয়ে ফেলল। দম ফেলার ফুরসত পেয়ে জেনি বলল, 'আইডিয়াটা ছিল আশরাফের,' মুখে আড়ষ্ট সলজ্জ হাসি।

'দুর্ভাগ্য আমি তোমার মত মেয়ে হয়ে জন্মাইনি,' আশরাফের গলায় কৃত্রিম গাম্ভীর্য।

মুচকি হেসে চাদরের ভাঁজ খুলল রানা, ভেতরে ছোটখাট অনেকগুলো জিনিস দেখা গেল। লোহা ও হাড়ের কয়েকটা অ্যারোহেড, লোহার জং ধরা পাত, প্যাঁচানো তার, কাঁচের টুকরো, চামড়ার তৈরি স্লিং, কয়েকটা গোল ও মসৃণ পাথর, খাট থেকে খুলে নেয়া লোহার কয়েকটা লম্বা ও চ্যাপ্টা টুকরো। এরকম একটা লোহার টুকরো হাতে নিল রানা, একদিকের মাথা সামান্য বাঁকা, সিঁদকাঠির মত। বলল, 'চল, দেখে আসি।'

বালি সরান হয়েছে, তবু পাথরের ফলকগুলো সহজে চোখে পড়ল না, জয়েন্টগুলো বালি আর ধুলায় ভরাট হয়ে গেছে। দু'সারি ফলক, সমান্তরালভাবে এগিয়েছে, আকৃতিটা ইংরেজি এল হরফের মত। এল-এর লম্বা বাহুটা শেষ হয়েছে পিছনের দেয়ালের গায়ে, নিচের ছোট বাহুটা লম্বা দেয়ালের গায়ে এসে ঠেকেছে, দরজার কাছাকাছি।

কোন আলোচনা ছাড়াই পিছনের দেয়ালের গায়ে সেঁটে থাকা ফলকগুলোর ওপর মনোযোগ দিল রানা ও সোহানা। ভোঁতা টুলস দিয়ে আধ ঘণ্টার মত লাগল জয়েন্টগুলো পরিষ্কার করতে। আরও এক ঘণ্টা বেরিয়ে গেল প্রথম ফলকটা মাটি খুঁড়ে ওপরে তুলতে। অবশ্য দ্বিতীয় ফলকটা প্রায় অনায়াসে তোলা গেল।

নিচে চৌকো আকৃতির একটা চ্যানেল, পাথর কেটে তৈরি. ওপরের কিনারায় খানিকটা করে কার্নিস আছে, ফলে ঢাকনি হিসেবে ফেলা ফলকগুলো একটার সঙ্গে অপরটা সেঁটে আছে। চ্যানেলটা চওড়ায় আঠারো ইঞ্চির মত হবে, গভীরতাও ওইরকম। শুকনো খটখটে। ঝুঁকল রানা, চৌকো গর্তের ভেতর মাথা ঢোকাল। এক মুহূর্ত পর সিধে হলো ও, শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করল। 'আরও দুটো ফলক সরাও, চেষ্টা করে দেখি চ্যানেলের ভেতর ঢুকতে পারি কিনা।'

'তোমার পিঠ চ্যানেলের সিলিঙে ঠেকে যাবে,' বলল সোহানা। 'সেক্ষেত্রে আমি যাব।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

অন্ধকার গর্তটার দিকে তাকিয়ে আছে আশরাফ। দেয়ালের নিচে দিয়ে চ্যানেলটা কোন দিকে গেছে কে জানে! বাইরের দিকে কোথাও ভাঙা থাকতে পারে চ্যানেলের মাথা, ভেতরে সাপ বা ইঁদুর থাকতে পারে। তার মত, রানা ও সোহানাও এ-সব জানে। কিন্তু আলোচনা করছে না, ভয়ও পাচ্ছে না। ওটার ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোনো সম্ভব নয়। রানাকে ক্রল করে এগোতে হবে, যাকে বলে বুকে হেঁটে, হাত দুটো থাকবে সামনে লম্বা করা। ভেতরে একবার ঢোকার পর দিক পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না, ঘুরতে পারবে না রানা। ফেরার সময় পিছু হটতে হবে ওকে, গর্তটার মুখে ওরা ওর পা দুটো দেখতে পাবে আগে।

সমস্ত কাপড় খুলে ফেলল রানা, আন্ডারওয়্যার আর বুট বাদে। রুমালটা কপালে বেঁধে নিল।

আশরাফ বলল, 'কাপড় না খুললেই কি ভাল হত না, আঁচড়-টাচড় কম লাগত।'

'আশেপাশে লন্ড্রী নেই,' বলল রানা। 'ওরা যদি জিজ্ঞেস করে কাপড় নোংরা হলো কিভাবে, কি জবাব দেব?' আরও দুটো ফলক তোলা হতেই গর্তের ভেতর নেমে পড়ল ও, দেয়ালের দিকে পিছন ফিরে, পা দুটো সামনের দিকে পিছলে যেতে দিয়ে শুয়ে পড়ল ধীরে ধীরে, তারপর শরীরটা মুচড়ে উপুড় হলো। আশরাফ আশা করল, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোবে রানা, কিন্তু অবাক হয়ে দেখল টানেলের ভেতর দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল ও। সে উপলব্ধি করল, রানা ওর ভর চাপিয়েছে বাহু ও পায়ের আঙুলের ওপর, চ্যানেলের মেঝে থেকে শরীরটা এক দেড় ইঞ্চি উঁচু হয়ে আছে। সন্দেহ নেই, প্রচণ্ড চাপ পড়ছে পেশীর ওপর। কে জানে এভাবে কতদূর যেতে পারবে ও। এমন হতে পারে, সামনেই কোথাও মাটি ধসে পড়ায় বন্ধ হয়ে গেছে চ্যানেলটা।

শান্তভাবে অপেক্ষা করছে ওরা। সোহানার চেহারায় কোন উত্তেজনা নেই, অন্ধকার গর্তটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শুধু। আশরাফের হাতে একটা সিগারেট, ধরাবার কথা বোধহয় ভুলে গেছে। সোহানাকে অস্বাভাবিক শান্ত মনে হলো তার, গত তিন দিনে এরকম শান্ত ভাব তার চেহারায় দেখা যায়নি।

কমনরুমের আরেক প্রান্ত থেকে এক লোক ধীর পায়ে হেঁটে আসছে ওদের দিকে। নামটা মনে করতে পারল না আশরাফ, আর্কিওলজিকাল টীমের এই

একটিমাত্র লোকই ওদের সঙ্গে দু'একটা কথা বলেছে। কাছে এসে গর্তটার দিকে তাকাল সে, ভোঁতা দৃষ্টিতে বিড়বিড় করে জানতে চাইল, 'কি এটা?'

আশরাফ জবাব দেয়ার আগে সোহানা চাপা স্বরে প্রায় গর্জে উঠল, 'কোথায় কি দেখছ তুমি? কিছুই নেই এখানে। আবার তুমি চোখে ভুল দেখছ। যাও, নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকো, তা না হলে ওদেরকে বলে তোমাকে গ্যাস চেম্বারে পাঠাব।'

রক্তশূন্য হয়ে গেল লোকটার চেহারা, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে মাথা নাড়ল সে, তারপর ঘুরে চলে গেল।

জেনি বলল, 'মাই গড! সোহানা, কাজটা কি তোমার উচিত হলো? বেচারাকে এরকম ভয় না দেখালেও পারতে।'

'ওর ভালর জন্যেই ভয় দেখালাম,' বলল সোহানা। 'আমাদের সবার ভালর জন্যে।'

'মানে?'

'আর্কিওলজিকাল টীমের কারও কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না,' বলল সোহানা। 'কাজেই আপাতত জড় পদার্থ হয়েই থাকুক ওরা। যখন পালাবার সময় হবে, যা করতে বলব তাই করবে ওরা, কোন তর্ক করবে না। সবাইকে নিয়ে পালাবার কথা ভাবছি আমরা, শুধু নিজেদের গা বাঁচাতে চাইছি না।'

'সবাইকে নিয়ে?' কর্কশস্বরে বলল আশরাফ। 'ইট'স হোপলেস, সোহানা।' গর্তটার দিকে তাকাল সে। 'টানেলটা থেকে কোথায় উঠতে পারবে রানা, আমার কোন ধারণা নেই। উপত্যকার মুখে গার্ড আছে। তবু ধরা যাক টানেল থেকে এমন এক জায়গায় মাটির ওপর উঠল রানা যেখান থেকে গার্ডদের দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে জেনিকে নিয়ে তোমরা, মানে তুমি চলে যেয়ো।'

'আর তুমি?'

'এখানে থেকে পাইথনের হাতে খুন হতে রাজি আছি, কিন্তু ওই গর্তে ঢুকতে পারব না,' বলল আশরাফ। 'স্রেফ দম আটকে বা ভয়েই মারা যাব।'

'তোমাকে ছাড়া কোথাও আমি যাব না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল জেনি।

'কাজেই,' হাসি চেপে বলল সোহানা, 'অন্তত জেনিকে বাঁচাবার জন্যে হলেও ওই গর্তে ঢুকতে হবে তোমাকে, আশরাফ।'

'কিন্তু বাকি সবার কি হবে? ভেবেছ প্রফেসর হোয়াইটস্টোনকে এর ভেতর ঢোকাতে পারবে তুমি?'

'যখনকার সমস্যা তখন ভাবা যাবে, এখন চুপ করো তো।'

আধ ঘণ্টা পর অস্পষ্ট খসখসে একটা আওয়াজ শোনা গেল, সরু গর্তের ভেতর পা দেখতে পেল ওরা। পিছিয়ে এল শরীরটা, ঘুরল রানা, বসল। ঝুঁকে ওর হাত ধরল সোহানা, টেনে তুলল। ঘাম আর ধুলোয় সারা শরীর মাখামাখি হয়ে গেছে, তবে দুটো মাত্র সামান্য আঁচড়ের দাগ দেখা গেল। উত্তেজনায় চকচক করছে রানার চোখ।

কথা বলার আগে ঠোঁট থেকে ধুলো মুছল রানা। 'মন্দ নয়, সোহানা।

ফলকগুলো জায়গা মত বসিয়ে রাখ। বলছি, আগে আমি পরিষ্কার হয়ে নিই।'

ছোট কামরায় ঢুকে দিগম্বর সাজল রানা, বালি ঘষল সারা শরীরে। এক মিনিট পর ভেতরে ঢুকল সোহানা, পরিষ্কার হতে সাহায্য করল ওকে, পিঠে বালি ঘষে দিল। পানি দিয়ে মুখ ও নাকের ভেতরটা ধুল রানা, তারপর পুরো এক পাইন্ট খেয়ে ফেলল ঢকঢক করে। খানিক পর ভেতরে ঢুকল আশরাফ ও জেনি, সোহানার উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল আশরাফ। পাথরের ফলকগুলো আগেই জায়গামত বসানো হয়েছে, আশরাফ ও জেনি সেগুলোর ওপর বালি ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে।

মধ্যাহ্নবিরতি শেষ হতে এখনও আধঘণ্টা বাকি। ইতিমধ্যে কাপড়চোপড় পরে নিয়েছে রানা, বসে আছে মিসেস হোয়াইটস্টোনের বিছানায়। হাড় দিয়ে তৈরি একটা চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছে ও। 'একটানা, কোথাও না থেমে, প্রায় দশ মিনিট ক্রল করি আমি,' বলল ও, চেহারা ও গলা দুটোই শান্ত এখন। 'দু'এক জায়গায় টানেলটা সামান্য বাঁক নিয়েছে, কোথাও পাথর সরে যাওয়ায় মাটি ঢুকে পড়েছে, সরু হয়ে গেছে প্যাসেজ। তবে এগোতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি আমার। কিন্তু শেষ মাথাটা কোথায়, দেখতে পাইনি। টানেলটা বন্ধ হয়ে গেছে।'

'তাহলে যে বললে মন্দ নয়?' আশরাফের গলায় রাগ।

'প্রথমে দেখলাম, মাটি পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। মাটি সরাতে গিয়ে দেখি, এরপর পাথর। তবে আলগা পাথর। দেরি হলে তোমরা চিন্তা করবে ভেবে ফিরে এসেছি। আমার ধারণা, পাথরগুলো সরালে টানেলের মুখটা পেয়ে যাব আমরা। ওটা বন্ধ হয়ে আছে মুখের কাছেই, সম্ভবত। দশ মিনিট ক্রল করেছি, তারমানে মুখটা উপত্যকার বাইরেই কোথাও হবে।'

'তারমানে চাইলেই কেউ আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারছি না!' আশরাফের গলায় হতাশা।

'আজ রাতেই আরেকবার যাব আমি,' বলল রানা। 'যতটা পারি পাথর সরাব। হয়তো এভাবে কয়েকবার যেতে হবে, তবে শেষ পর্যন্ত বাইরে বেরুবার একটা পথ ঠিকই পাওয়া যাবে।'

পালাবার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে মাত্র, তবে এখুনি নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না, বুঝতে পেরে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল আশরাফ। তারপর সে ভাবল, উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাওয়া মানেই যে বেঁচে যাওয়া, তা-ও তো নয় ওদের মধ্যে এক বা একাধিক লোককে না দেখলে চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করবে শত্রুরা। অ্যাকুয়েডাক্টটা দেখে বুঝতে বাকি থাকবে না কি ঘটেছে। চারপাশে এক শো মাইল শুধুই মরুভূমি, পায়ে হেঁটে কত দূরই বা যাওয়া সম্ভব, খুব বেশি হলে এক ঘণ্টা মুক্ত থাকতে পারবে ওরা।

সোহানা ও রানা আলাপ করছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই আশরাফের। হঠাৎই শুনতে পেল, রানা বলছে, '...ইতিমধ্যে আমি তীর-ধনুক তৈরি করে ফেলি। আশা করছি কাল রাতের মধ্যে একটা উপায় পেয়ে যাব আমরা।'

'হ্যাঁ,' বলল সোহানা। 'আমারও তাই ধারণা।' অস্বাভাবিক শান্ত ও ঠাণ্ডা

লাগল ওকে।

'এখনও আধ ঘণ্টাটাক সময় আছে, ধনুকটার কাজ শেষ করতে পারব বলে মনে হয়,' বলল রানা। 'ভাল কথা, আমাদের কাছে ছোটখাট যে-সব অস্ত্র আছে সব গর্তের ভেতর লুকিয়ে রাখতে হবে, ফলকগুলোর নিচে। এখনও সার্চ করেনি, তবে করতে কতক্ষণ।'

'ঠিক আছে।' মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

'যাই, আমিই রেখে আসি।' বিছানা ছেড়ে বড় কামরাটার দিকে এগোল রানা।

ছোট কামরা থেকে রানা বেরিয়ে যাচ্ছে, ওর গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সোহানা। রানা অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও সেদিকে তাকিয়ে থাকল ও। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আশরাফ, এখন তুমি আমার কথা শুনছ?'

'সরি। তুমি ধরে ফেলেছ? একটু-আনমনা হয়ে পড়েছিলাম।'

'রানা কি বলল, শুনেছ?' জানতে চাইল সোহানা। 'কাল রাতের মধ্যে একটা উপায় পেয়ে যাব আমরা।'

'হ্যাঁ, শুনেছি। তোমারও তাই ধারণা। যদিও আমি বুঝতে পারছি না…'

আশরাফকে থামিয়ে দিল সোহানা। 'তোমার বুঝে কাজ নেই। তোমাকে যা করতে বলা হবে তুমি তাই করবে।'

'ইয়েস, ম্যা'ম।'

সোহানা হাসল না। ওর চোখে এমন একটা দৃষ্টি ফুটে উঠল, যেন দূরে কোথাও তাকিয়ে আছে। 'পাইথনের প্ল্যানটা বুঝতে পারছ?' উত্তরের জন্যে থামল না ও। 'আমার ধারণা, খুব বড় ধরনের একটা মজা পাবার আয়োজন করছে সে। এটা তার গোপন প্ল্যান, মনে লালন করছে, আর পুলক অনুভব করছে। বেশ লম্বা একটা সময় অপেক্ষা করে আছে, ধৈর্য প্রায় শেষ। এবার ঘটনাটা ঘটাবে সে।'

'ঠিক বলেছ।' আশরাফের মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেল। 'ঘটনাটা কি হতে পারে বলে তোমার ধারণা?'

'সেটা পরিষ্কার,' বলল সোহানা, হঠাৎ যেন দপ করে জ্বলে উঠল ওর চোখ দুটো।

'আমিও জানি কি সেটা,' বলেই ফুঁপিয়ে উঠল জেনি।

তাড়াতাড়ি জেনির একটা হাত ধরে ফেলল সোহানা। 'চিন্তা কোরো না, জেনি। কারণ, ঘটনাটা আমি ঘটতে দিচ্ছি না।'

'কি ঘটবে?' কষ্ট করে একটা ঢোক গিলল আশরাফ, ফিসফিস করে জানতে চাইল।

'পাইথনের প্ল্যানটা রানাকে নিয়ে,' বলল সোহানা, মৃদু চাপ দিল জেনির হাতে। 'ঘটনাটা যাতে না ঘটে, তার একটা উপায় বের করেছি আমি। তোমাদের সেটা এখুনি জানার দরকার নেই।' আবার আশরাফের দিকে তাকাল ও। 'আমাদের মধ্যে এক মাত্র তুমিই পাইথনের কাছাকাছি থাকতে পারছ। তুমিই তার মেজাজ সবচেয়ে ভাল বোঝ, আশরাফ। আমি চাই, সে কোন ঝামেলা পাকাতে চাইছে, এটা বুঝতে পারার সাথে সাথে আমাকে তুমি জানাবে।'

'ঠি-ঠিক আছে।' আবার ঢোক গিলল আশর... কিন্তু জানাব কিভাবে... মানে, তোমার সাথে যদি কথা বলার সুযোগ না পাই?'

'যে-কোন একটা সিন-ক্রিয়েট করবে। ভান করবে পাথরে হোঁচট খেয়েছ। এক পায়ে লাফাবে। পরিস্থিতি বুঝে একটা কিছু করলেই হবে।'

মাথা ঝাঁকাল আশরাফ। 'সময় কিন্তু হয়ে এসেছে। আজ পাইথন মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করছিল আমার সাথে; বলছিল মানুষকে মরতে দেখলে তার ভাল লাগে। আমার মনে হয়, ঘটনাটা যে এবার ঘটবে, এটা তার একটা লক্ষণ।'

কথা না বলে চিন্তা করছে সোহানা।

'তোমার প্ল্যানটা কি, বলবে না আমাদের?' এক মুহূর্ত পর জিজ্ঞেস করল আশরাফ, লক্ষ করল নিঃশব্দে চোখ মুছছে জেনি।

সোহানার কথা শুনে মনে হলো, আশরাফের প্রশ্নটা শুনতে পায়নি ও। 'রানা জানতে চাইছিল, বিল ওয়াটসন প্লেন নিয়ে কাল আসবে কিনা। কালই তো আসবে, তাই না?'

'আসার তো কথা। লক্ষ করছি, অতিরিক্ত খাবার আর পানি নিয়ে একদিন পর পর আসছে সে। কাল রাতে এসেছিল।'

'আমাকে খুলে বলেনি, তবে মনে হয় রানারও একটা প্ল্যান আছে,' অন্যমনস্কভাবে বলল সোহানা। খানিক পর যেন গা ঝাড়া দিয়ে চিন্তার জগৎ থেকে বেরিয়ে এল ও, মৃদু হেসে জেনির কাঁধে একটা হাত রাখল। 'এত মন খারাপ করে থেকো না তো তোমরা দু'জন।'

'আমার মন সত্যি খারাপ,' অনুযোগের সুরে বলল আশরাফ। 'কারণ প্ল্যানটা তুমি বলছ না।'

'যাই ঘটুক, বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নেয়ার চেষ্টা করবে। আমার কাজে কোন রকম বাধা দেবে না। শুধু মনে রেখ, অন্য কোন উপায় নেই।'

আশরাফের অস্বস্তি এক পলকে উদ্বেগে পরিণত হলো, শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার। 'এটা কোন উত্তর হলো না।'

'জানি। সত্যি আমি দুঃখিত। কিন্তু এই মুহূর্তে আর কিছু বলা সম্ভব নয়।'

ছয়

সাতটা বাজতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি, এই সময় সোহানা দেখল কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা শাখা উপত্যকা থেকে আশরাফকে নিয়ে বেরিয়ে আসছে পাইথন। কাঁটাতারের বেড়ার ওদিকটায় নিজেরা আরাম ও আয়েশের সঙ্গে বসবাস করছে পাইথন আর তার দল। গেটে সশস্ত্র প্রহরী আছে কি বিষয়ে যেন অনর্গল কথা বলছে আশরাফ, ঘন ঘন হাত নাড়ছে

একটা ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে সোহানা, বড় একটা আলগা পাথর তুলে ছুঁড়ে দিল এক

পাশে। আড়চোখে লক্ষ করল, পাইথনের হাঁটাচলার মধ্যে নতুন কি যেন একটা আছে। এখনও বেশ অনেক দূরে ওরা, তারপরও পাইথনের হাসির আওয়াজ পরিষ্কার ভেসে এল। ঘন ঘন এদিকে তাকাচ্ছে সে, হাসির দমকে ঝাঁকি খাচ্ছে প্রকাণ্ড শরীর। হঠাৎ যেন নতুন প্রাণশক্তি এসে গেছে তার মধ্যে। বিপদ সঙ্কেত পেয়ে সোহানার ঘাড়ের পিছনটা শিরশির করে উঠল।

তিনশো গজ দূরে দ্বিতীয় দলটার সঙ্গে কাজ করছে রানা, প্রাচীন বাজার এলাকায়। সোহানার বাম দিকে, খানিকটা পিছনে, আগের মত আজও প্র্যাকটিস করছে কোর্সিনেজ। আর্কিওলজিকাল টীমের কয়েক-জন তরুণও কাছাকাছি মাটি খুঁড়ছে। বালি, মাটি ও পাথরের উঁচু একটা পাহাড়ে উঠে আসছে পাইথন, এখনও হড়বড় করে কথা বলছে আশরাফ। পাহাড়ের মাথায় উঠে এক সেকেন্ড দাঁড়াল পাইথন, তারপর ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। তাকে অনুসরণ করতে এক সেকেন্ড দেরি করল আশরাফ, তারপর হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সিধে হলো সে, তবে একটা পা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে অপর পায়ে লাফাতে শুরু করল, ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে চেহারা। তার কাতর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পেল সোহানা।

'আমার পা! আমার পা মচকে গেছে! বাবারে! মারে! আশ্চর্য, আপনি হাসছেন!'

ঘুরে দাঁড়াল কোর্সিনেজ, দূরের দৃশ্যটা দেখছে। ঘৃণাভরে কাঁধ ঝাঁকাল সে, তারপর আবার ফিরল তক্তাটার দিকে, হাতে বাগিয়ে ধরে আছে তলোয়ারটা। তক্তায় আঁকা টার্গেটে হামলা করতে যাবে, হঠাৎ শুনতে পেল, 'স্টুপিড বাস্টার্ড! সারাটা দিন কাঁটা চামচ নিয়ে মরা কাঠের ওপর বীরত্ব ফলাচ্ছে!' ঝট করে মাথা ঘোরাল সে। দেখল, চোখে আগুন নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সোহানা।

ট্রেঞ্চের পাশে আরেকটা পাথর রাখল সোহানা, কোর্সিনেজের দিকে পিছন ফিরল। এক সেকেন্ড পর আবার গলাটা শুনতে পেল কোর্সিনেজ, 'অ্যামেচার আর বলে কাকে! তা না হলে সারাদিন ন'ঘণ্টা তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়! শালা কাপুরুষ!'

তক্তার দিকে ঘুরতে যাচ্ছিল কোর্সিনেজ, স্থির পাথর হয়ে গেল। গলাটা সোহানার, এতক্ষণে নিশ্চিত হলো সে। রাগে গরম হয়ে উঠল তার শরীর। প্রায় হোঁচট খেতে খেতে ছুটে এল সে, ট্রেঞ্চের কিনারায় থমকে দাঁড়াল, নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। 'আমাকে তুমি কিছু বললে?' তার গলায় অবিশ্বাস।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সোহানা, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর আরেকটা পাথর তোলার জন্যে ঝুঁকল।

ওর কাঁধের ওপর বাতাসে শিস কাটল তলোয়ারটা। 'আমাকে কিছু বললে তুমি?'

ছোট একটা লাফ দিয়ে ট্রেঞ্চ থেকে উঠে এল সোহানা, ওপার থেকে সরাসরি কোর্সিনেজের দিকে তাকাল, চোখ দুটো থেকে আগুন ঝরছে। পনেরো গজ দূরে একটা বোল্ডারের ওপর থেকে সিধে হলো একজন গার্ড, হাতের সাবমেশিনগান

সরাসরি সোহানার দিকে তাক করল।

মাথাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল কোর্সিনেজ। মেয়েটার আচরণে এমন কিছু একটা আছে, প্রচণ্ড ঘৃণা ও রাগে টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে তার রক্ত। 'কি বললে তুমি?' তীক্ষ্ণ, কর্কশস্বরে গর্জে উঠল সে।

ধীরে ধীরে রাগের ভাবটা সোহানার চেহারা থেকে মিলিয়ে গেল, যেন কোর্সিনেজ খেপে ওঠায় ভয় পেয়েছে ও। 'বোধহয় কিছু চিন্তা করছিলাম,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'তুমি শুনে ফেলেছ।'

'কি চিন্তা করছিলে?' ঘেউ ঘেউ করে উঠল কোর্সিনেজ।

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল সোহানা, চোখ মিটমিট করল বার কয়েক, তারপর অলসভঙ্গিতে একটা হাই তুলল।

অকস্মাৎ বিদ্যুৎবেগে তলোয়ার চালাল কোর্সিনেজ, চাবুকের মত। বাতাসে শিস কাটল ফলাটা। দেখা গেল, চোখের পলকে সরে গেছে সোহানা, সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে। ছুটে এল কোর্সিনেজ, পরমুহূর্তে আবার তলোয়ার চালাল। দ্বিতীয়বারও টার্গেটকে নাগালের মধ্যে পেল না সে।

লাফ দিয়ে ট্রেঞ্চের এপারে চলে এল কোর্সিনেজ, তার মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। শয়তান মেয়েটাকে আজ দু'টুকরো করে ফেলবে সে।

দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে সোহানা, উঁচুনিচু মাটির ওপর যেন একটা বিড়াল। হোঁচট খেতে খেতে সামনে বাড়ছে কোর্সিনেজ। এগিয়ে আসছে গার্ডটাও, চেহারায় অনিশ্চিত একটা ভাব, সাবমেশিনগানটা নিচের দিকে তাক করা। গোটা দৃশ্যটা যে-কোন মুহূর্তে বীভৎস হয়ে উঠতে পারে। সোহানা শান্ত, তবে অসম্ভব ক্ষিপ্র। কোর্সিনেজ রাগে ফুঁসছে, সোহানাকে নাগালে পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

হাত দুটো পিছনে সোহানার, পিছু হটছে, লাফ দিয়ে সরে যাচ্ছে একপাশে, প্রতিটি আঘাত এখনও এক-আধ ইঞ্চির জন্যে এড়িয়ে যাচ্ছে ও। দু'বার মরতে মরতে বেঁচে গেল সোহানা। তলোয়ারের সরু ডগা ছুঁয়ে দিল একবার ওর পাঁজর, আরেকবার ওর পা। সোহানা ধারণা করল, নিশ্চয়ই সব দেখতে পাচ্ছে পাইথন। অন্তত কোর্সিনেজের শেষ চিৎকারটা তার কানে না গিয়ে পারে না। হ্যাঙ্গেরিয়ান মেজর আবার ছুটে এল, নিজের ভাষায় গালিগালাজ করছে সোহানাকে।

পঞ্চাশ গজ দূর থেকে গম গম করে উঠল পাইথনের গলা, 'মেজর কোর্সিনেজ! ক্ষান্ত হও, ইফ ইউ প্লীজ।' কিন্তু আবার হিসহিস করে উঠল কোর্সিনেজের তলোয়ার আবার যখন কথা বলল পাইথন, মনে হলো অনেক কাছে চলে এসেছে সে, তবে গলাটা শান্ত ও কৌতুকময় লাগল সোহানার কানে। 'তোমার আবেগের রাশ টেনে ধরো, কোর্সিনেজ, তা না হলে তোমার মাথাটা পাথরে ঠুকে কাদা বানিয়ে ফেলব আমি।'

স্থির হয়ে গেল কোর্সিনেজ, হাঁপাচ্ছে, ধীরে ধীরে নিচু করল হাতের তলোয়ার।

এগিয়ে এল পাইথন, তাড়াহুড়ো করছে না, অথচ প্রকাণ্ড পা দুটো অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে দূরত্বটুকু পেরিয়ে এল। তার পিছু পিছু প্রায় ছুটে আসতে হলো

আশরাফকে, তবে মনে রেখেছে খোঁড়াতে হবে।

'ওহ্, ডিয়ার মি!' পাইথনের গলায় উল্লাস। 'কি ঘটছে এখানে? বীরোত্তম মেজর কোর্সিনেজকে অপমান, সোহানা চৌধুরী?'

সোহানার ওপর এখনও স্থির হয়ে আছে কোর্সিনেজের চোখ, চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। 'কুত্তীটা...আমাকে অপমান করেছে!' কথা বেধে যাচ্ছে তার মুখে।

'অসম্ভব!' কৃত্রিম আতঙ্কে শিউরে উঠল পাইথন। 'এ অসম্ভব!'

'আমি বলছি কুত্তীটা আমাকে অপমান করেছে!'

সোহানার দিকে তাকাল পাইথন। 'সত্যি? অভিযোগটা সত্যি? কোর্সিনেজের মত একজন বীরপুরুষকে তোমার মত একটা অবলা নারী কিভাবে অপমান করতে পারে? এ আমি কিভাবে বিশ্বাস করব!'

চোখের ওপর একটা হাত ঘষল সোহানা। 'ওর হাতের ওই তলোয়ারটা,' ওর গলায় তীব্র ঝাঁঝ। 'সারাদিন, প্রত্যেক দিন, বাতাসে শুধু নাড়ছে আর নাড়ছে! এ অসহ্য!'

কোর্সিনেজের গলার সব ক'টা রগ ফুলে উঠল। 'নাড়ছে? বাতাসে নাড়ছে?' গলার আওয়াজ শুনে মনে হবে বিস্ময়ে আহত বোধ করছে পাইথন, কিন্তু কুৎসিত মুখে হাসির কমতি নেই। 'মাই ডিয়ার সোহানা চৌধুরী, বিখ্যাত একজন ফেনসিং মাস্টার সম্পর্কে এ ভাষায় কথা বলা উচিত নয় তোমার।'

'বিখ্যাত কি?' সোহানার উচ্চারণ ভঙ্গিতে এমন ঘৃণা ঝরে পড়ল, শব্দ দুটো যেন ক্ষুরের মত ধারাল। হিসহিস করে শ্বাস টানল কোর্সিনেজ, তলোয়ারটা বিদ্যুৎবেগে মাথার ওপর তুলল সে।

পাইথন বলল, 'নো।' শান্ত নির্দেশ, কিন্তু হাতুড়ির বাড়ির মত আঘাত করল কোর্সিনেজকে। তলোয়ার নিচু করল সে, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখা গেল পেনিফিদারকে, একটা হাত ধরে জেনিকে টেনে আনছে সে। তার পাঁশুটে মুখে এখনও রোদ লাগেনি, পরনের সাদা শার্টটা সদ্য ইস্ত্রি করা। ধমকের সুরে জানতে চাইল, 'কি ঘটছে এখানে?'

'আমাদের সোহানা চৌধুরী মেয়েলি বদমেজাজের শিকার হয়ে পড়েছে,' সকৌতুকে বলল পাইথন। 'কোর্সিনেজের পারফরম্যান্স দেখে বেচারার মনে হয়েছে, ব্যাপারটা স্নায়ু-বিদারক। কিন্তু মেজর কোর্সিনেজের মনে হয়েছে, তাকে অপমান করা হয়েছে।'

ম্লান, নিষ্প্রাণ চোখ তুলে সোহানার দিকে তাকাল পেনিফিদার। 'কিল হার,' অকস্মাৎ নির্দেশ দিল সে। 'হারামজাদীর কোন কুমতলব আছে। কোর্সিনেজ, ঝামেলা শেষ কর—এই মুহূর্তে।'

'এটা কি তোমার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত?' সাগ্রহে জানতে চাইল পাইথন, যেন পেনিফিদারের সিদ্ধান্ত তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'তুমি ঠিক জানো, সোহানা চৌধুরী কোন ফন্দি আঁটছে?'

পেনিফিদার আবার বলল, 'কিল হার!'

'সত্যি কথা বলতে কি, সোহানা চৌধুরী বা মাসুদ রানা যদি কোন মতলব আঁটত, ভারি খুশি হতাম আমি,' খেদ প্রকাশের সুরে বলল পাইথন। 'কিন্তু না, আমাকে ওরা এত ভয় পায় যে কিছু করার কথা ভাবতেই পারছে না। আমার ধারণা, পেনিফিদার, তুমি একটু বেশি সন্দেহ প্রবণ হয়ে উঠেছ। নারী, ঈশ্বর ওদের ওপর করুণা বর্ষণ করুন, দুর্বল প্রজাতির জীব। এমন কি সোহানা চৌধুরীর মত নারীও, নেহাতই অবলা প্রাণী; বিশেষ করে আমি যেখানে উপস্থিত আছি। বাতাসে তলোয়ার নাড়তে দেখে তার নার্ভে টান পড়েছে। ব্যাপারটা নেহাতই হাস্যকর মেয়েলি দুর্বলতা নয় কি? আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এ-ব্যাপারে ফ্রয়েডীয় একটা ব্যাখ্যা না থেকেই পারে না।'

'কিল হার,' আবার হিসহিস করে উঠল পেনিফিদার, এবার তার গলায় রাগ। 'তুমিই মারো ওকে, পাইথন। এখুনি।'

মাথা নাড়ল পাইথন। 'কারও আনন্দ-ফুর্তিতে বাগড়া দেয়া উচিত নয়, পেনিফিদার। প্রতিটি অনুষ্ঠানের একটা সূচী থাকা দরকার। প্রথমে ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা, তারপর পরিস্থিতির উত্তেজক স্বাদ গ্রহণ, সবশেষে বিদায় সম্বর্ধনা। প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা পদ্ধতি ও কর্মসূচী থাকে। আমারটা কি, তুমি তা জানো। তাছাড়া, পেনিফিদার,' তার ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি, 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমের কথা কখনও ভুলো না। গুপ্তধন মাটির ওপর তোলা হলে তোমার নিজস্ব পদ্ধতিতে যা খুশি করতে পারো তুমি। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত কর্তব্য পালনের ধারায় আমি খানিকটা বৈচিত্র্য, স্টাইল ও জাঁকজমক আনতে চাই।'

রাগে পেনিফিদার কথা বলতে পারল না।

সোহানার দিকে তাকাল পাইথন। তার গলায় শান্ত বিনয়, 'যে-কোন বিচারে আমাদের মেজর কোর্সিনেজ দুনিয়ার অন্যতম সেরা সোর্ডসম্যান। তাকে তুমি ছোট করার চেষ্টা করেছ, তুচ্ছ বলতে চেয়ে উপহাস করেছ। এমন হতে পারে, এমন হওয়া কি আদৌ সম্ভব যে তার নৈপুণ্য ও দক্ষতা তুমি উপলব্ধি করতে পারোনি?'

হাত ঝাপটা দিয়ে ভুরু থেকে চুল সরাল সোহানা। 'ওর দক্ষতা বা নৈপুণ্য সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।' চট করে একবার কোর্সিনেজের দিকে তাকাল ও, তারপর নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। 'তবে আমার সন্দেহ আছে তক্তাটা এখনও কাটা হয়েছে কিনা। যদি হয়ে থাকে, তাহলে ওটারই একটা টুকরো দিয়ে মেরে তক্তা বানানো যায় ওকে।'

এক মুহূর্তের জন্যে নিস্তব্ধতা অটুট হয়ে থাকল। জেনির মুখ সাদা হয়ে গেছে, কোর্সিনেজের মুখও, তবে কারণটা আলাদা। মনে মনে চিৎকার করছে আশরাফ, 'ইয়াল্লা। সোহানা থামো, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ!'

তারপর, কোর্সিনেজ নড়ে উঠতেই, গলা ছেড়ে হেসে উঠল পাইথন। তার বিরাট, অবিশ্বাস্য লম্বা হাতটা ঝট করে সামনে বাড়ল, খপ করে ধরে ফেলল কোর্সিনেজের একটা কাঁধ। 'না! না, মেজর কোর্সিনেজ!' অদম্য হাসির ফাঁকে কথা বলছে সে। 'আমি স্বীকার করতে বাধ্য, স্বীকার না করে আমার উপায় নেই যে সোহানা চৌধুরী তোমাকে খোঁচাচ্ছে। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই এই অপমানের প্রতিশোধ

নিতে চাইবে উপযুক্ত পদ্ধতিতে, নয় কি?'

ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে পাইথনের দিকে তাকাল কোর্সিনেজ। খুনের নেশাটা চোখ থেকে মিলিয়ে গেল, তার বদলে দৃষ্টিতে ফুটে উঠল ব্যাকুল একটা আগ্রহ। 'উপযুক্ত পদ্ধতিতে?' খসখসে গলায় জানতে চাইল সে।

'তোমার কাছে তলোয়ার আছে দুটো, আমার বিশ্বাস।' কোর্সিনেজের কাঁধ থেকে হাতটা নামাল পাইথন 'ডুয়েল, মেজর কোর্সিনেজ। ভারি উপভোগ্য হবে বলেই আমার ধারণা। তোমাকে ধন্যবাদ দিতে হয়, কারণ তুমি আমার একটা সমস্যার সুন্দর সমাধান করে দিয়েছ। মাসুদ রানার বিদায়-সম্বর্ধনাটা কি রকম হবে, সে আমি ঠিক করে রেখেছি। কিন্তু সোহানা চৌধুরীকে নিয়ে কি করব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। ডুয়েল, ঠিক আছে? প্রায় অনুভব করতে পারছি তোমার ছোট্ট গোলাপী হৃৎপিণ্ডটা উল্লাসে লাফাতে শুরু করেছে, মেজর কোর্সিনেজ।'

ক্ষীণ ব্যঙ্গটুকু খেয়াল করল না কোর্সিনেজ, একদৃষ্টে সোহানার দিকে তাকিয়ে আছে সে, উত্তেজনায় ও উল্লাসে ঘামছে তার মুখ। 'কখন?' ফিসফিস করল সে।

চোখ তুলে আকাশটা একবার দেখে নিল পাইথন। 'দিনের আলো শেষ হয়ে এসেছে। তাছাড়া, ঠিক কি ঘটবে কল্পনা করার জন্যে আমাদের সবারই একটু সময় পাওয়া উচিত—আমি জানি, অপেক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত উত্তেজক হবে। আমি এইমাত্র সিদ্ধান্ত নিলাম, আজ সন্ধেবেলা ওদের যে যত্ন নেয়ার কথা ছিল, সেটা বাতিল করা হলো। সোহানা চৌধুরী আর তার বন্ধুরা যাতে আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য ডুয়েলের পরিণতি কল্পনা করে পুলকিত হবার সুযোগ পায়। তাহলে কাল, কেমন? কাল এই সময়ের এক ঘণ্টা আগে। প্রাচীন অ্যারেনায়, কেমন?'

এক পা সামনে বাড়ল পেনিফিদার। তার চোখের সাদা অংশটুকু রাগে লালচে হয়ে আছে। 'তুমি পাগল হয়ে গেছ, পাইথন,' কর্কশস্বরে বলল সে 'হতে পারে কোর্সিনেজ অন্যতম সেরা, কিন্তু তবু সোহানার হাতে খুন হয়ে যেতে পারে সে!'

আহত হবার ভান করল পাইথন। 'ওহ্ ডিয়ার মি, নো! মেজর কোর্সিনেজ ইস্পাতের জাল দিয়ে বানানো জ্যাকেট পরে থাকবে।'

পেনিফিদারের রাগ পানি হয়ে গেল, নিঃশব্দে হাসতে শুরু করল সে।

এখনও সোহানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কোর্সিনেজ, ওদের কথা শুনে তার চেহারায় আড়ষ্ট একটা ভাব ফুটল। 'না, প্রস্তাবটা আমি প্রত্যাখ্যান করছি। মেশ জ্যাকেট পরার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

'নেই যে আমি তা জানি,' একমত হলো পাইথন, হাসছে। 'তবু ওটা তুমি পরবে, কোর্সিনেজ, শুধু আমাকে খুশি করার জন্যে।'

'সব শালা কাপুরুষ!' হঠাৎ গমগম করে উঠল রানার ভরাট কণ্ঠস্বর। 'একটা মেয়ের সঙ্গে লড়তে বলছ ওকে, তোমাদের লজ্জা করছে না?' কোর্সিনেজের দিকে তাকাল ও, সোহানার পাশে এসে দাঁড়াল। 'সাহস থাকে তো আমার সাথে লড়ো, দেখব কেমন ফেনসিং মাস্টার তুমি।'

'রানা, তুমি চুপ করো!' দ্রুত বলল সোহানা, খপ করে একটা হাত ধরে ফেলল ওর।

'ওর চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম,' ঘোষণার সুরে বলল কোর্সিনেজ। 'তবে প্রথমে আমি কুত্তীটাকে উচিত শাস্তি দিতে চাই।'

হাতটা ঝাপটা দিয়ে ছাড়িয়ে নিল রানা, তাকিয়ে আছে কোর্সিনেজের দিকে। 'তুমি একটা বেজন্মা! একজন ভদ্রমহিলার সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় তাও শেখোনি। সাহস থাকলে আগে তুমি আমার সাথে লড়বে, তারপর যদি শক্তি থাকে তো সোহানার সাথে লড়ো।'

'না!' প্রতিবাদ করল সোহানা। 'বিরোধটা ওর সাথে আমার, তোমার সাথে ওর নয়, রানা। এটা আমার লড়াই, আমাকে লড়তে দাও।'

'এ-ব্যাপারে পেনিফিদারের বক্তব্য কি?' উৎফুল্ল পাইথন প্রশ্ন করল। 'শত্রু শিবিরে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, আমরা ওদেরকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'আমার ধারণা, রানাকে তুমি নিজের জন্যে রিজার্ভ রাখতে চাও। তোমার আনন্দে আর কেউ ভাগ বসাক, এ তুমি মানবে বলে মনে হয় না।'

'ধন্যবাদ, পেনিফিদার। আমার ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখানোয় তোমার ওপর খুশি আমি।' হাসছে পাইথন। 'সত্যি আমি দুঃখিত রানা—কোর্সিনেজের হাতে তোমার মৃত্যু নেই। তোমাকে মরতে হবে আমার হাতে। এটা তোমার নিয়তির লিখন, মেনে নাও।'

ধীরে ধীরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ছে সোহানা, রানার দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলল, 'প্লীজ, রানা!'

'এ তুমি কি করলে?' বলে ঘুরে দাঁড়াল রানা, কারও দিকে না তাকিয়ে নিজের কাজে ফিরে যাচ্ছে, কাঁধ ও ঘাড়ের পেশী লোহার মত শক্ত।

মৃত্যুর গন্ধ পেয়ে আর্কিওলজিকাল টীমের সদস্যরা সোহানার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। কমনরূমের দরজা বন্ধ হবার পর রাতের খাবার খেল ওরা, যে যার বিছানায় চুপচাপ শুয়ে পড়ল। মিসেস হোয়াইটস্টোন তাঁর স্বামীর বিছানায় বসে রয়েছেন।

ছোট কামরাটায় বসে রয়েছে আশরাফ, বিড়বিড় করে বলল, 'বলতে চাইছ আর কোন উপায় ছিল না?'

'ছিল না, আশরাফ, তোমাকে তো আগেই আমি বলেছি।'

'কিন্তু বলোনি একজন ফেনসিং ফ্যানাটিকের টার্গেট হবার মত বোকামি করতে যাচ্ছ! তুমি আর জেনি, এমনকি রানাও, অ্যাকুয়েডাক্ট দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারতে আজ রাতে। কিন্তু না, শুধু পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে রোমাঞ্চ কোথায়। যেচে পড়ে বিপদ ডেকে আনার মধ্যেই না বীরত্ব।'

হেসে ফেলল সোহানা। 'তোমার বুঝি তাই ধারণা?'

'আমি এর কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না! নিজেকে তুমি বিপদে ফেলছ, কিন্তু তাতে লাভটা কি হচ্ছে?'

'লাভ হচ্ছে এই যে এখান থেকে সবাইকে উদ্ধার করতে পারব আমরা।'

'কিভাবে, ব্যাখ্যা করো। আর সবাইকে মানেটা কি?'

'মানে হলো আমরা চারজন আর আর্কিওলজিকাল টিমের সদস্যরা।'

'কিভাবে?'

'কিভাবে সেটা তোমাকে শুধু রানা ব্যাখ্যা করে বলতে পারে,' জবাব দিল সোহানা। 'সবার দৃষ্টি আমার দিকে টেনে আনছি আমি, এটা আমার প্ল্যানের একটা অংশ বিশেষ। আমার ধারণা, রানারও একটা প্ল্যান আছে। দুটো প্ল্যানই সফল হওয়া চাই; তবেই আমরা সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারব।'

সোহানার বিছানাতেই বসে রয়েছে রানা, কিন্তু কারও দিকে তাকাচ্ছে না বা কথাও বলছে না। ওর দিকে তাকাল আশরাফ, তবে গম্ভীর চেহারা দেখে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না তার।

সোহানা বলল, 'সব কথা তোমার না জানাই ভাল, আশরাফ। ভান করতে না হলে তোমার আচরণ যেমনটি হওয়া দরকার ঠিক তেমনটি হয়। সত্যি বলছি। খানিক আগে আমি যখন কোর্সিনেজকে ফাঁদে ফেলছিলাম, তোমার চেহারাটা হয়েছিল মিলিয়ন পাউন্ড চুনির মত। তোমার ওই চেহারা দেখেই পাইথন বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা আমরা সাজাইনি।'

নিজের বিছানায়, মাথার পিছনে হাত রেখে শুয়ে রয়েছে সোহানা। আশরাফ বসে আছে জেনির বিছানায়, পাশাপাশি। শার্টের আস্তিন দিয়ে ভেজা মুখটা মুছল আশরাফ, আড়চোখে রানার দিকে তাকাল একবার। সরাসরি প্রশ্ন নয়, যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে, বিড় বিড় করল, 'কে জানে কাল এই সময় আমাদের মধ্যে সোহানা থাকবে কিনা।'

'স্টপ দ্যাট!' ধমক দিল সোহানা। 'কল্পনা শক্তিটাকে বরং অন্য কোন কাজে লাগাও, আশরাফ।'

শান্ত গলায় জেনি বলল, 'আমার এত ভয় লাগছে যে কথা বলতে পারছি না সব কিছু কেমন যেন এলোমেলো লাগছে। তবে বুঝতে পারছি, ঢিল একবার ছোঁড়া হয়ে গেছে, ওটাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। চেষ্টা করলেও এখন আর লড়াইটা বাতিল করা যাচ্ছে না। কাজেই সোহানাকে উত্যক্ত করাটা ঠিক হবে না, আশরাফ।'

মরিয়া হয়ে এবার সরাসরি রানার দিকে তাকাল আশরাফ। 'রানা, তুমি কিছু বলবে?'

'আরেকটু অন্ধকার হলেই অ্যাকুয়েডাক্টে নামব আমি,' শান্ত, থমথমে গলায় বলল রানা। 'আজ আমি অনেকক্ষণ থাকব ভেতরে। ফিরে এসে ধনুকের বাকি কাজটুকু শেষ করব। তুমি, আশরাফ, আমি যে ছুরিটা পেয়েছি সেটার জন্যে একটা হাতলের ব্যবস্থা করবে। হাতলটা কিভাবে ফলার সঙ্গে বাঁধতে হবে, দেখিয়ে দেব আমি। আরেকটা কথা, কাল তুমি খুঁড়িয়ে হাঁটার কথা মনে রেখো, তা না হলে সন্দেহ করবে পাইথন। জেনি, তোমারও একটা কাজ আছে। স্লিংটা দেখেছ তো? ওটার কিনারা চামড়া দিয়ে মুড়তে হবে।'

'বেশ, ঠিক আছে,' অধৈর্যভাবে হাত নাড়ল আশরাফ। 'কিন্তু আমি জানতে চাইছি, সোহানা কি কাজটা ভাল করেছে?'

'এখন আর সে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই,' বলল রানা। 'কাজটা কেন করেছে ও;

আমি জানি। তারমানে এই নয় যে এতে আমার সায় আছে। তবে তর্ক করে সময় নষ্ট করতে চাইছি না, কারণ একটা পর্যায় পর্যন্ত পরিস্থিতি আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। তোমাকে আমার একটা প্রশ্ন আছে, জেনি।'

'তার আগে আমারও কিছু বলার আছে।' সামনের দিকে একটু ঝুঁকল জেনি।

'বেশ, আগে তোমার কথা শোনা যাক।'

ক্লান্ত দেখাল জেনিকে। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সে, তারপর বলল, 'ব্যাপারটা খারাপ নাকি ভাল, বলতে পারছি না। তবে তোমাদের শোনা উচিত। কাল আমি ওদেরকে জানাব, গুপ্তধন পাওয়া গেছে।'

'গুপ্তধন পাওয়া গেছে!' প্রায় আঁতকে উঠল আশরাফ। 'কি করে জানলে তুমি?'

ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল রানার ঠোঁটে। 'তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, গুপ্তধন পেয়েছ কিনা। পেয়েছ যে বুঝলে কিভাবে?'

'শিরশির ভাবটা কাল ও আজ, দু'দিনই অনুভব করেছি আমি,' বলল জেনি। 'জমিনের শেষ অংশে, বাজার এলাকার এক কোণে।'

হঠাৎ কেউ কোন কথা বলল না, তারপর রানা জানতে চাইল, 'অনেক গভীরে?'

'না...খুব গভীর হলে এতটা শিরশির করত না। এখন বলো, কি করলে ভাল হয়?'

বিছানার ওপর উঠে বসল সোহানা, তাকিয়ে আছে রানার দিকে। কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, সবাই অপেক্ষা করছে। তারপর বলল ও, 'কিছুই গোপন কোরো না, জেনি। ওদেরকে জানাও। তবে একটা বিশেষ সময়ে জানাতে হবে ওদেরকে...এই ধরো, কাল ছ'টা বাজার কয়েক মিনিট আগে।'

বুকের ভেতর আশরাফের হৃৎপিণ্ড ছোট্ট একটা লাফ দিল। ছ'টার কয়েক মিনিট আগে! তারমানে সোহানার সঙ্গে কোর্সিনেজের লড়াই শুরু হবার কয়েক মিনিট বাকি থাকতে! জেনির ঘোষণা পাইথনের মনোযোগ কেড়ে নেবে। সেই মুহূর্তে বাকি আর কিছুরই কোন গুরুত্ব থাকবে না...।

'তাতে অবশ্য পাইথন তার পরিকল্পনা বাতিল করবে না,' বলল রানা, শূন্যে তাকিয়ে আছে, কথাগুলো যেন ওর চিন্তার অংশবিশেষ। 'সন্ধের খানিক আগে, কাজেই তখুনি মাটি খুঁড়তে চাইবে না সে... বিশেষ করে, জেনি, তুমি যদি বলো যে মাটির অনেকটা গভীরে আছে ওগুলো। হ্যাঁ, তাই বলবে। তুমি পেয়েছ, এতে সাংঘাতিক খুশি হবে সে। খবরটাকে সে অতিরিক্ত আনন্দ হিসেবে নেবে।'

আশরাফ অনুভব করল তার পেটের ভেতরটা মোচড় খাচ্ছে, বমির ভাবটা ঠেকাবার জন্যে দাঁতে দাঁত চাপল সে। বলল, 'কিন্তু ওদেরকে জানাবার দরকারটা কি?'

'সাথে সাথে ওদের দৃষ্টি আমাদের ওপর থেকে সরে যাবে। অন্য কোন ব্যাপারে তেমন মনোযোগ দেবে না। আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে এক বা দু'জন গার্ডও কমবে, কারণ পাইথন অবশ্যই বাজার এলাকায় পাহারার ব্যবস্থা

করবে, অন্তত পেনিফিদারকে সে বিশ্বাস করে না এ-কথা বোঝাবার জন্যে। আর সবার মত, পেনিফিদারকে খুঁচিয়েও আনন্দ পায় সে।'

জেনি বলল, 'পেনিফিদার চাইবে চারদিকে ইলেকট্রিক ল্যাম্প জেলে সারারাত মাটি খোঁড়া হোক।'

আশরাফের দিকে তাকাল রানা। 'হ্যাঁ। কিন্তু পাইথন তা চাইবে না। ভিক্টর ক্যানিঙের কাছ থেকে জেনেছে সে, আমাদের খোঁজে এখানে কেউ আসার আগে আনন্দ-ফুর্তি করার জন্যে অন্তত হপ্তা দুয়েক সময় পাবে সে। আর গুপ্তধন মাটির ওপর তোলা হয়ে গেলেই তার মাতব্বরি শেষ, দায়িত্ব তুলে দিতে হবে পেনিফিদারের হাতে। পাইথনকে আমি যতটুকু বুঝি, প্রথমে সে তার আনন্দটুকু পেতে চাইবে।'

ক্লান্ত দেখাল আশরাফকে। 'তার আনন্দ। হ্যাঁ। তুমি বোধহয় ঠিকই বলছ।'

কিছুক্ষণ আর কেউ কোন কথা বলল না। হঠাৎ লক্ষ করল আশরাফ, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। দৃষ্টিটা জেনির ওপর পড়ল, তারপর আবার ফিরে এল তার ওপর। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, একটা হাত ধরল জেনির। চেষ্টা করে এমন এক খুশির সুরে কথা বলল সে, মনে হলো যেন কত যুগ আগে এই সুরে কথা বলত। 'আমি স্যান্ড-বাথ নিতে যাচ্ছি। আমার পিঠে বালি ঘষে দেয়ার দুর্লভ সুযোগটা লটারিতে জিতে নিয়েছে মিস জেনি উডহাউস। ব্যবহার করা বালি পরে বিশ টাকা দরে প্রতি চামচ ভক্তদের মধ্যে বিক্রি করা হবে।'

মৃদু হাসির শব্দ বেরুল জেনির গলা থেকে, তবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফোঁপানোর আওয়াজে পরিণত হয়ে থেমে গেল সেটা। তাড়াতাড়ি বলল সে, 'দুঃখিত।' দ্রুত দাঁড়াল, আশরাফের হাত ধরে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

ওরা চলে যেতে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল সোহানা, চোখ বুজল। একটু পর বলল, 'ওদেরকে শান্ত রাখার দায়িত্বটা তোমার, রানা। কাজটা আমি করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু...।'

রানা কিছু বলছে না দেখে চোখ খুলল সোহানা। ওর মনে হলো, কথাটা শুনতে পায়নি। মাটির দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করছে রানা। একটু পর শান্ত গলায় বলল, 'বিপদটাকে আমার দিক থেকে নিজের দিকে টেনে নিলে, কিন্তু তাতে লাভটা কি হবে, সোহানা?'

'আমার ওপর রাগ কোরো না, প্লীজ। এ সবদিক থেকে ভাল হয়েছে। আমার ওপর কোর্সিনেজের কোন সাইকোলজিক্যাল ডমিনেশন নেই।'

মুখ তুলে সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'তলোয়ার তার প্রিয় অস্ত্র। ফেনসিং তার নেশা। কিন্তু তোমার শুধু শখ, সোহানা। এ-পর্যন্ত যত লোকের সাথে তুমি খেলেছ, তাদের সবার চেয়ে ভাল করবে'ও।'

'হ্যাঁ, ভাল একজন ফেনসার। তারমানেটা কি? জাস্ট ফিগার হাউ দ্যাট লিমিটস্ হিম।'

খুবই ধীরে ধীরে চিন্তার রেখাগুলো রানার মুখ থেকে মিলিয়ে যেতে শুরু করল। চোখে উদ্বেগের বদলে চকচকে একটা ভাব ফুটে উঠল। 'ভাল একজন

ফেন্সার মানে কেতাবের নিয়ম ধরে খেলবে ও।' সামান্য হাসল, তারপর নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ভুরু কোঁচকাল। 'কিন্তু হারামজাদা স্টীল জ্যাকেট পরে থাকায় বিরাট একটা সুবিধে পাবে। পারবে তো, সোহানা?'

'পারব কিনা তা আমি ভাবছি না,' বলল সোহানা। 'আমি জানি আমাকে পারতেই হবে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। আর সব কিছু বাদ দিলেও, সোহানার এই গুণটা গর্বিত করে তোলে ওকে। এই গুণের প্রয়োগ ঘটবার প্রয়োজন খুব কমই দেখা দেয়, তবে যখন দেখা দেয় তখন সোহানার মধ্যে কোন দ্বিধা থাকে না, থাকে না আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব। কাউকে খুন করা যখন একান্ত জরুরী হয়ে ওঠে, অত্যন্ত দক্ষ ও কৌশলী হয়ে ওঠে সোহানা। অনেকেই হয়তো ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারবে না, যারা কখনও অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। 'তোমার জায়গায় আমি লড়তে চাই, এ-কথা বলে এখন আর কোন লাভ নেই। ব্যাপারটা যখন ঘটিয়েই ফেলেছ, ধরে নাও তোমার প্রতি আমার সমর্থনই আছে। তবে, আমিও তৈরি থাকব।' কিসের জন্যে তৈরি থাকবে, খোলসা করে বলল না রানা, লড়াইয়ের আগে খারাপ দিকটা সোহানাকে মনে করিয়ে দিতে চাইছে না। 'আরেকটা কথা। যদি সুযোগ পাও, তোমাকে একটু অভিনয় করতে হবে।'

'কথা দাও ভাল হলে অস্কার পাব,' বসল সোহানা, রানার কাঁধে চিবুক রাখল।

'তার চেয়েও বড় পুরস্কার, আমরা সবাই পুনর্জীবন লাভ করব,' বলল রানা।

'বেশ। বলো, কি ধরনের অভিনয় করতে হবে? কার সাথে?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা, তারপর বলল, 'ক্রনেলের সাথে।'

'ক্রনেলের সাথে···' সোহানা নয়, হেসে উঠল ওর চোখ দুটো। 'ও, আচ্ছা। বুঝতে পারছি কি অভিনয় করতে হবে, কেন করতে হবে। এটাই তাহলে তোমার প্ল্যান!'

'পারবে?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'নির্ভর করছে টোপটা ক্রনেল নেয় কিনা তার ওপর। আমার ধারণা, নেবে। ওদের মধ্যে একমাত্র তার দৃষ্টিতেই নোংরামি লক্ষ করেছি আমি।'

'আমিও,' বলল রানা। 'সেজন্যেই কাজটা দিতে চাইছি তোমাকে।'

'এবার তোমার প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করো, রানা। আমি জানি, অন্যের লেখা হুবহু নকল করতে পারো তুমি।'

হেসে ফেলল রানা। 'তাহলে আর আমার ব্যাখ্যা করার থাকল কি, সবই তো বুঝে ফেলেছ।'

সোহানা জিজ্ঞেস করল, 'দুটো প্ল্যানই যদি সফল হয়, তাহলে কি ঘটবে?'

'কাল রাতে এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমরা।'

'সবাইকে নিয়ে?'

'হ্যাঁ, সবাইকে নিয়ে।'

অনেকক্ষণ আর কোন কথা হলো না। রানা সোহানার প্ল্যান নিয়ে চিন্তা করছে, সোহানা রানারটা নিয়ে। সোহানার প্ল্যানটা সফল হবে কিনা নির্ভর করছে

কালকের জীবন-মরণ লড়াইটার ওপর। কোর্সিনেজ খুন করবে সোহানাকে, নাকি সোহানা খুন করবে কোর্সিনেজকে।

ত্রিশ মিনিট পর অ্যাকুয়েডাকট্-এ নামল রানা। আশা করছে টানেল থেকে অপরপ্রান্তে বেরুতে পারবে ও, জরুরী কয়েকটা কাজও সেরে আসবে। এবারও কাপড় পরল না, তবে বড় একটা চাদর ছড়িয়ে নিল শরীরে, মুখে ছাই মাখল খানিকটা। অস্ত্র বলতে ছুরি, লোহার ছেনি, আর জোড়া লাগানো এক প্রস্থ রশি নিল রানা। ছেনিটা মাটি ও বালি সরাবার কাজে লাগবে।

মাত্র দুটো শাখা অ্যাকুয়েডাকটে এসে মিলিত হয়েছে, প্রথমবারের মত এবারও ওগুলোকে পাশ কাটাল রানা, মেইন চ্যানেলটা ধরে এগোল। ঘনঘোর অন্ধকারে দ্রুত এগোল ও, দু'মিনিট পরপর ত্রিশ সেকেন্ডের জন্যে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামল। অবশেষে বাধাটার সামনে এসে স্থির হলো।

মাটি আগেই সরিয়ে রেখে গেছে রানা, এবার হাত দিয়ে পাথর সরাতে শুরু করল। আলগা পাথর, সরাতে অসুবিধে হলো না, কিন্তু সংখ্যায় এত বেশি যে কোথায় রাখবে ভেবে পেল না ও। পিঠের ওপর দিয়ে যদি পিছন দিকে ফেলে, ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। খানিক চিন্তা করে শরীর থেকে চাদরটা খুলে ফেলল ও। নিজের সামনে ভাঁজ খুলল যতটা পারা যায়, আট-দশটা পাথর রাখল সেটার ওপর, চাদরে মুড়ে পিছু হটতে শুরু করল। তেমাথায় এসে শাখা অ্যাকুয়েডাকটের ভেতর ঠেলে দিল পাথরগুলো এভাবে চারবার আসা-যাওয়া করতে হলো ওকে। মেইন চ্যানেলের সামনে আর কোন পাথর নেই, তবে মাটি আছে, ছেনি দিয়ে সরাতে হবে।

দশ মিনিট মাটি সরাবার পর সামনে আরেকটা শাখা টানেল পেল রানা অন্ধকারে হাতড়ে বুঝল, মাটি ও পাথর এটা থেকে গড়িয়ে পড়ে মেইন চ্যানেলটাকে বন্ধ করে রেখেছিল। আরও কিছু মাটি ও পাথর সরিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে ও। সামনে যত দূর হাত যায়, আর কোন বাধা অনুভব করছে না। তবে অন্ধকার আগের মতই নিশ্ছিদ্র।

বিশ্রাম নেয়ার পর আবার ক্রল করে এগোল রানা। তিন কি চার মিনিট এগোবার পরই অন্ধকারের রঙ বদলে গেল। ভাল করে তাকাতে রাতের কালো আকাশে মিটমিট করতে দেখল কয়েকটা তারাকে। ওর আন্দাজ ভুল প্রমাণিত হয়নি, চ্যানেলটা একটা পাহাড়ী নালার ঢালু গা ফুঁড়ে বেরিয়েছে। চ্যানেলের মুখের কাছে ইঁটের গাঁথনিও আছে খানিকটা, নালার পানি যাতে চ্যানেলে ঠিকমত ঢুকতে পারে। প্রাচীন মাসের পৌর-কর্তারা সিস্টেমটাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করেই তৈরি করেছিল।

রাতের হিম বাতাসে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল রানা, মুক্তির আকস্মিক অনুভূতিটা পুলক ছড়িয়ে দিল শরীরে। এক মিনিট অপেক্ষা করার পর পাহাড়ের গা ঘেঁষে সাবধানে এগোল ও। মাসকে ঘিরে থাকা পাহাড়ের বাইরের দিক এটা।

চারদিক ঘুরেফিরে দেখতে দু'ঘণ্টা সময় নিল রানা, আরও সত্তর মিনিট লাগল

জরুরী কাজটা সারতে। প্রতিটি মুহূর্ত সতর্ক হয়ে থাকল, কারও চোখে ধরা পড়া চলবে না। এয়ারস্ট্রিপে কোন পাহারা নেই। তবে সেসনাটা রাতে যখন এখানে থাকে, তখন নিশ্চয়ই পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। উপত্যকার মুখে একজন গার্ড রয়েছে।

প্রথমে রানা সিদ্ধান্ত নিল গার্ডদের পালাবদলটা দেখে যাবে। সময়টা জানা দরকার। হাতে ঘড়ি নেই, তবে ওর সময়-জ্ঞান প্রখর, কখন ক'টা বাজে প্রায় নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারে। আড়াল থেকে গার্ডের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, দশ মিনিট পর্যন্ত লোকটাকে একবারও নড়তে না দেখে সিদ্ধান্তটা পাল্টাল। লোকটা সম্ভবত ঘুমাচ্ছে। কাজেই ওকে পাশ কাটিয়ে উপত্যকার ভেতর ঢোকার এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ।

তবে সত্যি সত্যি ঘুমাচ্ছে কিনা জানার জন্যে আরও কিছুক্ষণ দেখা দরকার। গার্ডের ওপর একটা চোখ থাকল, আশপাশটাও দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিল ও। উপত্যকার মুখ থেকে একশো গজ দূরে বড় একটা গুহা রয়েছে। প্রফেসর হোয়াইটস্টোন যখন আর্কিওলজিকাল টীম নিয়ে এখানে প্রথম আসেন, গুহাটাকে সম্ভবত জিনিসপত্র রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে তখন, উপত্যকায় ঢোকার পুরোটা পথ তখনও পরিষ্কার করা হয়নি। এখনও গুহাটাকে পেট্রল স্টোর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। খানিকটা এগোল রানা, গার্ডের ওপর চোখ রেখে। তারপর থামল। লোকটা এখনও নড়ছে না। আবার গুহার দিকে ফিরল ও। চাঁদের আলোয় গুহার ভেতরটা আবছাভাবে দেখতে পেল। অনেকগুলো ড্রাম রয়েছে, প্রতিটি ত্রিশ গ্যালনের। সব মিলিয়ে বিয়াল্লিশটা ড্রাম।

উৎসাহ বোধ করল রানা। বোল্ডারের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে আরও কিছুটা সামনে বাড়ল। গার্ডের কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছে, তবে এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছে। গুহার ভেতর কিছু নড়ছে না দেখে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। পেট্রলের গন্ধ পেল নাকে। ড্রামগুলোর পাশে চাকা লাগানো একটা পাম্প, হাত দিয়ে চালাতে হয়। এক জায়গায় অনেকগুলো বাঁশ, কুণ্ডলী পাকানো নাইলনের রশি ও অত্যন্ত হালকা রাবারাইজড নাইলনের ভাঁজ করা শীট-এর একটা স্তূপ, কিনারায় চোখ আকৃতির ফুটো। বোঝা গেল, প্রফেসর হোয়াইটস্টোন প্ল্যান করেছিলেন কাজ করার সময় তাঁর টীমের সদস্যরা যেন রোদ থেকে বাঁচতে পারে। এ-সব বিবেচনাবোধকে প্রশ্রয় দেয়নি পাইথন। গুহার ভেতর আরও রয়েছে একটা ট্রলি। নাকি ট্রেইলর? অন্ধকারে যতটুকু সম্ভব জিনিসটা পরীক্ষা করল রানা। ওটার ওপর হাত বুলাচ্ছে, নতুন একটা চিন্তা ঢুকল মাথায়।

ট্রলিই ওটা, তিনটে চাকার ওপর প্ল্যাটফর্মটা তেকোনা। চাকায় ওগুলো ডেজার্ট টায়ার। পিছনের চাকাদুটো বড়, সামনেরটা ছোট, বসানো হয়েছে একটা টিলার স্টিয়ারিং বার-এর নিচে। মজবুত অ্যাংগল-আয়রনগুলো জোড়া লেগে ত্রিভুজটার ডগা তৈরি করেছে, ওগুলোর মাঝখানে লম্বা একটা ফাঁপা পাইপের গোড়া পেল রানা, ভারা বাঁধার পোল-এর মত। ট্রলির চেসিস, অ্যাংগল-আয়রন ও পোল, এগুলো মিশ্র ধাতু দিয়ে তৈরি। অ্যাংগল-আয়রনের মাঝখানে একটা স্টীলের

পিন রয়েছে, সেটার ওপরই পাইপের গোড়াটা স্বচ্ছন্দে ঘোরে। বারো ফুট দৈর্ঘ্য ওটার, খাড়া করা যায়, ঘোরানো যায় যে-কোন দিকে, ব্রেসিং বার-এর সাহায্যে যে-কোন অবস্থানে স্থিরও করা যায়।

মেটাল পাইপের অপরপ্রান্তে হাত দিতে ব্লক ও পুলির অস্তিত্ব টের পেল রানা, বুঝল ট্রলিটাকে দু'ভাবে কাজে লাগানো হয়। সাধারণ একটা মোবাইল ডেরিক। বাহুটা উঁচু করা হলে, সেসনা থেকে অনায়াসে ট্রলিতে স্থানান্তর করা যায় কার্গো। চাকা ঘুরিয়ে যে-কোন জায়গায় নিয়ে আসা যায় ট্রলিটাকে নিরাপদে কার্গো নামাতে কোন সমস্যা হয় না।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। হ্যাঁ, জিনিসটা অদূর ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

এক প্রস্থ নাইলনের রশি হাতে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এল রানা, দেখল একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে বসে আছে গার্ড। আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করল ও। ব্যাটা নড়ছে না, ভাবল ও, স্রেফ অভ্যেসবশত নয় তো? তারপর ভাবল, যা থাকে কপালে, ঝুঁকিটা নেবে।

খুব সাবধানে এগোল রানা। ইতিমধ্যে রশিটা চাদরের ওপর গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে, হাতে চলে এসেছে ছুরিটা। লোকটাকে মারার কোন ইচ্ছে ওর নেই, প্রাণ রক্ষার জন্যে একান্ত বাধ্য না হলে। কাছাকাছি এসে দেখল, পাহাড় প্রাচীরের দিকে খানিকটা পিছন ফিরে বসে আছে লোকটা, তার পিঠ আর প্রাচীরের মাঝখানে চার-পাঁচ হাত ব্যবধান। লোকটার পিছনে চলে এল রানা। নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে, তবে ঠিক সেজন্যে রানার হাসি পেল না। হাসি পেল লোকটার আরাম পাবার আয়োজন লক্ষ করে। একটা বোল্ডারের ওপর বসে আছে সে, পা দুটো সামনে লম্বা করা। আরেকটা বোল্ডারে, মাঝখানটা ভেতর দিকে ডেবে আছে, হেলান দিয়েছে সে। অন্ধকারে দেখে মনে হলো, একটা ইজি-চেয়ারে আরাম করে শুয়ে আছে। ইচ্ছে করলেই তার কোলের ওপর পড়ে থাকা সাবমেশিনগানটা আলগোছে তুলে নিতে পারে রানা।

উপত্যকার মুখ গলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। পিছনে একটা চোখ, এগোচ্ছে সাবধানে। সরাসরি সামনেই ওদের কমনরূমের দরজা, দরজার কাছে টহল দিচ্ছে আরেকজন গার্ড। সম্ভবত ঘুম তাড়াবার জন্যেই দরজার সামনে পায়চারি করছে লোকটা। মাটির দেয়াল ঘেঁষে তার কাছ থেকে দূরে সরে আসছে রানা, যাচ্ছে প্রাচীন অ্যারেনার দিকে। কাল বিকেলে ওখানেই কোর্সিনেজের সঙ্গে অসি-যুদ্ধ হবে সোহানার।

চারদিকে ট্রেঞ্চের উঁচু পাড়, আবর্জনার স্তূপ, নুড়ি পাথর ও বালির উঁচু ঢাল, কাজেই আড়াল পেতে কোন অসুবিধে হলো না। অ্যারেনায় পৌঁছে রানা আন্দাজ করল, দশটার মত বাজে।

এক ঘণ্টা বিশ মিনিট পর গার্ড দু'জনকে ফাঁকি দিয়ে উপত্যকার বাইরে বেরিয়ে এল রানা। পাহাড়ী নালায় ফিরল না, আড়াল থেকে নজর রাখল প্রথম গার্ডের ওপর। পালাবদলের সময়টা জানা দরকার ওর।

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পর ছুটি পেল ঘুম-কাতুরে গার্ড।

ফিরতি পথে খুব একটা কষ্ট হলো না রানার, কারণ এবার অ্যাকুয়েডাকটের ভেতর প্রথমে মাথা ঢোকাতে পেরেছে ও। কমনরুমের গর্তের কাছে এসে দেখল, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে গর্তের কিনারায় বসে রয়েছে সোহানা, হাতে ধনুক, ছুরি দিয়ে চেঁচে আকৃতিটা নিখুঁত করার চেষ্টা করছে। দাঁড়াল সোহানা, রানার হাত ধরে টানেল থেকে বেরুতে সাহায্য করল। ইতিমধ্যে আশরাফ ও জেনি এগিয়ে এসেছে। সবাই রিপোর্ট শোনার জন্যে অপেক্ষা করে আছে বুঝতে পেরে মুচকি হাসল রানা, বলল, 'ভাগ্য সুপ্রসন্ন। লাভ তো হয়েইছে, বোনাসও পেয়েছি।'

অনেক কষ্টে প্রশ্ন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখল আশরাফ। জানে, ইচ্ছে না হলে তার কোন প্রশ্নেরই জবাব দেবে না রানা। তবে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল, রানার সঙ্গে চাদরটা নেই। সোহানার দেখাদেখি রানার গা থেকে জেনিও ধুলোবালি পরিষ্কার করছে। রানাকে ছোট কামরাটায় নিয়ে গেল সোহানা, স্যান্ড-বাথ করাবে। ধনুকটা এখন জেনির হাতে রয়েছে, কোথায় চাঁচতে হবে বলে গেছে সোহানা।

দশ মিনিট পর জেনিকে নিয়ে ছোট কামরায় চলে এল আশরাফ, ইতিমধ্যে স্যান্ড-বাথ সেরে কাপড়চোপড় পরে নিয়েছে রানা।

'আমি শোব কিসে?' ভেতরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল আশরাফ, কিন্তু কারও দিকে তাকাল না।

'মানে?' অবাক হয়ে মুখ তুলল সোহানা।

'সবার মত আমার বিছানাতেও একটা চাদর ছিল,' সোহানার দিকে ফিরল আশরাফ। 'কিন্তু অনেকক্ষণ হলো সেটাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'তুমি আমার বিছানার চাদরটা নিতে পারো,' বলল সোহানা।

'নেয়াটা বড় কথা নয়, প্রশ্ন হলো, আমারটা গেল কোথায়?'

হাত বাড়িয়ে রানার একটা কাঁধ ধরল জেনি। 'আশরাফ বলতে চাইছে, কি ঘটতে যাচ্ছে সব কথা আমাদেরকে বলা হোক। আমিও চাই কাল আসলে ঠিক কি ঘটবে আগে থেকে জেনে রাখি।'

'জেনি,' শান্ত গলায়, স্নেহের সুরে বলল রানা। 'সব কথা তোমাদের না জানাই ভাল। কেন ভাল, এ-কথা তোমরা হয়তো এখন বুঝবে না, কিন্তু কথাটা সত্যি। শুধু বিশ্বাস রাখো, আমি আর সোহানা যা করছি, সবার ভালর জন্যেই করছি। লক্ষ্মী বোন আমার, মন খারাপ করে না।'

অপ্রত্যাশিতভাবে 'লক্ষ্মী বোন' বলে আদর করায় অদ্ভুত একটা পরিবর্তন ঘটল জেনির চেহারায়। আনন্দে পানি এসে গেল তার চোখে। 'ঠিক আছে, বিশ্বাস করলাম, আমি আর কিছু জানতে চাইব না,' মৃদুকণ্ঠে বলল সে।

'আমিও বিশ্বাস করব, আর কিছু জানতে চাইব না,' গোঁ ধরার সুরে বলল আশরাফ। 'সোহানা যদি আমাকে লক্ষ্মী ভাই বলে!'

একযোগে হেসে উঠল সবাই, পরমুহূর্তে ঠোঁটে আঙুল রেখে শ্‌শ্‌ আওয়াজ করল রানা। 'চুপ, চুপ! বাইরে আওয়াজ গেলে ওরা দেখতে আসবে কি ঘটছে এখানে। চলো, পাথরের ফলকগুলো জায়গামত বসিয়ে দিয়ে আসি।'

'আমার শুধু একটা কথা ভেবে খারাপ লাগছে,' ওদের সঙ্গে ছোট কামরাটা থেকে বেরুবার সময় রানাকে বলল জেনি। 'সবাই যে যার সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করছে, একা শুধু আমিই কোন কাজে লাগছি না। নিজেকে আমার গুড ফর নাথিং বলে মনে হচ্ছে।'

'কাজে লাগছ না? অ্যাকুয়েডাকটা কে আবিষ্কার করল, আমি?' জানতে চাইল রানা। 'গুড ফর নাথিং অনেক পাব আমরা, এরপর তাদেরকে সাহায্য করবে তুমি। আপাতত তোমার কাজ হলো, আশরাফের দিকে লক্ষ্য রাখা।' শেষ কথাটা নিচু গলায় বলল রানা। 'সোহানার জন্যে খুব উদ্বেগের মধ্যে আছে সে। সবচেয়ে ভাল হয় তুমি যদি ওর গায়ে খানিকটা হেলান দাও—আক্ষরিক অর্থে বলছি না।'

'বুঝেছি কি চাও। সারাক্ষণ ওকে ব্যস্ত রাখব, তাই তো?'

'আমি চাই না কালকের ঘটনাটা নিয়ে বেশি চিন্তা করুক সে।'

কোর্সিনেজের ঘামের গন্ধটা মনে পড়ে গেল জেনির, শুনতে পেল তার তলোয়ারটা বাতাসে শিস কাটছে। 'আমি নিজেও তো চিন্তা করতে চাইছি না,' শুকনো গলায় বলল সে।

সকাল থেকে শুরু হলো প্রখর রোদ আর চাপা উত্তেজনা। উপত্যকার প্রতিটি অণু-পরমাণু যেন কি এক অজানা আশঙ্কায় অধীর হয়ে আছে। ক্রুনেলের মুখে হাসি ধরে না, শ্রমিকদের দুটো দলের মাঝখানে লাফ-ঝাঁপ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে সে, বাতাসে উড়ছে তার দোমড়ানো-মোচড়ানো জ্যাকেট। আগের মতই চুপচাপ রয়েছে পেনিফিদার, তবে চোখে ঠাণ্ডা একটা সন্তুষ্টির ভাব। আর পাইথনের চেহারায় অলস পরিতৃপ্তি, যেন পঙ্গু একটা ইঁদুরকে নিয়ে খেলছে শিকারী বিড়াল।

রানা ও সোহানা দল বদল করেছে, সোহানাকে কোর্সিনেজের কাছ থেকে দূরে রাখার জন্যে। ব্রেন-ওয়াশ-এর শিকার আর্কিওলজিকাল টীমের সদস্যরা সবাই খুব নার্ভাস। আলজিরিয়ান গার্ডরা একটু বেশি মাত্রায় সতর্ক, পরিবেশ থেকে একঘেয়ে ভাবটা দূর হতে যাচ্ছে বলে খানিকটা রোমাঞ্চিতও।

আশরাফকে পাইথনের সান্নিধ্যে মাত্র ঘণ্টাখানেক ভুগতে হলো, তারপর তাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো শ্রমিকদের একটা দলে, যাদের ওপর নজর রাখছে কোর্সিনেজ। আজকের জন্যে বরাদ্দ করা জায়গায় কাজ শুরু করল জেনি। জমিনের ওপর আজ সে লম্বালম্বিভাবে হাঁটছে না, হাঁটছে আড়াআড়িভাবে। ব্যাপারটা যদি লক্ষও করে থাকে পাইথন, কোন আপত্তি জানায়নি। এটাকেও একটা বোনাস বলা যেতে পারে। এর মানে হলো, দিনের শেষদিকে বাজারের কোনটায় পৌঁছুবে সে।

তারপর দুপুরের কর্মবিরতি শুরু হলো।

শুধু ঘুমোবার সময়টা ছাড়া ছোট কামরাটায় এখন আর দেখা যায় না মিসেস হোয়াইটস্টোনকে, ফলে ওটা শুধু ওরা চারজনই ব্যবহার করছে। খাওয়া-দাওয়ার দিকে মন নেই, ভেতরে ঢুকেই একটা ছুরিতে শান দিতে বসল আশরাফ। রানা বসল দুটো তীর নিয়ে।

জেনি বসেছে আশরাফের পাশে, একটা জ্যাকেট থেকে লম্বা লিনেন-এর সুতো

বের করে পাকাচ্ছে সে। জ্যাকেটটা আর্কিওলজিকাল টীমের এক সদস্যের কাছ থেকে চুরি করে এনে দিয়েছে আশরাফ। ধনুকের ছিলা হিসেবে নাইলন ব্যবহার করতে রাজি নয় রানা, কারণ টান পড়লে ওটা তত বেশি বাড়ে না। সবচেয়ে ভাল হত শণ পেলে। তার বদলে লিনেন দিয়ে কাজ চালানো হবে।

নিজের বিছানায় পদ্মাসনে বসে রয়েছে সোহানা। দেখে মনে হলো ঘুমাচ্ছে, যদিও চোখ দুটো খোলা, পাতাগুলো নড়ছে না শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ এত মন্থর যে বুকের ওঠা-নামা ধরা পড়ছে না চোখে।

সোহানার শারীরিক উপস্থিতি ও সচেতনতার অভাব প্রথমদিকে খানিকটা গা ছমছমে ভাব এনে দিয়েছিল আশরাফের মনে। তবে দশ মিনিট পর ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। সোহানার মুখের দিকে তাকিয়ে সে লক্ষ করল, ওর চেহারায় ধীরে ধীরে আশ্চর্য এক প্রশান্তি ফুটে উঠছে। সমস্ত চাপ ও উত্তেজনা, বোঝা ও উদ্বেগ মুক্ত হয়ে ওর মনটা যে পরিচ্ছন্ন ও হালকা হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারল সে। সোহানাকে কেউ বিরক্ত করছে না। কাজ করার সময় এটা-সেটা নিয়ে হালকা সুরে কথা বলছে রানা, পরিবেশটা যাতে স্বাভাবিক থাকে।

এক ঘণ্টা পর বড় করে শ্বাস নিল সোহানা, নড়ে উঠল শরীরটা। খোলা চোখে এতক্ষণে দৃষ্টি ফিরে এল। আড়মোড়া ভাঙল ও, হাই তুলল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

'কানে এল, তুমি নাকি নিজেকে কোন কম্মের নয় বলে মনে করছ, জেনি,' বলল ও। 'এসো, তোমার জাদুর কাঠিগুলো এবার কাজে লাগাও।'

'জাদুর কাঠি, সোহানা?' অবাক হয়ে সোহানার দিকে মুখ ফেরাল জেনি।

'তোমার আঙুল,' বলল সোহানা। 'আমার কাঁধ আর পিঠের পেশীগুলো ডলে দাও।'

আধ ঘণ্টা পর জেনিকে নিজের কাজে ফেরত পাঠাল সোহানা, রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার তীরগুলোর খবর কি, রানা?'

'ভেইনগুলোয় আঠা লাগাব এখন,' বলল রানা। 'সন্ধের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে।'

কাল ভোর রাতের দিকে দুঃস্বপ্ন ঠাসা ঘুম ভাঙার পর আশরাফ দেখেছে, পাথর আর লোহা ঘষে ছোট্ট একটা আগুন তৈরি করছে রানা। সেই আগুনে ট্রেঞ্চ থেকে সংগ্রহ করা প্রাচীন জীব-জন্তুর হাড়ের খুদে টুকরো আধ মগ পানিতে ফোটাতে শুরু করে ও। এখন, বারো ঘণ্টা পর, মগের নিচে পাতলা আঠার একটা প্রলেপ পড়েছে। রানার সামনে এই মুহূর্তে শুকনো খানিকটা উল দেখা যাচ্ছে। একটা পাথরের গায়ে লোহা ঘষে আগুন জ্বালার চেষ্টা করছে ও।

'ওই হাড় থেকে তুমি আঠা পাবে, আমার বিশ্বাস হয়নি,' বলল আশরাফ। 'অনেক কালের পুরানো, শুকিয়ে একেবারে খটখটে হয়ে গেছে।'

'পুরানো হলে শুধু চর্বি থাকে না,' বলল রানা। 'আমার জন্যে ভালই হয়েছে, চর্বিটুকু তো ফেলেই দিতে হত।' মগের ভেতর কয়েক ফোঁটা পানি ঢালল ও, তারপর আগুনের ওপর কয়েকটা শুকনো ডাল রাখল।

তীরগুলোয় ভেইন লাগাবার পর দশ মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর অ্যাকুয়েডাকটের মুখের কাছে চলে এল। টানেলের ভেতর অন্যান্য হাতিয়ারের সঙ্গে তীরগুলো লুকিয়ে রেখে ফিরে এল আবার, মিসেস হোয়াইটস্টোনের বিছানায় শুয়ে পড়ল। বলল, 'একটা মজার গল্প বলি শোনো।'

মধ্যাহ্ন বিরতির বাকি সময়টা হাসাহাসি করে কাটাল ওরা।

বিকেল যতই গড়াল, ততই বাড়ল উত্তেজনা। ছ'টা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি থাকতে বাজার এলাকায় শোরগোল শোনা গেল। কাছাকাছি শ্রমিকদলটার সঙ্গে কাজ করছে সোহানা, দেখল জেনিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে পেনিফিদার, ক্রুনেল ও পাইথন। ছুটে আসছে কোর্সিনেজও। পাইথন আর পেনিফিদারের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, কিছু কিছু কথা শুনতেও পেল সোহানা। গলা ছেড়ে হাসছে দানবটা। রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে পেনিফিদার।

'...ইলেকট্রিক ল্যাম্প জ্বালার ব্যবস্থা করলে আজ রাতেই আমরা মাটি খুঁড়তে পারি! তুমি আপত্তি করছ কেন?'

'...মুখ হাঁ করে থাকার স্বভাবটা তোমার গেল না, পেনিফিদার। না-না! আমরা শুরু করব কাল,' হাসির ফাঁকে বলল পাইথন।

অবশেষে আড়ষ্টভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পেনিফিদার। সোহানা দেখল, ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল পাইথন, তার গলা এবার পরিষ্কার শুনতে পেল ও। 'তাছাড়া, মেজর কোর্সিনেজকে তার প্রাপ্য আনন্দ থেকে আমরা বঞ্চিত করতে পারি না, পারি কি? নিজেকেও আমি বঞ্চিত করতে রাজি নই।'

সোহানার দিকে এগিয়ে এল পাইথন, তার লম্বা হাত দুটো দুলছে, থামল একেবারে ওর মুখের সামনে এসে। 'আজ তোমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, মনে আছে তো? আমাদের মেজর কোর্সিনেজ তোমার চারপাশে তলোয়ার নাড়বে। শুধুই বাতাসে কিনা, একটু পরই আমরা তা জানতে পারব, তাই না?'

সাত

ছোট্ট, গোলাকার অ্যারেনার বালি এখনও গরম হয়ে রয়েছে। সোহানার বাম দিকে, পাথরের নিচু একটা মঞ্চে বসে রয়েছে দৈত্যাকৃতি পাইথন, তার পাশে পেনিফিদারকে নিতান্তই খুদে ও নগণ্য দেখাচ্ছে। পেনিফিদারের রাগ ইতিমধ্যে পানি হয়ে গেছে। ব্যাপারটা উপভোগ করছে সে।

ওর ডানে, অ্যারেনার উল্টোদিকে, দু'সারি আসনে বসানো হয়েছে বন্দীদের। রানা বসেছে নিচের সারিতে, পা নেমে এসেছে অ্যারেনার বালিতে। রানা ও আশরাফের মাঝখানে বসে আছে জেনি। প্রফেসর হোয়াইটস্টোন আর তাঁর দল বসেছে ওপরের সারিতে। তারা কেউ কথা বলছে না, এমন কি নড়াচড়াও করছে

না। কি ঘটতে চলেছে ওরা কেউ তা জানে কিনা বলা কঠিন।

ভাঙাচোরা আসন সারির ওপর দিকে রয়েছে আলজিরিয়ান গার্ডরা। কয়েকজন বসে বসে সিগারেট ফুঁকছে। দু'জন দাঁড়িয়ে আছে, হাতের সাবমেশিনগান কক করা।

প্রাচীন মঁসে কখনও মল্লযুদ্ধ হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। ছোট্ট, পাঁচমেশালি একটা জনগোষ্ঠী নির্ভেজাল রোমান সার্কাস পছন্দ করত বলে মনে হয় না। অ্যারেনাটা সম্ভবত খেলাধুলোর কাজে ব্যবহার করা হত—দৌড়, ককফাইট, ট্রেনিং ও মক কমব্যাট। অদ্ভুতই বলতে হবে, ও আর কোর্সিনেজ এই প্রথম ও শেষবারের মত ডেথ-ডুয়েল লড়ছে এখানে।

হাতে তলোয়ার, অ্যারেনার উল্টোদিকে উদয় হলো ক্রুনেল। ধীরে ধীরে প্রস্তুতি নিল সোহানা। প্রথমে বুট জোড়া খুলে ফেলল পা থেকে। খালি পায়ে লড়তে চায় ও, কারণ আলগা বালির ওপর বুট পিছলে যেতে পারে। ও জানে, বালির নিচে রয়েছে কঠিন মাটি। এরপর গায়ের কালো চাদরটা সরাল। চাদরের নিচে পা ও উরু সম্পূর্ণ অনাবৃত ছিল ওর, পরে আছে ছোট্ট একটা শর্টস। গায়েও শুধু একটা ব্লাউজ, ব্রেসিয়ারের চেয়ে সামান্য একটু বড়। দেখে মনে হতে পারে আধুনিক কোন ফ্যাশন শো চলছে, সোহানা এসেছে মূলত দেহ প্রদর্শনের জন্যে। এতটা খোলামেলা হওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্রুনেল, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল দু'এক সেকেন্ড, তারপর বলল, 'তারমানে কি লোভনীয় টার্গেটগুলো অফার করছ তুমি ওকে?'

সোহানা জবাব দিল না।

ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল আবার ক্রুনেল। 'তুমি দেখছি কোর্সিনেজের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে।'

ঠাণ্ডা সুরে সোহানা বলল, 'আমি চাই না ক্ষতের ভেতর কাপড় বা সুতো ঢুকে পড়ুক।' অজুহাত হিসেবে শুনতে ভালই লাগল। ডুয়েলিং-এর প্রাচীন যুগে ক্ষতের ভেতর নোংরা কাপড় ঢুকে যাওয়ায় অনেক যোদ্ধা সংক্রমণের শিকার হয়ে মারা গেছে, সেজন্যেই সার্জেনরা প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরামর্শ দিত কোমর পর্যন্ত উদোম হয়ে লড়াই করার।

অশ্লীল ও দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ করল ক্রুনেল, তারপর বলল, 'হোলি গড! তুমি কি ধরে নিয়েছ প্রথমবার একটু রক্ত দেখা গেলেই ব্যাপারটার ইতি ঘটবে? কোর্সিনেজ তোমাকে ঝাঁঝরা করে ছাড়বে, সুন্দরী।'

সোহানা দেখল, ওর শরীরের ওপর লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ক্রুনেল। আগেই ক্রুনেলকে যৌন বিষয়ে অপরিণত স্কুলছাত্র বলে সন্দেহ হয়েছিল ওর, এখন তার আচরণ দেখে নিশ্চিত হলো। ওর গায়ে হাত দেয়ার, ওকে ছুঁয়ে দেখার ব্যাকুলতা থেকে বোঝা যায়, গির্জায় তাকে শেখানো হয়েছে নারীদেহ নিষিদ্ধ ও অপবিত্র বস্তু, কৈশোর ও যৌবনের শুরুটা কেটেছে কঠিন শাসনের বেড়াজালের ভেতর—সম্ভবত।

তলোয়ারটা সোহানার দিকে বাড়িয়ে ধরল ক্রুনেল, হাতলটা মুঠোর ভেতর রেখেছে যাতে ফলার দিকটা ধরতে বাধ্য হয় সোহানা, তারপর দ্রুত পিছিয়ে ওর নাগালের বাইরে চলে গেল। অত্যন্ত সতর্ক লোক সে। আগ্নেয়াস্ত্র তাক করা না থাকলে রানা বা সোহানার কাছাকাছি আসে না কখনও, অন্তত পাঁচ ফুট দূরে থাকে সব সময়। 'দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এক অর্থে ভারি লোভনীয় মাংসের অপচয় ঘটতে যাচ্ছে। সত্যি, খাসা একটা মাল। সান্ত্বনা এইটুকু যে, আমি পাচ্ছি না, আর কেউও পাচ্ছে না। কাজেই তোমার বিদায়পর্বটা সবার মত আমিও উপভোগ করব, সুন্দরী।' ক্রুনেলের হাসিটা আকস্মিক আক্রোশে ভরে উঠল, পেনিফিদার ও পাইথনের কাছে ফেরার জন্যে মঞ্চের দিকে ঘুরল সে।

তলোয়ারের হাতলটা মেরুদণ্ডের মত গিঁটবহুল, পিস্তল গ্রিপ ধরার ভঙ্গিতে আঙুলগুলো মোড়া যায়। ব্যালেন্স পরীক্ষা করার জন্যে বাতাসে সপাং সপাং আওয়াজ তুলল বার কয়েক, চোখের পলকে তলোয়ারটা জ্যান্ত হয়ে উঠল ঠিক যেন ওর হাতের বাড়তি একটা অংশের মত।

তীক্ষ্মমুখ ডগাটা হালকাভাবে বালিতে ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে সোহানা। চেহারা সম্পূর্ণ শান্ত ও ভাবলেশহীন। চিন্তা করার কিছু নেই ওর। কাজে লাগুক বা না লাগুক, রণকৌশল ওর এরইমধ্যে ঠিক করা হয়ে গেছে। কোর্সিনেজের রণকৌশল কি হবে সেটার ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু।

কোর্সিনেজ মিথ্যে গর্ব করে না, অবশ্যই অত্যন্ত ভাল একজন সোর্ডসম্যান সে। তার হাত লম্বা, কাজেই সহজে নাগাল পাবার একটা সুবিধে ভোগ করবে। দেখার বিষয় হলো, পাইথনের নির্দেশ অমান্য করে ইস্পাতের জ্যাকেট ছাড়াই যুদ্ধক্ষেত্রে সে আসবে কিনা। নিজেকে নিয়ে যদি যথেষ্ট গর্ব থাকে, তাহলে জ্যাকেটটা পরবে না। এতটা আশা করা উচিত হচ্ছে না, নিজেকে সাবধান করে দিল সোহানা নীচ, স্থূল ও বিবেকবর্জিত একদল অপরাধী ওরা, অন্যায় সুযোগ নিতেই অভ্যস্ত।

সোহানার রয়েছে দুটো সুবিধে। একটা হলো, প্রথম কয়েকটা এনগেজমেন্টে কোর্সিনেজ ওকে খুন করার চেষ্টা করবে না। ডুয়েলে তলোয়ার দিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পুরো ব্যাপারটা তার ভেতর উন্মত্ত একটা ব্যাকুলতার সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘ সময় ধরে উপভোগ করতে চাইবে সে। ধীরে-সুস্থে তার জানা সমস্ত নৈপুণ্য ও কৌশল ব্যবহার করবে। ছোট ছোট আঘাতের মাধ্যমে রক্তাক্ত করবে প্রতিপক্ষকে, দুর্বল করবে। শেষ আঘাতটা হানবে একেবারে শেষ দিকে। কোর্সিনেজের জন্যে ব্যাপারটা হবে প্রলম্বিত সঙ্গমের মত, যার সর্বশেষ পরিণতি চরম পুলক।

কাজেই হাতে সময় পাবে সোহানা, যে সময়টা দ্বিতীয় সুবিধে ভোগ করার সুযোগ এনে দেবে ওকে। কোর্সিনেজ নিশ্চয়ই ফেনসিংকে একটা শিল্প মাধ্যম বলে গণ্য করে সারা জীবন নিয়ম ধরে চর্চা করেছে, নিয়মের বাইরে না যাবার প্রবণতা তার ভেতর থাকাটা স্বাভাবিক। এলোপাতাড়ি ও বিশৃঙ্খলভাবে তলোয়ার চালাতে দেখলে খেপে যাবে সে।

সোহানা নিয়মের খুব একটা ধার ধারবে না, সুযোগ পেলে সেটা নিজের

সুবিধেমত সদ্ব্যবহার করবে। অবশ্য এটা উপলব্ধি করতে খুব বেশি সময় নেবে না কোর্সিনেজ, ফলে নিয়মবহির্ভূত কৌশলের জন্যে তৈরি থাকবে সে। তবে যতই সতর্ক হোক, খানিকটা অস্বস্তি তাকে ভোগ করতে হবে।

ক্রুনেলের আওয়াজটা শুনতে পেল সোহানা। 'আহ্।'

মাথা ভাঙা পাথরের স্তম্ভগুলোর মাঝখান দিয়ে বীরদর্পে হেঁটে আসছে কোর্সিনেজ। এককালে অ্যারেনার প্রবেশপথে স্তম্ভগুলো খিলানের কাঠামো তৈরি করেছিল সাদা ব্রীচ, ফেনসিং শু ও ইস্পাতের জাল দিয়ে তৈরি মেশ জ্যাকেট পরে আছে সে। জ্যাকেটটা তার উরু পর্যন্ত নেমে এসেছে। হাতে সোহানার মতই একটা তলোয়ার। পাথুরে আসন থেকে ফিসফিস করল জেনি, 'কি ঘটছে?' হাতড়াল সে, রানার হাতটা পেয়ে আঁকড়ে ধরল।

'কোর্সিনেজ,' বলল রানা, ঠোঁট প্রায় নড়লই না। 'যে-কোন মুহূর্তে শুরু হবে এবার। কথা বলো না, জেনি।'

জেনির অপরপাশে বসে রয়েছে আশরাফ, অ্যারেনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এক সেকেন্ডের জন্যে তার দিকে তাকাল সে। উত্তেজনায় ও উদ্বেগে বিকৃত হয়ে আছে মেয়েটার মুখ। কথা বলতে পারল না আশরাফ, তার শরীরের প্রতিটি নার্ভ লাফাচ্ছে। রক্তশূন্য ও অসুস্থ বোধ করছে সে। মুহূর্তের জন্যে জেনি অন্ধ বলে ঈর্ষা হলো তার। এখন যা ঘটবে তা দেখতে না হলেই ভাল হত, কারণ নরকযন্ত্রণার চেয়ে কম নয় ব্যাপারটা। অথচ চোখ ফিরিয়ে রাখাও অসম্ভব। বোধহয় সেজন্যেই জেনির জন্যে ব্যাপারটা আরও বেশি ভয়ঙ্কর—সমস্ত শব্দ তার কানে ঢুকবে, অনুভব করবে উত্তেজনাটুকু, তার আশপাশে দর্শকরা দম বন্ধ করলে আওয়াজ পাবে সে, কাঁদলে শুনতে পাবে, অথচ কিছুই দেখতে পাবে না, জানতে পারবে না ঠিক কি ঘটছে। তবে কল্পনা করতে পারবে। কিন্তু মানুষ সাধারণত খারাপটাই আগে কল্পনা করে। কি ঘটতে পারে কল্পনা করার চেষ্টা করল আশরাফ। সঙ্গে সঙ্গে বমি পেল তার।

আবার সোহানার দিকে তাকাল আশরাফ। শারীরিক কাঠামোর কিনারা অ্যাথলেট-এর মত দৃঢ়, নিরেট ও সুন্দর। ওর বুক টান টান হয়ে আছে, উঁচু ভাবটুকু প্রকট নয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বুকের ওঠা-নামাও চোখে প্রায় ধরা পড়ছে না। ধীর, দৃঢ় পদক্ষেপে অ্যারেনার মাঝখানে চলে আসছে ও।

স্থির একটা মূর্তির মত বসে রয়েছে রানা, সামনের দিকে ঝুঁকে, পা দুটো লম্বা করে দিয়েছে অ্যারেনার বালির ওপর, একটা হাত দুই উরুর মাঝখানে কব্জি পর্যন্ত ঢোকানো, অপর হাত ধরে আছে জেনির কব্জি। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ও, তাকিয়ে আছে সোহানার দিকে। চেহারায় কোন ভাবাবেগ নেই।

অ্যারেনায় পৌঁছুল কোর্সিনেজ, সোহানার কাছ থেকে দশ ফুট দূরে দাঁড়াল। তারপর মঞ্চের দিকে ঘুরল সে, স্যালুটের ভঙ্গিতে নাকের সামনে খাড়া করল তরোয়াল, ভঙ্গিটা না বদলে আবার ঘুরে মুখোমুখি হলো সোহানার। সোহানার শরীরে কাপড়ের অভাব তাকে যদি বিস্মিত করে থাকে, চেহারা দেখে কিছু বোঝা গেল না।

শান্তস্বরে, কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে সোহানা বলল, 'লাভলি স্টাইল। এবার চেষ্টা করো ওটা বুকে গেঁথে আত্মহত্যা করতে পারো কিনা। একটা মেয়ের হাতে মারা যাবার চেয়ে ভাল হবে সেটা।'

খিক্ খিক্ করে হেসে উঠল পেনিফিদার। হাসির দমকে ঝাঁকি খেল পাইথন।

প্রথমে হতভম্ব হয়ে পড়ল আশরাফ, পরমুহূর্তে উপলব্ধি করল, কথাটা হিসেব করেই বলেছে সোহানা। অপমানটা করা হয়েছে তলোয়ারটাকে, কোর্সিনেজকে নয়। প্রতিপক্ষকে খেপিয়ে তুলে দিশেহারা করার চেষ্টা।

জ্যান্ত প্রাণীর মত কিলবিল করে উঠল কোর্সিনেজের মুখের পেশী। কথা বলল না, ধীরে ধীরে ভাঁজগুলো অদৃশ্য হলো মুখ থেকে। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সোহানার শরীরের ওপর চোখ বুলাল সে, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে, অপারেশন শুরু করার আগে একজন সার্জেন যেন দেখে নিচ্ছে কোথায় ছুরি চালাবে।

ভরাট গলা শোনা গেল পাইথনের, 'আমাদেরকে অপেক্ষা করিয়ে রেখো না, প্লীজ।'

ফলা খাড়া করল কোর্সিনেজ, নিচু হয়ে অন-গার্ড পজিশনে আনল শরীরটাকে। দেখাদেখি সোহানাও। দুটো তরোয়াল এক হয়ে একটা ক্রসচিহ্ন তৈরি করল।

ফেনসিং-এ প্রথমবার দুটো ফলা এক হলে শক্তি বা সচেতনতার একটা প্রবাহ বয়ে যায় প্রতিপক্ষদের শরীরে, ইলেকট্রিক কারেন্টের মত। নরম ও এক পলকের প্রথম এনগেজমেন্টেই বুঝতে পারল সোহানা, এমন একজন ফেনসিং মাস্টারের মুখোমুখি হয়েছে সে, যার দক্ষতা প্রশ্নাতীত, সমস্ত কৌশলই যার শেখা আছে।

তারপর আর চিন্তা করার সময় পাওয়া গেল না। এমন প্রচণ্ড শক্তি ও দ্রুতবেগে আক্রমণ করল কোর্সিনেজ যে ঠেকাবার পর আর পাল্টা আঘাত হানার সুযোগ পেল না সোহানা। ঠেকাচ্ছে সোহানা যথাসম্ভব কম শক্তি ব্যয় করে, যতটুকু সম্ভব তলোয়ারটাকে কম ঘুরিয়ে। এ-ছাড়া কোন উপায়ও নেই ওর, কারণ ওর তলোয়ারের ওপর কোর্সিনেজের আঘাত, এনগেজমেন্ট ও রিডাবলস এমন চোখ ধাঁধানো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একের পর এক আসছে যে প্রতিমুহূর্তে পিছু হটতে হলো, শুধুই ঠেকাচ্ছে, চেষ্টা করছে দুই তলোয়ারের মাঝখানে যতটা সম্ভব বেশি ব্যবধান রাখতে।

পিছু হটতে হটতে এরইমধ্যে সীমার বাইরে চলে এসেছে সোহানা এখানে নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই বটে, কিন্তু গোলাকার অ্যারেনার শেষ মাথায় আসনের সারিটা নিচু দেয়ালের মত—সোহানা বুঝতে পারল, দেয়ালটার কাছাকাছি চলে এসেছে ও। কোর্সিনেজের বেপরোয়া আক্রমণের মুখে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল এবার।

লাঞ্জ, রিপ্রাইজ, রিডাবলমেন্ট, রিকভারি—কোর্সিনেজের রিকভার বিস্ময়কর, স্যাৎ করে পিছিয়ে অন-গার্ড পজিশনে চলে আসে, যেন কোন চেষ্টা ছাড়াই, যেন একটা স্প্রিঙ টেনে নিচ্ছে তাকে। আবার পিছু হটতে বাধ্য হলো সোহানা, অকস্মাৎ দুই পা এক করে সামনের দিকে লাফ দিয়েছে কোর্সিনেজ। পরমুহূর্তে যে

আক্রমণটা এল, মনে হলো কোর্সিনেজের শরীর, বাহু ও ফলা সমস্ত সম্ভাবনার মাত্রা ছাড়িয়ে বিস্তৃতি লাভ করছে।

নিজেকে কোর্সিনেজের নাগালের বাইরে বলে মনে করেছিল সোহানা, ফলে ঠেকাতে এক পলক দেরি হয়ে গেল ওর, তরোয়ালের ধারালো ডগা ওর উরুর বাইরের দিকটা ছিঁড়ে দিল। ভারসাম্য ফিরে পেল কোর্সিনেজ, পিছু হটে নাগালের বাইরে চলে গেল। সোহানার উরুতে লাল রেখাটা ক্রমশ চওড়া হচ্ছে, দেখল সে, হেসে উঠল শব্দ করে, তারপর পিছন ফিরল, হেঁটে আরও দূরে সরে আসছে, কাঁধের ওপর দিয়ে লক্ষ রাখছে সোহানার ওপর।

আহত পা-টা কয়েকবার ভাঁজ করল সোহানা, পেশীর কোন ক্ষতি হয়নি। ঘামে সারা শরীর চকচক করছে, হেঁটে ফিরে এল অ্যারেনার মাঝখানে, ওর জন্যে ওখানে অপেক্ষা করছে প্রতিপক্ষ। নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়নি ও। অসি-যুদ্ধে বেশিরভাগ আঘাত আসে বাহুর ওপর, তলোয়ার ধরা হাতের ওপর। কোর্সিনেজের লক্ষ্যও ছিল ওই হাতটাকে জখম করা। কিন্তু তাকে অন্তত সোহানা বাধ্য করেছে প্রথম রক্ত অন্য কোথাও ঝরাতে। ছোট্ট হলেও, খুশির আরও একটা খবর আছে। আক্রমণটার উদ্দেশ্য ছিল পেশী ভেদ করা, কিন্তু সোহানার উরুতে শুধু একটা আঁচড় কাটতে পেরেছে প্রতিপক্ষ।

আরও একটা ব্যাপার হলো, দর্শকদের মুগ্ধ করার ও সেই সঙ্গে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করার জন্যে কোর্সিনেজ তার বাহুবল, গতি ও কৌশল প্রদর্শনের চেষ্টা করছে। আক্রমণে সফল হবার জন্যে দ্রুতগতি খুবই দরকার, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী একটা লড়াইয়ে দ্রুতগতি বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না। বিশেষ করে কোর্সিনেজ যে গতিতে আক্রমণ করছে, কোন মানুষের পক্ষে বেশিক্ষণ এই গতি বজায় রাখা সম্ভব নয়। তবু নিঃসন্দেহে বলা যায়, লড়াইটা যদি নিয়ম-বাঁধা পদ্ধতিতে চলতে থাকে, সোহানাকে নির্ঘাত খুন করবে সে। বর্তমান পদ্ধতিটা আরও কিছুক্ষণ চালু রাখা দরকার, সোহানা চাইছে প্রতিপক্ষ নিশ্চিতভাবে বুঝুক এই পদ্ধতিতেই খেলা চলবে। ওর কাজ হলো, মধ্যবর্তী এই সময়টা বেঁচে থাকার চেষ্টা করা

পজিশন নিল সোহানা, আবার এনগেজ হলো তলোয়ার। এবার নিজের তলোয়ার বৃত্তাকারে ঘোরাতে শুরু করল কোর্সিনেজ। এ তার আক্রমণ করার ভান মাত্র, পাল্টা আঘাত হানার জন্যে প্ররোচিত করতে চাইছে সোহানাকে, ওর ফলাটা যাতে নাগালের মধ্যে পায়, পেলেই আঘাত হেনে হাত থেকে ওটাকে খসাবার চেষ্টা করবে। তবে এবার গতি খানিকটা মন্থর হওয়ায় শুধু আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর না করে কমব্যাট ব্রেনটাকে কাজে লাগাবার সুযোগ পেল সোহানা।

প্রতিপক্ষের ফলার সঙ্গে সাবধানে খেলল সোহানা, প্রতি মুহূর্তে ওটার গতিবিধি লক্ষ করছে, মাপ রাখছে ক্ষিপ্রতার, চিহ্নিত করছে আক্রমণের হুমকিগুলো, একবারও নাগালের মধ্যে যাচ্ছে না। কৌশলটায় কাজ হচ্ছে না দেখে ঘন ঘন আঘাত হানতে শুরু করল কোর্সিনেজ, নিজের দৈহিক শক্তির সুবিধেটুকু কাজে লাগিয়ে সোহানাকে ক্লান্ত করতে চাইছে। হাত ও ফলা এমন একটা লাইনে রাখল সোহানা, ওর তরোয়ালের শুধু ডগার দিকটা নাগালের মধ্যে পেল

কোর্সিনেজ, ফলে জুতসই কোন আঘাতই করতে পারল না সে।

এই পর্বে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারল সোহানা। সবচেয়ে বড় লাভ, কোর্সিনেজের বিশেষ ছন্দটি ধরে ফেলেছে ও। ঘন ঘন আক্রমণের সময় তার গতি ও ক্ষিপ্রতা কখন কতটুকু কমে-বাড়ে, জানা হয়ে গেছে।

চওড়া পাথুরে আসনে বসে প্রথম পর্বের লড়াই দেখার সময় অসুস্থবোধ করছিল আশরাফ, আরেকটু হলে বমি করে ফেলত। এই মুহূর্তে প্রায় নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে তাকে, ঘামে ভিজে গেছে মুখটা। খামচে ধরা বাহুতে ঢুকে গেছে নখগুলো।

ফলার সংঘর্ষে আওয়াজ হচ্ছে, সেগুলো শুনে মনে মনে ছবি আঁকছে জেনি, পরমুহূর্তে ছবিগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করছে; ফলার আওয়াজ কান থেকে বের করে দিলে শুনতে পায় আশরাফের গোঙানি, কিংবা রানার নিঃশ্বাস-পরিবর্তনের শব্দ। রানার শক্ত মুঠোয় ব্যথা করছে তার হাত, রানা প্রায় ভেঙে ফেলছে ওটাকে। তবু কিছু বলছে না জেনি। মন থেকে ছবিগুলো মুছে ফেলার জন্যে সাহায্য করছে ব্যথাটা।

সেই একই ভঙ্গিতে পা দুটো লম্বা করে দিয়ে বসে আছে রানা, শুরু থেকে এখন পর্যন্ত এক চুল নড়েনি, নড়েনি চোখের পাতা বা মুখের একটা পেশী। তবে এখন ওর চোখে উত্তেজনার চকচকে একটু ভাব ফুটে রয়েছে; প্রথম দিকে ক্ষিপ্র হামলাগুলো ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ওকে, তবে সে পর্বটা শেষ হয়েছে। লড়াই যত দীর্ঘ হবে, ততই বাড়বে সোহানার সুযোগ। হতে পারে কোর্সিনেজ দুনিয়ার অন্যতম সেরা ফেন্সার, কিন্তু ফেনসিং কমব্যাট-এর একটা ধরন মাত্র। কমব্যাটে সবচেয়ে যেটা জরুরী, শত্রুকে চিনতে পারা। রানা জানে, দু'মিনিটে কোর্সিনেজকে যতটুকু চিনতে পারবে সোহানা, সোহানাকে ততটুকু চিনতে কোর্সিনেজের লাগবে দু'হপ্তা।

আবার আক্রমণ করল কোর্সিনেজ, এবার ঠাণ্ডা মাথায় নিখুঁতভাবে। পিছু হটল সোহানা, তবে এবার জায়গা ছাড়ছে থেমে থেমে, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ না হারিয়ে; ঠেকানোর পরপর পাল্টা আঘাত খুবই কম করল, যা-ও বা করল তা শুধু এক্সপেরিমেন্টের জন্যে, ঠিক ক্ষতি করার জন্যে নয়। নিজে অরক্ষিত, কাজেই দ্রুত ছুটে গিয়ে হামলা করাটা হবে পাগলামি, বিশেষ করে ওর একমাত্র টার্গেট যখন কোর্সিনেজের মাথা ও বাহু।

পরের পর্বটা দীর্ঘ ও দর্শনীয় হলো, কোর্সিনেজের প্রতিটি আঘাত সৌন্দর্যমণ্ডিত ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। সাড়া দিল সোহানা, উৎসাহিত করতে চাইছে, জানে নিজের নৈপুণ্য দেখাতে পেরে গর্ববোধ করছে প্রতিপক্ষ। দু'বার তার ডগা টার্গেট স্পর্শ করল। অবশেষে সোহানা যখন লাফ দিয়ে নাগালের বাইরে চলে এল, দেখা গেল ওর ডান স্তনের ওপরে লাল একটা ফুল ফুটেছে, আর কুৎসিত একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, পাঁজর বরাবর।

চোখ সরু করে সোহানাকে এক মুহূর্ত দেখল কোর্সিনেজ, কর্কশ চেহারায় আক্রোশ মেশানো ক্ষীণ শ্রদ্ধার ভাব। তারপর অন-গার্ড পজিশনে চলে এল সে,

আচরণে আশ্চর্য একটা কর্তৃত্বের ভাব।

তরোয়াল এনগেজ করল সোহানা, এবং এই প্রথম আক্রমণে গেল। সামান্য বিস্মিত হলো কোর্সিনেজ। সোহানা চেষ্টা করল তার ফলাটাকে ঢেকে ফেলতে। কোর্সিনেজের আঙুল ও কব্জির প্রচণ্ড শক্তির কথা মনে রাখলে, কৌশল হিসেবে এটাকে ভাল বলা চলে না, তবে সব ধরনের কমব্যাট মুভমেন্টে চরম মুহূর্ত বলে একটা ব্যাপার থাকে, যখন মন মাথা পেশী ও লক্ষ্য এক হওয়ার জন্যে অদম্য হয়ে ওঠে।

অল্প পরিসরে ঘুরন্ত সোহানার তরোয়ালের ওপরের অংশ আঘাত হানল, আঘাত হানল প্রতিপক্ষ অস্ত্রের সবচেয়ে দুর্বল অংশে, ডগা থেকে খানিক ওপরে। নিজের অস্ত্র দিয়ে কোর্সিনেজের অস্ত্র আটকে ফেলল সোহানা, আটকে নিয়ে টান দিল, ঝাপটা খেয়ে আরেকদিকে ঘুরে গেল তলোয়ারটার ডগা। কোর্সিনেজের প্রতিক্রিয়া হলো প্রবৃত্তিবিরুদ্ধ, কারণ সেটা নিয়মের বাইরে। তবে যথেষ্ট দ্রুতই হলো প্রতিক্রিয়া। এখন পিছু হটলে অরক্ষিত হয়ে পড়বে সে, ফলে আক্রমণ করার সুবর্ণ সুযোগটা ছাড়বে না সোহানা। তার বদলে সামনে বাড়ল সে, দুটো শরীর প্রায় এক হয়ে গেল।

এক মুহূর্ত সম্পূর্ণ স্থির হয়ে থাকল ওরা, দুটো মুখের মাঝখানে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ব্যবধান, হাতলের মাথায় সেঁটে আছে দুটো ফলা, খাড়াভাবে ওপর দিকে তাক করা। ঠিক এই সময় একটা হাঁটু ভাঁজ করে ওপরে তুলল সোহানা, সমস্ত শক্তি দিয়ে গুঁতো মারল কোর্সিনেজের দুই উরুর সন্ধিতে।

ওর একটা সন্দেহ সত্যি কিনা দেখতে চেয়েছিল সোহানা। আঘাতটা লাগার সঙ্গে সঙ্গে বুঝল, তলপেটের নিচেটা সুরক্ষিত করার জন্যে একটা কিছু পরে আছে কোর্সিনেজ, সম্ভবত তেকোনা বাক্স আকৃতির একটা কিছু, প্লাস্টিকের তৈরি। ভাঁজ করা হাঁটু ভেতরে ঢুকে গেল, সোহানা অনুভব করল ভেঙে গেল জিনিসটা। তবু খুশি হতে পারল না ও, আঘাতটা গুরুতর হয়নি।

হাঁপিয়ে উঠল কোর্সিনেজ, সমস্ত শক্তি দিয়ে সরিয়ে দিল সোহানাকে, কোমর বাঁকা করে নিচু করল শরীর, তবে ফলাটা এখনও সোজা করে ধরে রেখেছে। বিদ্যুৎবেগে আক্রমণ করল সোহানা, কিন্তু পিছু হটল কোর্সিনেজ, ঠেকাচ্ছে, ঠেকাচ্ছে যতটা পারা যায় কম নড়াচড়া করে, ব্যথায় ঘেমে যাচ্ছে মুখটা, গভীর মনোযোগ দিল শুধু মাথা আর বাহু দুটোকে পাহারা দিয়ে রাখার জন্যে; দু'বার টার্গেট স্পর্শ করল সোহানার তরোয়াল, কোর্সিনেজের শরীর ভেদ করে যেত, তাকে রক্ষা করল ইস্পাতের জ্যাকেট।

দশ সেকেন্ড আক্রমণাত্মক তাড়া করার পর সোহানা উপলব্ধি করল, সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেনি ও। বিহ্বল ভাব ও ব্যথা কমে আসছে দ্রুত, নিজের শক্তি ও সাহস ফিরে পাচ্ছে কোর্সিনেজ। এরপরও যদি আক্রমণ চালিয়ে যায় ও, স্টপ-হিট বা রিপোস্ট-এর সাহায্যে ওকে গেঁথে ফেলবে প্রতিপক্ষ।

ফিসফিস করল আশরাফ, 'ওহ্, মাই গড...!'

হিসহিস করে উঠল রানা, 'শাট ইওর মাউথ!' তারপর, নরম সুরে, জেনিকে

বলল, 'সব ঠিক আছে, সোহানা ভাল আছে।'

অ্যারেনায় এখনও বিরতিহীন চাপ সৃষ্টি করে চলেছে সোহানা, তবে আগের চেয়ে অনেক সতর্কভাবে। ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে কোর্সিনেজ, প্রায় অনায়াস ভঙ্গিতে আত্মরক্ষা করছে সে ব্যথার মুখোশটা বদলে নগ্ন ঘৃণার মুখোশ হয়ে উঠছে। একটু পরই, সোহানা জানে, আক্রমণে যাবে কোর্সিনেজ, এবার ওকে খুন করার জন্যে। অসি-যুদ্ধের দৃষ্টিনন্দন প্রদর্শনী অনেক হয়েছে, আর নয়।

কোর্সিনেজের পুনরুজ্জীবিত আত্মবিশ্বাস অনুভব করতে পারছে সোহানা, অনুভব করছে তার ফলায়। নতুন আত্মবিশ্বাস লাভ করার পিছনে সঙ্গত কারণ আছে তার। কোর্সিনেজ জানে অনেকক্ষণ ধরে লড়ছে ও। অনেকক্ষণ ধরে কঠিন একটা লড়াই। কঠিন এই জন্যে যে, সোহানা চেয়েছিল সাধারণ ও নিরাপদ অসি-যুদ্ধের একটা প্যাটার্ন বা পদ্ধতি যেন প্রতিষ্ঠিত করা যায়, যাতে শেষদিকে হঠাৎ করে অপ্রত্যাশিত ও নিয়মবিরুদ্ধ একটা কৌশলের সাহায্যে কোর্সিনেজের অসচেতনতার সুযোগ নিতে পারে। ওর প্ল্যান ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই এরপর দ্রুত হতাশা গ্রাস করবে ওকে, এই হতাশাই ওকে পরাজিত হতে বাধ্য করবে। এ-ধরনের সাইকোলজিক্যাল প্রতিক্রিয়া ঘটতে বাধ্য। এ-ব্যাপারে কোর্সিনেজের কোন সন্দেহ নেই।

কোর্সিনেজ তার দৃষ্টি যদি এক মুহূর্তের জন্যে সোহানার শরীর ও ফলা থেকে সরাতে পারত, বোধহয় এতটা নিঃসন্দেহ হতে পারত না সে। ঘন কালো চোখ দুটোয় হতাশা বা পরাজয়ের চিহ্নমাত্র নেই, আছে শুধু অস্তিত্ব রক্ষার সীমাহীন আকুতি, টিকে থাকার ব্যাকুল আকুলতা, আবার নতুন করে শুরু করার অনুপ্রেরণা।

আক্রমণ শুরু করেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল কোর্সিনেজ। জায়গা ছেড়ে পিছু হটছে সোহানা, হঠাৎ উপলব্ধি করল, ব্যাপারটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে কোর্সিনেজের—বিশ সেকেন্ডের মধ্যে তিনবার তলোয়ারের ডগা দিয়ে হামলা চালিয়েছে সে। প্রতিপক্ষের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সমস্ত তথ্য ওর মনের ফাইটিং কমপিউটরে ইতিমধ্যে জমা হয়েছে, কারণটা সেখান থেকেই জানতে পারল সোহানা। শিকারকে বধ করার চেষ্টা করছে সে, এবং যেহেতু সে কোর্সিনেজ, হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হতে হবে ফেনসিং-এর আদর্শ ও ঐতিহ্য পুরোপুরি বজায় রেখে—সরাসরি আক্রমণে হৃৎপিণ্ড ভেদ করে যাবে অসির ডগা, যাকে বলা যায় কেতা-দুরস্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিসমাপ্তি।

সোহানা বুঝতে পারল, এখন আর রিপোস্ট বা স্টপ-হিটে কোন কাজ হবে না। কোর্সিনেজ অসম্ভব দক্ষ। তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার একটাই উপায় আছে, তার তলোয়ারের ডগাটাকে ছুটে আসার পথ করে দিতে হবে—ওর নিজের শরীরে।

তবে তাই হোক। ঘন ঘন আক্রমণে শুধু কোর্সিনেজের হিট, প্রথম হিটটা, ধরা হবে। তারমানে এখানে যে হিটটা বধ করবে সেটাই ধরা হবে।

নিচের একটা রেখা বরাবর আক্রমণের ভান করল কোর্সিনেজ, ঠেকাতে শুরু

করল সোহানা, একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে সরে আসছে। ফেনসিং-এর আটটা মৌলিক পজিশনের আট নাম্বারটার অর্থাৎ অকটেভ-এর আশ্রয় নিল ও, কিন্তু এক পলক দেরি করল, তারপর অকস্মাৎ অপ্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করল যেন আতঙ্কের দ্বারা তাড়িত হয়ে। তলোয়ারের নিচের দিকটা ডিজএনগেজ করল কোর্সিনেজ সাবলীলভাবে।

'হ্যালো!' নিখুঁত সম্মুখ-আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, সরাসরি হৃৎপিণ্ড ভেদ করবে, তার গোটা শরীর দৈর্ঘ্যে বিস্তৃতি লাভ করল, একই সঙ্গে বিজয়ের রুদ্ধশ্বাস চিৎকারটা বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল তার গলা চিরে। আর ঠিক তখন, একেবারে শেষ মুহূর্তে, আক্রমণের দিকে চোখ রেখে একপাশে সামান্য সরে গেল সোহানা, কোর্সিনেজের তারোয়ালের ডগাটা বিঁধতে দিল ওর অস্ত্র ধরা হাতের বাহুতে, কাঁধ থেকে চার ইঞ্চি নিচে।

হাড়ে ঠেকে গেল ইস্পাত, ধনুকের মত বাঁকা হলো ফলা। বাঁকা ফলার দিকেই হেলান দিল সোহানা, হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেছে, পড়ে যাচ্ছে ও, বাম কাঁধটা সামান্য ঘুরিয়ে পাশ ফিরতে চাইছে, ডান হাত থেকে খসে পড়ছে অসি। এই একবারই কোর্সিনেজ তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে দ্রুতবেগে পিছু হটল না। এখনও তার শরীর সামনের দিকে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে, ধিকিধিকি আগুনের মত জ্বলছে চোখ দুটো, আক্রোশে ও ঘৃণায়, হতাশায় ও রাগে—তার আদর্শ ও ঐতিহ্যমণ্ডিত আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে, প্রতিপক্ষ শুধু আহত হয়েছে ও নিরস্ত্র হয়ে পড়েছে। এখন সমাপ্তিটা হবে স্রেফ কসাইসুলভ সহজ একটা কাজ।

এখনও তাকিয়ে আছে কোর্সিনেজ, ডান হাত থেকে খসে পড়া তলোয়ারটা বালিতে নামার আগেই বাম হাতে ধরে ফেলল সোহানা, ফলাটা স্যাৎ করে সামনের দিকে চালাল, তির্যকভাবে ওপর দিকে, ফলে ইস্পাতের জ্যাকেটকে এড়িয়ে চিবুকের নিচে ঘ্যাচ করে বিঁধে গেল ডগাটা, সরাসরি ঢুকে পড়ল মগজে।

আক্রমণের মধ্যে রয়েছে সোহানা, শরীরটাকে লম্বা করে দিল, কাত হয়ে পড়ে গেল কোর্সিনেজ। নিজের তলোয়ারটা আঁকড়ে ধরে আছে সে, হ্যাঁচকা টান লেগে সোহানার কাঁধ থেকে মাংস কেটে নিয়ে বেরিয়ে এল ডগাটা। তার পতনের ফলে গলা ও মাথার ভেতর ঢুকে পড়া সোহানার তলোয়ার ওর হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। পা ছুঁড়ল কোর্সিনেজ, খানিকটা বালি ছিটকে পড়ল সোহানার পায়ের ওপর, তারপরই স্থির হয়ে গেল শরীরটা। কোর্সিনেজ পা ছোঁড়ায় তিন কি চার ইঞ্চি বালি সরে গিয়ে একটা গর্ত তৈরি হয়েছে, ভেতরে ধূসর রঙের কি যেন দেখা গেল। টলতে শুরু করল সোহানা, দু'পা এগিয়ে এক পা পিছাল, তারপর আবার দু'পা এগোল। কেউ লক্ষ করল না, পা দিয়ে বালি সরিয়ে গর্তটা ঢেকে দিল ও।

অ্যারেনা বা অ্যারেনার আশপাশে কোন শব্দ নেই, শুধু একটা ফুরফুরে বাতাস বইছে। দৃশ্যটা, ভীতিকর ও অবাস্তব, পটে আঁকা স্থির ছবি হয়ে উঠল।

জেনি অনুভব করল তার পাশে থরথর করে কাঁপছে আশরাফ, গলা থেকে বাতাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে দীর্ঘ গোঙানির মত একটা আওয়াজ। রানার

কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ শান্ত, 'লড়াই শেষ হয়েছে, জেনি। হাতে আঘাত পেয়েছে ও, ইচ্ছে করে—উপায় ছিল না। তবে কুত্তাটা মরেছে।'

মঞ্চে ঝাঁকি খেতে শুরু করল পাইথন। গলা থেকে বেরিয়ে আসছে উল্লাস—অর্থহীন ধ্বনি। অবশেষে তার মাথাটা পিছন দিকে হেলে পড়ল, গোটা এলাকা কাঁপিয়ে দিয়ে বিস্ফোরিত হলো অট্টহাসি। তার আনন্দে কোন খাদ নেই। চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন, রাগে কাঁপছে পেনিফিদার, হিসহিস করে বলল, 'কোর্সিনেজকে হারানোটা হাসির ব্যাপার, ইউ ক্রেজি ফুল?'

পাইথনের কুৎসিত মুখ ভাঁজ খেয়ে ফুলে আছে, কথা বলার সময় হাঁপিয়ে উঠল সে, 'হাসির ব্যাপার নয় বলতে চাও? উফ্, এত আনন্দ জীবনে পাইনি! হোয়াট অ্যান এপিক সারপ্রাইজ! জীবনের এই সময়গুলোর কোন তুলনা হয় না, পেনিফিদার। জীবনে বৈচিত্র্য আনে, আয়ুও বাড়ায়।'

'কোর্সিনেজ মারা গেছে!'

'তুমি আসলে একজন স্থূল দর্শক, পেনিফিদার। যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে সে, বুঝতে পারছ না? মৃত্যুটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো অপমান, গর্দভ কাহিকে! ওহ্ ডিয়ার, ওহ্ ডিয়ার, হাউ ইনসালটিং ফর হিম!' থামল পাইথন, সকৌতুকে তাকাল পেনিফিদারের দিকে। 'সমস্ত দিক বিবেচনা করে, ক্ষতিগ্রস্ত হবার ব্যাপারটা খুব কমই অনুভব করছি আমি। আমাদের প্রজেক্টের কাজ যত এগিয়েছে, মেজর কোর্সিনেজের প্রয়োজন ততই আমাদের কাছে কমেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন কাজে লাগত না সে। তোমার লাগত?'

মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে অ্যারেনার দিকে তাকাল পেনিফিদার। 'ঠিক আছে,' ধীরে ধীরে বলল সে। 'সোহানার কি হবে?'

এখনও টলছে সোহানা, এক হাতে আহত বাহুটা আঁকড়ে ধরে আছে, এখনও তাকিয়ে রয়েছে কোর্সিনেজের দিকে। ওর জখমটা গভীর হলেও ছোট, রক্ত ঝরার গতি মন্থরই বলা যায়। টলছে ও, তবে পাইথনের উত্তরটা শোনার জন্যে খাড়া হয়ে আছে কান দুটো। নিস্তব্ধ পরিবেশ, তার গলা পরিষ্কার ভেসে এল।

'ও, হ্যাঁ, সোহানা চৌধুরী। তার সম্পর্কে অবশ্যই নতুন করে ভাবতে হবে আমাদের। তবে অপূর্ব এই নাটকটাকে টেনে লম্বা করার কোন ইচ্ছে যদি তোমার থাকে, এখুনি সেটা বাদ দাও। সত্যি ভারি উপভোগ্য হয়েছে, আমেজ ও সৌন্দর্যটুকু আমি নষ্ট হতে দিতে পারি না। কাল নতুন একটা দিন, তাই না? ধরো, ওকে যদি একটা ল্যান্ড রোভারের পিছনে রশি দিয়ে বাঁধা হয়, তারপর গাড়িটা ফুল স্পীডে চালানো হয়, কেমন হবে সেটা, উম্‌ম্? এটা স্রেফ একটা প্রস্তাব, ইচ্ছে করলে তুমিও একটা প্রস্তাব দিতে...।'

থামছে না পাইথন, বলেই চলেছে। ঘুরল সোহানা, কালো চাদর আর বুট জোড়ার কাছে ফিরে আসছে। পা টেনে টেনে হাঁটছে ও, ছোটখাট হোঁচট খেল কয়েকটা, মনে হল যে-কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। মঞ্চ থেকে লাফ দিয়ে অ্যারেনায় নামল ক্রনেল, ব্যস্তভাবে ছুটে আসছে সোহানার দিকে। লোভে ও প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে আছে চেহারা।

আসন ছেড়ে দাঁড়াতে গেল আশরাফ, হাত বাড়িয়ে শক্ত করে ধরে ফেলল তাকে রানা, জোর করে বসিয়ে দিল। আশরাফ রেগে গেল, বলল, 'আহ্, ছাড়ো! দেখছ না, সোহানা আহত হয়েছে! ওর কাছে যেতে দাও আমাকে!'

তবু তাকে ছাড়ল না রানা। ঠোঁট না নেড়ে ফিসফিস করল ও, 'চুপ করে বসে থাকো। এখনও কিছু কাজ বাকি আছে ওর।'

নেতিয়ে পড়ল আশরাফের শরীর, মনের ভেতর ঝড় বইছে, ভাবছে ও কি পাগল হয়ে গেছে? কিছু একটা ঘটছে এখানে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না সে। কিংবা কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু কোর্সিনেজ মারা যাবার পর আর কি ঘটতে পারে? আর কি কাজ বাকি আছে সোহানার?

আশরাফ দেখল, চাদরটা তোলার জন্যে ঝুঁকল সোহানা। হাত বেয়ে গড়িয়ে নামছে রক্তের একটা মোটা ধারা। ওর উরু ও পাঁজর এরই মধ্যে রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। ছোটখাট ক্ষতও তো কম নয়। টলে উঠল সোহানা, পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল নিজেকে, আবার টলে উঠল। ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছে ক্রনেল, হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে গেল সোহানার, তার গায়ের ওপর ঢলে পড়ল ও। ওকে ধরে ফেলল ক্রনেল, এক হাতে শরীরটাকে স্থির করার চেষ্টা করছে, অপর হাতটা নরম গায়ে হাতড়াচ্ছে। পা দিয়ে তাকে দুর্বলভাবে আঁচড়াল সোহানা, সিধে হবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু ক্রনেল ওকে সিধে হতে সাহায্য করছে না। দু'হাতে ওকে আঁকড়ে ধরে নিজের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করছে এখন। পেনিফিদার গর্জে উঠল মঞ্চ থেকে, 'ক্রনেল।'

আরও এক মুহূর্ত সোহানাকে ধরে থাকল ক্রনেল, তারপর বলল, 'কাল তোমার জন্যে অন্য রকম আয়োজন করা হবে, সুন্দরী!' সোহানার মুখে হাতের তালু রেখে ধাক্কা দিল সে। ছিটকে বালির ওপর পড়ল ও। ঘুরল ক্রনেল, আপনমনে নিঃশব্দে হাসছে।

হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঁচু হলো সোহানা, চাদরটা এখনও বুকের ওপর ধরে আছে। শরীরটা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, মাথাটাও, ভয়ানক ক্লান্ত।

মঞ্চ থেকে গার্ডদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করল পাইথন, আরবী ভাষায় কি যেন বলল। তারপর রানার দিকে তাকাল সে। 'ওকে তুমি সাহায্য করতে পারো, মাসুদ রানা। আর, শোনো, লক্ষ্য রাখবে রাতটা যেন আরামে কাটাতে পারে ও। কাল সারাটা দিন আমরা সার্কাস দেখব।'

আট

কমনরুমের দরজা বন্ধ হবার পর এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। নিজের বিছানায় বসে রয়েছে সোহানা, আহত হাতটা ধীরে ধীরে নাড়ছে, যাতে আড়ষ্ট হয়ে না যায়।

ক্ষতগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করেছে রানা, নিজের ছেঁড়া শার্ট গরম পানিতে সেদ্ধ করে গভীর ক্ষতটায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। পানির কোন অভাব নেই। খাবারের সঙ্গে আজও সন্ধ্যায় ওদের সবার জন্যে পানি দেয়া হয়েছে। কিন্তু কেউ এক ফোঁটা ব্যবহার করেনি, শুধু সোহানা বাদে। আজ ওরা কেউ রাতের খাবারও খায়নি। প্রফেসর হোয়াইটস্টোন ও তাঁর আর্কিওলজিকাল টীমের সদস্যদেরও পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে রানা। এই মুহূর্তে জেনির বিছানার পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে ও। ওর সামনে ক্রনেলের কালো নোট বুকটা খোলা রয়েছে। নোট-বুকের ভেতর ঢোকানো ছিল একটা পেন্সিল, সেটা এখন রানার হাতে। যে-কোন হস্তাক্ষর নকল করতে পারে ও, তবে তার আগে একটু প্র্যাকটিস করে নিতে হয়। এই মুহূর্তে ঠিক তাই করছে ও। বিল ওয়াটসনের বিছানায় একটা টাইম ম্যাগাজিন পাওয়া গেছে, মকশ করার কাজটা ওটারই মার্জিনে সারা হচ্ছে।

নোট-বুকে ক্রনেল যা কিছু লিখেছে সবই ইংরেজিতে। কোন কোন শব্দ সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছে সে, যেমন ডিজপোজাল লেখার সময় 'ও' এবং 'এ' অক্ষর দুটো ব্যবহার করেনি। প্রথমদিকের পৃষ্ঠাগুলোয় রয়েছে গোটা অপারেশনের বিস্তারিত প্ল্যান। খানিক পরপর কিছুটা করে ফাঁক রাখা হয়েছে, সংশোধন ও মন্তব্য করার জন্যে। প্ল্যানের প্রতিটি অংশ সম্পন্ন হবার পর নিচে লেখা হয়েছে বিস্তারিত রিপোর্ট। পরের পাতাগুলোয় রয়েছে দৈনন্দিন কাজের ফিরিস্তি।

সামান্য কুঁজো হয়ে বসে রয়েছে আশরাফ, ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর কনুই ঠেকিয়ে, হাত দুটো মরা সাপের মত ঝুলছে। শরীরের সমস্ত নার্ভ নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে তার, অসাড় ও খালি হয়ে গেছে মাথাটা। ধীরে ধীরে কথা বলল সে, 'কোর্সিনেজের সাথে লড়ার পিছনে এটাই তাহলে তোমার উদ্দেশ্য ছিল…ওটা হাতে পাবার জন্যেই…?' চোখ ফিরিয়ে নোট বুকটার দিকে তাকাল সে।

কাঁধ আর বাহু ঘোরাচ্ছে সোহানা। সারা শরীর ব্যথা করছে ওর, বাহুর ক্ষতটা দপদপ করতে শুরু করেছে, তবে নিজেকে ওর ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে না। বলল, 'বলতে পারো, এটা একটা অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। আর কোনভাবে ক্রনেলের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব ছিল না।'

মাথাটা ঘন ঘন নাড়ল আশরাফ, যেন পরিষ্কার করতে চাইছে। 'কিন্তু তুমি জানলে কিভাবে তোমাকে ধরবে সে?'

'জানতাম। মেয়েমানুষ হয়ে পুরুষমানুষের দৃষ্টি চিনব না? আমার দিকে হাত বাড়াবার নোংরা একটা প্রবণতা আগেই আমি লক্ষ করেছিলাম, প্রথম রাতে আমাদেরকে যখন সার্চ করা হলো। জানতাম, গায়ে যদি কাপড়চোপড় কম থাকে, নিজেকে সামলাতে পারবে না সে।' গম্ভীর হলো সোহানা। 'শেষ দিকে ইচ্ছে করে আহত হতে ভাল লাগেনি আমার, কিন্তু হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারায় কাজ না হওয়ায় আর কোন উপায়ও ছিল না। তবে, হাতে আঘাত লাগায় টলমল করার একটা অজুহাত পেয়ে যাই আমি।'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে আশরাফ। 'কিন্তু…,' বলে আবার মাথা নাড়ল সে। '…কিন্তু তুমি জানতে না কে জিতবে!'

আশরাফের ঝুলে পড়া মুখের দিকে তাকিয়ে, তার কাঁধে একটা হাত রাখল সোহানা। 'বেশ, জানতাম না। তবে এখন তো জানি? সেটাই আসল কথা। এবার তুমি শান্ত হও দেখি। ভাগ্য যদি আরেকটু ভাল হয়, খুব শিগগিরই দেখতে পাবে বাড়ির পথে রওনা হয়ে গেছি আমরা।'

সিধে হল রানা, নোট-বুকে কি লিখেছে খুঁটিয়ে দেখল। প্রথম দিকের একটা পাতায় লেখা হয়েছে গুপ্তধন মাটি খুঁড়ে তোলার কাজ সারতে হবে। লেখাগুলো বাংলা করলে এরকম দাঁড়ায়: 'পি. দায়িত্ব নেবে। প্রস্তুতি নিতে হবে যাতে এইচ. আর তার পার্টি পাথর ধসে চাপা পড়ে জীবন্ত সমাধিলাভ করে। (সুবিধেমত একটা জায়গা বেছে রাখতে হবে আগেই)।'

এরপর খানিকটা জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে। ফাঁকা জায়গার মাথায় পরে লেখা হয়েছে, 'এম. আর তার পার্টি? এ. ও এম. মারা যাবে পালাক্রমে।'

'পরের লেখাটা দেখে মনে হয়, আদি প্ল্যানের অংশ হতে পারে, আবার পরেও ঢোকানো হতে পারে। লেখা হয়েছে, 'বি. আর তার সেসনাকে উড়িয়ে দিতে হবে। ফেরার পথে টি-বোমার বিস্ফোরণ।'

শেষ এই লেখাটা রানার কীর্তি, অত্যন্ত সাবধানে লিখেছে। নোট বুকটা সোহানার হাতে ধরিয়ে দিল ও, তারপর টাইম ম্যাগাজিনের পাতাগুলো সদ্য ধরানো আগুনে পোড়াতে বসল। নকল লেখাটা খুঁটিয়ে দেখল সোহানা, মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটে, বলল, 'দারুণ হয়েছে, রানা।' নোট বুকটা ফিরিয়ে দিল ও।

আশরাফ বলল, 'ক্রুনেল নিশ্চয়ই জানতে পারবে নোট বুকটা তার কাছে নেই। সে যদি সন্দেহ করে ওটা তুমি তার পকেট থেকে মেরে দিয়েছ, তখন কি হবে?'

জবাব দিল জেনি, আশরাফের পাশেই বসে আছে সে। 'এরকম একটা সন্দেহ তোমার হত কি? ওরকম একটা লড়াইয়ের পর, সোহানার হাত ওভাবে জখম হবার পর? না। সব জায়গায় খুঁজবে ক্রুনেল, কিন্তু এখানে নয়।'

'শুধু দেখতে ভাল তা নয়, মেয়েটার দেখছি বুদ্ধিও যথেষ্ট!' হাসল রানা।

'ভয়ে কুঁকড়ে গেছি আমি, সুন্দর আর থাকলাম কোথায়!'

হেসে উঠল সোহানা। 'ভয় পেলে আরও সুন্দর দেখায় তোমাকে।'

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পর সেসনার আওয়াজ পেল ওরা। দূর থেকে আসছে আওয়াজটা। উপত্যকার প্রবেশপথের সামনে এয়ারস্ট্রিপে ল্যান্ড করবে ওটা। আরও এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। গার্ডরা বোধহয় এখন কার্গো নামাচ্ছে। ফাঁকা প্রান্তরে বাতাসের গতি খুব তীব্র, রশি দিয়ে বাঁধতে হবে প্লেনটাকে। দমকা বাতাস অনেক সময় হঠাৎ ঝড়ের মত হয়ে ওঠে। তারপর ট্যাংকগুলোয় ফুয়েল ভরতে হবে। ইতিমধ্যে রানার জানা হয়ে গেছে, ট্যাংকগুলো ভরা হয় ল্যান্ডিং-এর পরপরই। দু'দিন আগের ঘটনা, কমনরুম থেকে বিল ওয়াটসন বেরিয়ে যাবার দশ মিনিট পরই প্লেনটা টেক-অফ করে। খুলে রাখা প্লাগ লাগাতে ওই দশ মিনিটই লাগার কথা। প্লেনটাকে অচল করে রাখার জন্যে প্লাগটা নিজের কাছে রেখে দেয় পাইথন।

'আমি কিন্তু চাদরটার কথা ভুলিনি,' হঠাৎ বলল আশরাফ। 'কাল রাতে অ্যাকুয়েডাকটে ঢোকার সময় রানার সঙ্গে ছিল ওটা, কিন্তু ফেরার পর ছিল না। ওটা যে আমার চাদর, তা-ও আমি ভুলিনি।'

হেসে ফেলল সোহানা। 'আমি জানি চাদরটা কোথায়।'

রানা ছাড়া বাকি দু'জন ওর দিকে মুখ তুলল। 'কোথায়?' একযোগে জানতে চাইল আশরাফ ও জেনি।

'অ্যারেনার বালির তলায়।'

হাঁ হয়ে গেল ওরা দু'জন, কারও মুখে কথা যোগাল না। তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙল জেনি, 'মানে?'

'মানে হলো, আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে চাদরটা বালির তলায় বিছিয়ে রেখে এসেছিল রানা,' বলল সোহানা।

'কারণ?'

'কারণ, আমি হেরে যাচ্ছি দেখলে, কোর্সিনেজ আমাকে তরোয়াল দিয়ে গেঁথে ফেলতে যাচ্ছে দেখলে, চাদরটা ধরে টান দিত ও, ফলে পড়ে যেত সে।'

'টান দিত? অসম্ভব...কিভাবে?'

'সেটা আমার জানা নেই, রানাই ভাল বলতে পারবে।' ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি, রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'তবে আন্দাজ করতে পারি।' আশরাফের দিকে তাকাল ও। 'রানার বসার ভঙ্গিটা তোমরা লক্ষ করোনি, আমি যখন লড়ছিলাম? অ্যারেনার বালিতে লম্বা করা ছিল ওর পা দুটো, দু'পায়ের মাঝখানে ছিল হাত। আমার বিশ্বাস, চাদরের সঙ্গে কিছু বাঁধা ছিল, সম্ভবত এক বা একাধিক রশি। সেগুলোর অপর দিক ছিল রানার হাতের কাছাকাছি, প্রয়োজন হলেই টান দিতে পারত। তবে প্রয়োজন হয়নি।'

ঝট করে রানার দিকে ফিরল আশরাফ। 'সত্যি? যদি সত্যি হয়, আমাদেরকে আগে কেন জানানো হয়নি? সোহানার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা আছে জানলে অতটা ভয় পেতাম না।'

'এ-ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না,' বলল রানা। 'আমি শুধু জানি, চাদরটা আমি হারিয়ে ফেলেছি।'

এক মুহূর্ত পর আশরাফ বলল, 'কিন্তু এখন যদি চাদরটা ওরা দেখে ফেলে?'

'দেখে ফেললে আমরা আরেক দফা পাইথনের অট্টহাসি শুনতে পাব,' মন্তব্য করল সোহানা।

রেগেমেগে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল আশরাফ, কমনরুমের দরজা খুলে যাচ্ছে দেখে থেমে গেল সে। ভেতরে ঢুকল বিল ওয়াটসন, লোহার বারগুলো ব্র্যাকেটে ঢোকার শব্দ ভেসে এল। অলস পায়ে হেঁটে এসে একটা খালি বিছানার পাশে দাঁড়াল সে, হাতের চাদরটা নামিয়ে রাখল, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে কমনরুমের চারদিকে তাকাল।

রানা বলল, 'কেমন আছ হে, ওয়াটসন?'

'হাই, রানা।' হাতে সিগারেটের প্যাকেট, ওদের দিকে এগিয়ে এল সে।

'হাই, ম্যা'ম ' সিগারেটের প্যাকেটটা অফার করল সবাইকে।

সবাই প্রত্যাখ্যান করল, রানা বলল, 'তুমি বরং নিজেই আরেকটা ধরাও।'

অবাক হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ওয়াটসন। তারপর সোহানার দিকে ফিরল সে, বলল, 'শুনলাম কোর্সিনেজের সাথে পাল্লা দিয়েছ তুমি, ম্যা'ম। একেবারে পরলোকে পাঠিয়ে দিয়েছ, কেমন?'

রানা বলল, 'একটা দরকারি জিনিসও তুলে এনেছে, ওয়াটসন। ক্রনেলের নোট বুকটা দেখেছ কখনও?'

মৃদু হাসল ওয়াটসন। 'ভুলেও হাতছাড়া করে না। কেউ নাক ঝাড়লেও লিখে রাখে ব্যাটা।'

খোলা নোট বুকটা তার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'পড়ে দেখো। তোমার আগ্রহ হবার কথা।' ভুরু সামান্য কুঁচকে উঠল ওয়াটসনের। নোট বুকটা নিয়ে খোলা পৃষ্ঠার ওপর চোখ রাখল সে।

ধীরে ধীরে পড়ল ওয়াটসন, হঠাৎ করে তার চেহারা ভাবলেশহীন হয়ে গেল, সবগুলো লেখা আরেকবার পড়ল সে। অবশেষে মুখ তুলে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'বাহ্, চমৎকার। এবার নিয়ে ভিক্টর ক্যানিঙের হয়ে তিনবার কাজ করছি। কখনও ভাবিনি আমার দিকে আঙুল তাক করবে সে।'

রানা বলল, 'এখনকার ব্যাপারটা এত বড় যে সে বোধহয় কোন সাক্ষী রাখতে চাইছে না। এমনকি তোমাকেও নয়।'

'এইমাত্র আমি তার চাকরি ছেড়ে দিলাম।' নোট বুকটা রানাকে ফিরিয়ে দিল সে।

'এইমাত্র নতুন একটা চাকরি পেয়েছ তুমি। সেসনায় তুলে নিয়ে চলো আমাদের, ওয়াটসন। ত্রিশ হাজার ডলার।'

স্থির হয়ে গেল ওয়াটসন, দু'আঙুলে নিচের ঠোঁটটা টিপে ধরে চিন্তা করছে।

'কি হলো, ওয়াটসন?' জানতে চাইল সোহানা। 'ইয়েস অর নো?'

'ঝুঁকিটা বড় বেশি হয়ে যায়, ম্যা'ম।' রানার দিকে তাকাল ওয়াটসন। 'তোমরা আমাকে সাবধান করায় সত্যি আমি কৃতজ্ঞ, রানা। কিন্তু চিরকাল আমি গা বাঁচিয়ে চলতে অভ্যস্ত, প্রতিশোধ নেয়ার মত পৌরুষ আমার নেই। কাল আমি স্রেফ গায়েব হয়ে যাব, আর ফিরব না—ব্যস।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আর দু'ঘণ্টা পর এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা। সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন শব্দ হবে না। ত্রিশ হাজার ডলার, ওয়াটসন। তুমি যদি রাজি না হও,' কাঁধ ঝাঁকাল ও, '...বুঝতেই পারছ, এখান থেকে তোমাকে আমরা যেতে দিতে পারি না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওয়াটসন। 'সেসনা উড়বে না, রানা। প্লাগ রয়েছে পাইথনের কাছে।'

'জানি,' বলল রানা। 'তোমার ব্যাগেও এক সেট আছে, ওয়াটসন। আরও আছে একটা প্লাগ স্প্যানার। মাটিতে থাকুক আর আকাশে, তোমার প্লেন তুমি আর কারও মর্জির ওপর ছেড়ে দিতে পারো না।'

অবাক হয়ে আশরাফ দেখল, ওয়াটসনের ঠোঁটে হাসি ফুটছে। রানার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে, তারপর বলল, 'দেখা যাচ্ছে তুমি আমাকে খুব ভাল চেনো।'

'তাহলে কথা হয়ে গেল?'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াটসন। 'গেল।'

'কথা দিচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমাদের হয়ে কাজ করবে তুমি?'

'দিচ্ছি।'

পরম স্বস্তিবোধ করল আশরাফ, উপলব্ধি করল অচেনা এই লোকটার প্রতিশ্রুতির ওপর বিশ্বাস রাখা যায়। বিল ওয়াটসন এখন থেকে পুরোপুরি রানার প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকবে, যদিও তার বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য একটু অদ্ভুত ধাঁচেরই বটে।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে কমনরুমের চারদিকে তাকাল ওয়াটসন। আশরাফের মনে হলো, কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে সে। তার আগেই বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল সোহানা, কাঁধটা নাড়া খাওয়ায় ব্যথায় মুখ কোঁচকাল, বলল, 'দু'একটা কাজ এখনও বাকি আছে। আমার সাথে কিছুক্ষণ হাঁটো, ওয়াটসন। চাই না শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে পড়ুক।'

'শিওর।' সোহানার সঙ্গে ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোল ওয়াটসন।

রানা বলল, 'বসে থাকার সময় নেই। আমাদের একটা টার্গেট খাড়া করতে হবে, আশরাফ। একটা বিছানা খাড়া করলে কেমন হয়, বলো তো? স্প্রিঙের সাথে ভাঁজ করা চাদর আটকে দিলাম। কুঁড়ের বাদশা, এখনও তুমি উঠছ না যে?'

দাঁড়াল আশরাফ। 'টার্গেট মানে?'

'নরম একটা টার্গেট। তীর ছোঁড়া প্র্যাকটিস করব। ওগুলো ভেঙে গেলে চলবে না।'

রাত বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি, অ্যাকুয়েডাক্ট থেকে অন্ধকার মরুভূমির হিম বাতাসে বেরিয়ে এল রানা। টানেলের ভেতর দিয়ে আসতে প্রচুর সময় নিয়েছে ও, কারণ ধনুক ও তীরগুলো সামনে রেখে ঠেলে আনতে হয়েছে। ছুরি দুটো বেল্টের সঙ্গে শিরদাঁড়ার কাছে রেখেছে।

পাহাড়ের বাঁক লক্ষ করে এগোল রানা, চাঁদের আলোয় সমতল, পাথুরে জমিন আবছা দেখাল। পাহাড়ের ছায়ায় কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকল ও, তাকিয়ে আছে এয়ারস্ট্রিপের দিকে। ওদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেসনা। এখানে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবে ও। ত্রিশ মিনিটে যদি কোন গার্ড না নড়ে, মনে করতে হবে ঘুমাচ্ছে সে।

দশ মিনিট পর নড়ল লোকটা। দপ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল, সিগারেট ধরাচ্ছে গার্ড। সেসনার ছায়া থেকে বেরিয়ে এল সে, উপত্যকার প্রবেশপথের দিকে হেঁটে আসছে। প্রবেশপথের মুখটা রানার ডান দিকে একশো গজ দূরে।

পাথরের পাঁচিল ঘেঁষে এগোল রানা, তির্যক একটা পথ ধরে। লোকটা অর্ধেক

দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে, রানার কাছ থেকে এখন ত্রিশ কদম দূরে সে। ধনুকের ছিলায় একটা তীর লাগাল রানা, দাঁড়িয়েছে এক পা সামনে রেখে, ডান কাঁধটা সরাসরি টার্গেটের দিকে তাক করা, শরীরের ভর খানিকটা সামনের দিকে। লোকটা এই মুহূর্তে স্রেফ ছায়ামূর্তি নয়। কাঠামোটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। ধনুকটা তুলল ও, টান দিল ছিলায়, জিভ ও টাকরা সহযোগে টট্-টট্ আওয়াজ করল দু'বার।

ঝট করে ঘুরল লোকটা, তীক্ষ্ণচোখে তাকাল সেই মুহূর্তে তীরটা ছেড়ে দিল রানা, শুনতে পেল ঘ্যাচ করে টার্গেট ভেদ করল সেটা। হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হলো লোকটা, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। পাথুরে জমিনে খটাস করে শব্দ করল সাবমেশিনগানটা। অপেক্ষা করছে রানা, ইতিমধ্যে দ্বিতীয় তীর ছিলায় লাগানো হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে স্থির পাথর। উপত্যকার মুখে কোন নড়াচড়া নেই। ষাট সেকেন্ড পর সাবধানে এগোল রানা।

মারা গেছে লোকটা। ছাব্বিশ ইঞ্চি লম্বা তীরটা তার বুকে ঢুকেছে, হৃৎপিণ্ডের কিনারা ভেদ করে। সাবমেশিনগানটা ইচ্ছে করেই নিল না রানা ওটা ব্যবহার করলে শব্দ হবে, আর শব্দ হলে সবাইকে নিয়ে পালানো সম্ভব নয়। পাহাড় প্রাচীরের কাছে ফিরে এল রানা, ছায়ার ভেতর থেকে ধীরে ধীরে উপত্যকার প্রবেশমুখের দিকে এগোল।

প্রবেশমুখে কোন পাহারা নেই। একজনই বোধহয় সেসনা আর এদিকটায় নজর রাখছিল। দু'পাশে খাড়া প্রাচীর, মাঝখান দিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা। পাঁচ মিনিট পর, ফুলে ওঠা পাঁচিলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কমনরূমের দরজাটা দেখতে পেল ও। সরাসরি সামনে দরজাটা, একটু তির্যকভাবে ওর দিকে মুখ করে রয়েছে, কারণ পাঁচিলটা এখান থেকে ভেতর দিকে বাঁক নিতে শুরু করেছে

শিপস্কীন জ্যাকেট পরা গার্ড এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করছে, কাঁধ থেকে ঝুলছে স্নাইযার এমপি ফরটি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রানা বুঝতে পারল, লোকটা একা। এর আগে, কমনরূমের দরজা যতবার খোলা হয়েছে, ভেতর থেকে দু'জন গার্ডের আভাস পেয়েছে ওরা। গুপ্তধন কোথায় আছে জানার পর পাইথন বোধহয় সেখানে পাহারা বসিয়েছে।

এদিকের জমিন শুধুই পাথর, লোকটা পড়ার সময় তার অস্ত্র শব্দ করবে ভেবে চিন্তায় পড়ে গেল রানা। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল, ইতিমধ্যে যদি লোকটা বসে বা কাঁধ থেকে অস্ত্রটা নামিয়ে খাড়া করে রাখে দেয়ালে।

না, থামার কোন লক্ষণ নেই। রানা ভাবল, তীর ছুঁড়ে কাজ নেই, ব্যবহার করতে হবে ছুরি। তারমানে ক্রল করে আরও অনেক সামনে বাড়তে হবে, তারপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ছুরি হাতে। মন স্থির করল রানা, এই সময় থামল লোকটা। দরজার গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল সে, কানটা চেপে ধরল কবাটে। ধনুক ও ছিলার সমস্ত শক্তি নিয়ে ছুটে গেল রানার তীর, দরজার গায়ে সেঁটে থাকা গার্ড কিছুই না বুঝে মারা গেল, তীরের ডগা এক ইঞ্চি গেঁথে গেল কাঠে।

ঝুলে পড়ল লোকটা, তীরটাকে নামিয়ে আনছে। কাঠ থেকে বেরিয়ে এল

তীর, এই সময় পৌঁছে গেল রানা, দু'হাতে ধরে ফেলল শরীরটা, ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল দরজার পাশে। সিধে হলো রানা, ব্রাকেট থেকে স্টীল বার দুটো সরাল।

দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বিল ওয়াটসন। তার পিছনে কমনরুম অন্ধকারে ঢাকা। ফিসফিস করল রানা, 'সোহানার কাজ শেষ হয়েছে?'

নিচু গলায় কথা বলল ওয়াটসন, 'ওদেরকে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছে ম্যা'ম। যা বলা হবে তাই শুনবে সবাই।'

নিঃশব্দে মাথাটা একদিকে ঝাঁকাল রানা, ওকে পাশ কাটিয়ে কমনরুম থেকে বেরিয়ে গেল ওয়াটসন, উপত্যকার বাইরে চলে যাচ্ছে, ভাঁজ করা চাদরটা বগলের নিচে।

ওয়াটসনকে অনুসরণ করল আশরাফ ও জেনি, জেনির হাত ধরে আছে আশরাফ। দরজার পাশে পড়ে থাকা গার্ডের দিকে একবার তাকাল সে, পিঠে গাঁথা রয়েছে তীরটা, তারপর রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে গম্ভীরভাবে ঝাঁকাল মাথাটা। কথা না বলে জেনিকে নিয়ে চলে গেল সে। সবার মত তার ওপরও সোহানার নির্দেশ আছে, কোন কথা বলা চলবে না।

স্বামীর হাত ধরে হেঁটে এলেন মিসেস হোয়াইটস্টোন। প্রফেসরের মুখে শক্ত করে বাঁধা রয়েছে একটা রুমাল। ভদ্রলোকের যা মানসিক অবস্থা, তাঁর বাকশক্তি না থাকাটাই সবার জন্যে নিরাপদ বলে মনে করেছে সোহানা। বয়োবৃদ্ধ দম্পতিটির পিছন পিছন এল আর্কিওলজিকাল টীমের বাকি ছ'জন সদস্য, জোড়ায় জোড়ায়। সবাই প্রায় পা টিপে টিপে হাঁটছে তারা, ভয়ে টান টান হয়ে আছে মুখের চামড়া

সবার শেষে এল সোহানা। ওর পিঠে চাদর মোড়া একটা বান্ডিল রয়েছে, দু'হাতে একটা করে পানি ভর্তি ক্যান। রানাকে পাশ কাটাবার সময় চোখ মটকাল ও। পিছিয়ে এসে ওর পথরোধ করে দাঁড়াল রানা। 'এগুলো তোমার আশরাফকে দেয়া উচিত ছিল,' বলে সোহানার পিঠ থেকে বান্ডিলটা নামিয়ে মেঝেতে রাখল, চেয়ে নিল ক্যান দুটোও। মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল রানা, মিছিলের পিছু নিল সোহানা। ক্যান দুটো বান্ডিলের পাশে নামিয়ে রেখে গার্ডের পাশ থেকে স্নাইপারটা তুলে নিল রানা, তারপর তাকে টেনে কমনরুমে ঢোকাল। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় বার লাগাল ও, বান্ডিল ও ক্যান দুটো তুলে পিছু নিল সোহানার।

মাটিতে বসে চিন্তা করছে আশরাফ পনেরো মিনিট পেরুতে কতক্ষণ লাগে। প্লাগ লাগাতে মিনিট পনেরোর বেশি লাগবে না বলে জানিয়েছে ওয়াটসন।

ছোট্ট একটা বৃত্ত রচনা করে মাটিতে বসে রয়েছে আর্কিওলজিকাল টীমের সদস্যরা, সেই বৃত্তেরই একটা অংশ আশরাফ ও জেনি। দু'এক মুহূর্ত পরপর ভীত-সন্ত্রস্ত লোকগুলোর দিকে তাকাচ্ছে আশরাফ। ওদের জন্যে করুণাবোধ করা উচিত তার, জানে সে, কিন্তু এই মুহূর্তে প্রচণ্ড অস্থিরতা ছাড়া আর কিছু অনুভব করছে না। ওদের জন্যে পরে দুঃখ করা যাবে, এখন শুধু দয়া করে ওরা যদি শান্ত ও অনুগত থাকে তাহলেই খুশি সে। বাকি আর কিছুর কোন গুরুত্ব নেই। অস্থির

নার্ভগুলো মনে হচ্ছে চিৎকার করছে তার শরীরের ভেতর।

তার পাশে গায়ে চাদর মুড়ে বসে রয়েছে জেনি। জেনির কাঁপুনিটা অনুভব করতে পারছে আশরাফ। ইচ্ছে হলো কিছু বলে অভয় দেয়, কিন্তু কথা বলা নিষেধ। উপত্যকা থেকে বেরুবার পর কেউ কোন শব্দ করেনি। বিল ওয়াটসনকে সাহায্য করছে রানা ও সোহানা। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কারও কিছু করার নেই।

পাঁচ মিনিট বা পাঁচ বছর পর আশরাফের কাঁধ ছুঁয়ে ইশারা করল সোহানা। সেসনার দরজা খোলা রয়েছে। এই প্রথম কথা বলল সোহানা, ফিসফিস করে, 'তুমি আর জেনি ওয়াটসনের সাথে বসবে।'

জেনির হাত ধরে দাঁড় করাল আশরাফ। পানি ও পেট্রলের খালি ড্রাম নিয়ে ফিরে যাবার কথা সেসনার, কাল রাতে সেগুলো তোলাও হয়েছে, এক এক করে আবার সব নামিয়ে এনেছে রানা। খালি হলেও একেকটা কম ভারী নয়। সিঁড়ি বেয়ে প্লেনে ওঠার সময় আশরাফ ভাবল, কোন শব্দ না করে কাজটা রানা করল কিভাবে!

কন্ট্রোলে বসে রয়েছে ওয়াটসন। ইঙ্গিত করল সে, তার ডান দিকে ককপিটের খালি মেঝেতে সামান্য যে জায়গা রয়েছে সেখানেই ওদের দু'জনকে কোনরকমে বসতে হবে।

এরইমধ্যে বাকি সবাই প্লেনে উঠতে শুরু করেছে। ভিড় দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল আশরাফ। সেসনার ধারণক্ষমতা অনুসারে পাইলট বাদে পাঁচজন আরোহী উঠতে পারে। কিন্তু এখন পাইলট ছাড়াই বারোজনকে বইতে হবে। বারোজন··· সর্বনাশ, দিগুণ ওজন! কথাটা আগে ভাবেনি সে। প্লেন উড়বে তো? যদি টেক-অফ না করে?

কাঁধ ঝাঁকাতে গিয়ে আশরাফ অনুভব করল, ওর চারপাশে লোকজনের এত ভিড় যে একচুল নড়ার উপায় নেই। সদরঘাট থেকে রামপুরায় যে বাসগুলো চলাচল করে সেগুলোকে মুড়ির টিন বলা হয়, সেই বাসেও এভাবে লোক ভরা হয় না। এত লোক···প্লেন সত্যি আকাশে উঠতে পারবে তো? নিজেকে ধমক দিল আশরাফ, এ-সব দিক নিশ্চয়ই রানা বা সোহানা ভেবে রেখেছে, তার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। তাছাড়া, বিল ওয়াটসন অত্যন্ত দক্ষ পাইলট। সমস্যার সমাধান তার জানা আছে।

তার আশপাশে উবু হয়ে বসে আছে লোকজন, ভাল করে বসার জায়গা নেই। পিছন থেকে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পেল সে। উইন্ডশীল্ড দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে ওয়াটসন। হঠাৎ রাগ হলো আশরাফের, প্লেন স্টার্ট দিচ্ছে না কেন? দু'মিনিট পেরিয়ে গেল। নড়ে উঠল ওয়াটসন, কন্ট্রোলে প্রজাপতির মত ব্যস্ত হয়ে উঠল তার হাত।

এঞ্জিনের আকস্মিক গর্জনে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল আশরাফের। জেনির সঙ্গে তার শরীর এক হয়ে আছে, থরথর করে কাঁপছে মেয়েটা। তাকে শক্ত করে ধরে থাকল সে, তারপর অনেক কষ্টে ঘাড়টা বাঁকা করে সোহানাকে দেখার চেষ্টা করল চোখের দু'ইঞ্চি সামনে ওর পিছনে বসা লোকটার নোংরা শার্ট ছাড়া কিছুই দেখতে

পেল না। ডায়াল পরীক্ষা করছে ওয়াটসন। কিছুই ঘটছে না, স্টার্ট দেয়া অবস্থায় অচল দাঁড়িয়ে রয়েছে সেসনা। আশরাফের চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো। এঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দ উপত্যকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। গার্ডরা শুনতে পাবে ঘুম থেকে জাগানো হবে পাইথনকে। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে আসবে সবাই।

ঘাড় ফিরিয়ে আশরাফের দিকে তাকাল ওয়াটসন, মৃদু হাসল। 'এঞ্জিন গরম করা দরকার,' গলা চড়িয়ে বলল সে। 'ভাইরে ভাই, সেসনা বেটির আজ মহা পরীক্ষা! এত ভার কখনও বইতে হয়নি তাকে। আজ তার সবটুকু শক্তি লাগবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল আশরাফ, দেখে মনে হলো ভেঙচাল। আরও ত্রিশ সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। হাত দুটো নড়ে উঠল ওয়াটসনের। ঝাঁকি খেল প্লেন, সামনের দিকে এগোল ওরা। আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল আশরাফ। সামনের দিকে তাকাল সে। জমিন সমতল ও সমান। টেক-অফ করার জন্যে যথেষ্ট লম্বা।

পাইলটের দিকে তাকাল সে। ওয়াটসনের চেহারা বরাবরের মত নির্বিকার। তবে চোখ দেখে বোঝা যায়, নিজের কাজে গভীর মনোযোগী সে। এঞ্জিনের গর্জন আরও বাড়ল, ঘন ঘন ঝাঁকি খেয়ে সামনে এগোচ্ছে সেসনা।

ঘামছে আশরাফ। প্লেনের ভেতরটা অত্যন্ত গরম। সে ভাবল, সেসনা যদি টেক-অফ করতে না পারে, তারপর কি ঘটবে? উল্টে যাবে প্লেন? নাকি স্রেফ দাঁড়িয়ে পড়বে? কিংবা হয়তো...।

জেনির গলাটা আর্তচিৎকারের মত শোনাল, 'আমরা আকাশে!'

আশরাফ উপলব্ধি করল, প্লেনটা এখন আর ঝাঁকি খাচ্ছে না। উইন্ডশীল্ড দিয়ে বাইরে, ওপরে তাকাল সে। দু'একটা তারা দেখা যাচ্ছে। উইন্ডশীল্ডের ওপরের কোণ থেকে একটা তারা ক্রমশ নিচে নামছে দেখে বুঝল ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠছে সেসনা।

আরও তিন মিনিট পর ওয়াটসনের উঁচু হয়ে থাকা কাঁধ শিথিল হলো। ঘাড় ফিরিয়ে আবার আশরাফের দিকে তাকাল সে, হাসল হঠাৎ, গলা চড়িয়ে বলল, 'তোমরা এই ক'দিনে যথেষ্ট রোগা হয়ে যাওয়ায় আমি খুশি।'

আশরাফের ভেতর কি যেন একটা বিস্ফোরিত হলো, পাগল করা আনন্দে নেচে উঠল তার প্রতিটি রোমকূপ। ওরা মুক্ত! পাইথন, পেনিফিদার, গুণ্ডা ও খুনীরা মাটিতে রয়ে গেছে, ওদের কোন ক্ষতি করার সাধ্য নেই। তার হাঁটুর ওপর অনবরত ঘুসি মারছে জেনি, অপার আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে সে-ও।

ঘাড়টা আবার বাঁকা করার চেষ্টা করল আশরাফ, চিৎকার করে ডাকল, 'সোহানা!' এখনও ওকে দেখতে পাচ্ছে না সে। তার কাঁধে একটা হাত রাখল ওয়াটসন। ফিরল আশরাফ, মাটির দিকে একটা আঙুল তাক করল পাইলট

'না,' বলল ওয়াটসন। 'প্লেনে নয়, নিচে। রানা ও ম্যা'ম হাঁটছে।'

'হোয়াট?' দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করল আশরাফ, হাতের চাপ দিয়ে তাকে বসিয়ে রাখল ওয়াটসন।

'ভার,' বলল সে, এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার গলা, তবে ব্যাখ্যা করছে খোশ-মেজাজে 'সবাইকে তোলা সম্ভব ছিল না। ওদের দু'জনকে রেখে

যেতে বাধ্য হচ্ছি। আমি চারজনকে রেখে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রানা আমার কথায় কান দেয়নি। ভাইরে ভাই, টেক-অফটা অনুভব করেছ তুমি? আর যদি এক প্যাকেট সিগারেটও বেশি থাকত, সেসনা বেটি স্রেফ...।'

গলার রগগুলো ফুলে উঠল আশরাফের। 'কিন্তু সোহানা অসুস্থ!'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াটসন 'এই প্রথম নয়, আগেও আহত হয়েছে ম্যা'ম। তাছাড়া, ওর সঙ্গে রানা আছে।' শার্টের পকেটে চাপড় মারল সে। 'নোট-বুকের পাতায় একটা চিঠি লিখে দিয়েছে ম্যা'ম; এক লোককে ওটা দেখালেই আমি আমার টাকা পেয়ে যাব। আরেকটা কাগজে ম্যা'ম তোমাকে কিছু নির্দেশ দিয়েছে। ল্যান্ড করার পর কাজগুলো করতে হবে।'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!' এখনও বিস্ফারিত হয়ে রয়েছে আশরাফের চোখ। 'রানা ব্যাপারটা মেনে নিল, সোহানা অসুস্থ জেনেও? আর কোন উপায় ছিল না?'

'ছিল। আমি বলেছিলাম আর্কিওলজিস্টদের দু'জনকে রেখে যাই কিন্তু ম্যা'ম আমাকে কথা বলতে নিষেধ করল। আর রানা চেয়েছিল ম্যা'মের বদলে তুমি থাকো ওর সাথে, কিন্তু...।'

'আমি আপত্তি করতাম না! কিন্তু?'

'কিন্তু ম্যা'ম রাজি হলো না। বলল, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া তার দায়িত্ব।'

নেতিয়ে পড়ল আশরাফ, তার শরীর কাঁপছে। বাহুতে ব্যথা অনুভব করল সে, বুঝল জেনি তাকে খামচে ধরে আছে। মেয়েটার দিকে তাকাতে দেখল, নিঃশব্দে কাঁদছে সে। ধীরে ধীরে তাকে নিজের কাঁধের ওপর টেনে আনল আশরাফ। তার বুকে অনবরত ঘুসি মারল জেনি, অবোধ শিশুর মত ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'ওদেরকে এনে দাও! আমি ওদের কাছে যাব!'

আশরাফের চোখ ভিজে উঠল, নিজের কথা ভুলে ব্যস্ত হয়ে উঠল জেনিকে সান্ত্বনা দিতে। 'চিন্তা কোরো না, জেনি। সব দিক ভেবেই নিচে রয়ে গেছে ওরা। আমি বলছি, ওদের কোন বিপদ হবে না...।'

আধ ঘণ্টা হলো সেসনা স্কাইওয়াগন চলে গেছে। উপত্যকার প্রবেশমুখের কাছ থেকে ভেসে আসা শোরগোলের আওয়াজ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল। কোথাও আর কেউ নড়ছেও না। ফাঁকা জায়গায় পড়ে থাকা গার্ডের লাশ তুলে নিয়ে গেছে দু'জন লোক। বড় একটা ফ্লাশ-ল্যাম্প নিয়ে উপত্যকার বাইরে বেরিয়ে এসেছিল কর্নেলও, পেট্রল স্টোরটা দেখে গেছে সে। ভেতরটা সার্চ করা হয়নি। সম্ভবত কোথাও সার্চ করেনি ওরা। পাইথনের ভরাট গলা একবার মাত্র চড়েছে, তারপরই থেমে গেছে সমস্ত হৈ-চৈ।

পরিবেশ এখন সম্পূর্ণ স্থির ও শান্ত।

পেট্রল স্টোর-এর পিছন থেকে বেরিয়ে এল রানা ও সোহানা, গুহাটার শেষমাথার একটা কোণে গা-ঢাকা দিয়ে ছিল ওরা। রানার পিঠে চাদর মোড়া

বান্ডিল, হাতে পানির ক্যান। বান্ডিলটা আসলে চৌকো একটা বিস্কিটের টিন, ভেতরে পলিথিনে জড়িয়ে রাখা হয়েছে আজ রাতে ওদের জন্যে বরাদ্দ করা সমস্ত খাবার। পলিথিনের ভাঁজ করা বড় একটা শীটও রয়েছে টিনের ভেতর, দু'দিন আগে প্রফেসর হোয়াইটস্টোনের বিছানা থেকে পেয়েছিল রানা। খোঁড়াখুঁড়ির প্রথম দিকে মাটি থেকে যে-সব মূল্যবান জিনিসের টুকরো-টাকরা পাওয়া গেছে সেগুলো সম্ভবত এই পলিথিনের শীটে রাখা হত।

সোহানা বইছে স্লাইযার আর পানির দুটো বোতল।

সেসনার শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে পরম স্বস্তি বোধ করেছে সোহানা, অবশেষে ভারী বোঝাটা নেমে গেছে ওর কাঁধ থেকে। এই বোঝাটা ওদের কাঁধে ছিল বলেই নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্যে বড় ধরনের কোন ঝুঁকি নিতে পারেনি ওরা, ও আর রানা। এখন আর কোন চিন্তা নেই। একা হয়ে গেছে ওরা।

ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই রেডিওর সাহায্যে ভিক্টর ক্যানিঙের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে পাইথন। সেজন্যেও উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। সেসনা নিয়ে আলজিয়ার্সে যাচ্ছে না ওয়াটসন, যাচ্ছে তাঞ্জিয়ারে। আলজিয়ার্সে ভিক্টর ক্যানিঙের লোক অবশ্যই থাকবে, কিন্তু হতাশ হতে হবে তাদের। তাঞ্জিয়ার এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার পর লন্ডনে ফোন করবে আশরাফ, দু'জায়গায়। প্রথমে করবে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মারভিন লংফেলোকে, তারপর রানা এজেন্সির লন্ডন শাখায়। মরক্কোর আইন মন্ত্রীর সঙ্গেও যোগাযোগ করবে আশরাফ। তাঞ্জিয়ারের একটা পাহাড়ে সোহানার ভিলা আছে, বছরের একটা সময় ওখানে ছুটি কাটায় ও। ওর দেয়া পার্টিতে প্রতি বছর আমন্ত্রিত হয়ে আসেন আইন মন্ত্রী। সোহানার বন্ধুই বলা যায় ভদ্রলোককে।

বিল ওয়াটসন, আশরাফ চৌধুরী, জেনি উডহাউস, প্রফেসর হোয়াইটস্টোন বা তাঁর আর্কিওলজিকাল টীম, কারুরই নাগাল পাবে না ভিক্টর ক্যানিং।

স্লাইযার ধরা হাতটা তীব্র ব্যথা করছে সোহানার, অপর হাতে ওয়াটসনের দেয়া ছোট একটা টর্চ। ট্রলির ওপর রাবারাইজড নাইলনের শীটটা বিছাল রানা। চারটে লম্বা কাঠের পোল বা থাম তোলা হলো ট্রলিতে, তারপর দুই প্রস্থ কুণ্ডলী পাকানো রশি ও পানির ক্যান।

স্টিয়ারিং টিলারটা ধরল রানা, সাবলীলভাবে চলতে শুরু করল ট্রলি। পাথুরে জমিনে প্রায় কোন শব্দই হচ্ছে না। পাঁচমেশালি ধাতু দিয়ে তৈরি হওয়ায় সব মিলিয়ে ট্রলির ওজন মাত্র দুশো পাউন্ড। টর্চ নিভিয়ে দিয়ে রানার পিছু পিছু হাঁটছে সোহানা। ট্রলিটাকে মাইলখানেক টেনে আনার পর থামল রানা পাহাড়ের দীর্ঘ বাঁক ঘুরে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে ওরা।

'এখানেই কাজটা সেরে ফেলি, সোহানা। খুব বেশি আওয়াজ করব না।'

'ঠিক আছে, রানা। এই হাত নিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু করতে পারব না, তবু সাহায্য দরকার হলে বোলো।'

ফাঁকা প্রান্তরে ঝড়ের বেগে বইছে বাতাস, বাতাসের দিকে পিছন ফিরল ও। এখন ঠাণ্ডা লাগলেও, দিনের বেলা উত্তপ্ত তন্দুর হয়ে উঠবে এই প্রান্তর। উত্তর

দিকের পথটা কি রকম হবে কল্পনার চোখে দেখতে পেল সোহানা। সাহারার ওপর দিয়ে নিয়মিত দুটো পথ রয়েছে—নিনে দু হগার ও নিনে দু টানেজরুফট। প্রথমটা উত্তরদিকে এল গোলিয়া-র দিকে চলে গেছে—বলা যায় রূপকথার একটা রাজ্যে, বিশাল উষর মরুভূমির মাঝখানে এখানে-সেখানে ঝর্ণা ও ফুলের বিপুল সমারোহ সহ মরুদ্যান। এল গোলিয়া থেকে গারদাইয়া হয়ে সাহারা অ্যাটলাস, তারপর আলজিয়ার্স।

পশ্চিমের পথটা পুরোপুরি সমতল প্রান্তরের ওপর দিয়ে দুশো মাইল এগিয়েছে, এধরনের প্রান্তরকে আরবরা বলে রেগ। পৌচেছে আদরার-এ, তারপর কলম্ব-বেচার হয়ে, পাহাড়-পর্বতের ভেতর দিয়ে ঢুকেছে মরক্কোয়। তিন ধরনের মরু নিয়ে সাহারা। নুড়ি ও কাঁকর ছড়ানো শুকনো সমতল অর্থাৎ রেগ। বালির বিশাল সাগর, বাতাসের চাপে বালিয়াড়ি বহুল চেহারা পেয়েছে, আরবরা বলে এর্গ। আর আছে পাথুরে বিস্তৃতি, গোলকধাঁধার মত পাহাড়ী নালা, স্থানীয় ভাষায় যেটাকে বলা হয় হাম্মাদা।

রেগুলার রুটগুলোর কোনটাই ধরবে না ওরা, কারণ ওদিকে ওদের জন্যে ফাঁদ পাতা হতে পারে। ভিক্টর ক্যানিঙের শক্তিশালী হাত কতদূর লম্বা ওদের তা জানা নেই, যথেষ্ট লম্বা হলে সরু দুই মরুপথে অচিরেই তার লোকজন ছড়িয়ে পড়বে। মরুপথে খুব দ্রুত খবর পৌঁছে যায়। পাঁচশো মাইলের মধ্যে থেকে একজোড়া মানুষকে খুঁজে বের করা বড় কোন সমস্যা নয়, বিশেষ করে যদি হেলিকপ্টার বা প্লেন ব্যবহার করা হয়।

রানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর-পশ্চিমে যাবে ওরা। দেড়শো মাইল সমতল জমিন পেরিয়ে বালিয়াড়ি বহুল হাম্মাদা এলাকায় চলে যাবে। এ-ধরনের অভিযানে ভাগ্য সহায়তা করলে মরুভূমি সম্পর্কে অজ্ঞ একজন লোক খুব বেশি হলে চব্বিশ ঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারে। ঘাম ঝরে পড়তে না দেয়ার জন্যে সে তার শরীর ঢাকবে না, জানে না বালি থেকে কিভাবে পানি বের করতে হয়, গিরগিটি বা ঘৃণ্য কোন প্রাণী মেরে খাবে না, উটের প্রিয় ঘাসও তার মুখে রুচবে না, লবণের প্রয়োজন মেটাবার জন্য একজন অপরজনের গা চাটবে না, নিজের বানানো তীর দিয়ে গ্যাজেল হরিণ মারবে না।

ওদের সঙ্গে বেশ ক'দিনের খাবার ও পানি আছে। একটা বাহনও আছে, এমনকি ছায়াও পাওয়া যাবে। ইচ্ছে করলে বসতে বা শুতে পারবে ওরা।

রানা বলল, 'এটা একবার ধরতে পারবে, সোহানা?' কাঠের একটা থাম, শেষ প্রান্তটা ধরল সোহানা। থামের মাঝখানটা ডেরিকের সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধল রানা, বেস-এর ঠিক ওপরে। এরপর ট্রেলির পিছনে চলে এল দু'জন, দ্বিতীয় থামের মাঝখানটা ছোট একটা রশি দিয়ে বাঁধা হলো, লম্বা মেটাল পাইপের ওপরের প্রান্তে গলিয়ে দিল একটা ঢিলে লূপ।

দশ মিনিট পর চৌকো বড় আকারের শীটটা ট্রেলির ওপর বিছাল রানা, ওপর-নিচের দুই দিকের সারসার ফুটোয় রশি ঢোকাল, রশির প্রান্তগুলো জড়াল থাম দুটোর সঙ্গে। দ্রুত হাতে নিঃশব্দে কাজ করছে ও, কোন বিরতি ছাড়াই, যেন

কিভাবে কি করতে হবে আগেই সাজানো ছিল ওর মাথায়।

প্রতিটি বেস পোল-এর শেষ মাথা থেকে এক প্রস্থ করে রশি ঝুলছে, মুক্ত প্রান্তগুলো কুণ্ডলী পাকানো, পড়ে রয়েছে ট্রলির প্ল্যাটফর্মে। মূল কয়েল থেকে ছুরি দিয়ে ছোট করে রশি কাটল রানা। ইতিমধ্যে ওর কাজের প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছে সোহানা। মাথাটা আগুনের মত গরম লাগছে ওর, অথচ দু'এক মিনিট পরপর ঠাণ্ডা হিম স্রোত বয়ে যাচ্ছে সারা শরীরে

এক সময় রানা বলল, 'হয়েছে। এসো দেখা যাক, কাজ করে কিনা।' ট্রলিতে উঠে একটা রশিতে ঢিল দিল ও। ডেরিকের সরু মেটাল বাহু খাড়াভাবে সিধে হলো, ব্রেসিং বারগুলো লক করল রানা। ডেরিক বেস-এর কাছে পলিথিন শীট ও ক্রস-পোল দুটো লম্বা একটা বান্ডিলের মত পড়ে রয়েছে। সোহানাকে ওপরে উঠতে সাহায্য করার জন্যে নিচের দিকে একটা হাত বাড়াল রানা।

ট্রলির পিছন দিকে সরে এল ও, গুড়ি মেরে বসল একটা বার-এর পাশে, প্ল্যাটফর্মের এক কি দু'ইঞ্চি ওপরে বেরিয়ে রয়েছে ওটা, গা থেকে ঝুলছে অনেকগুলো রশির প্রান্ত।

ডেরিকের মাথা থেকে পুলি সচল হবার আওয়াজ পেল সোহানা। মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠল বিরাট চৌকো পাল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে ফুলে উঠল সেটা, চলতে শুরু করল ট্রলি। চিৎকার করে উঠল রানা, 'জেসাস! টিলারটা ধরো, সোহানা!'

শরীর লম্বা করে দিয়ে টিলারটা ধরল সোহানা, ছোট ফ্রন্ট হুইল ঘোরাল, ট্রলিটা যাতে সোজা একটা পথ ধরে এগোয়। ওর পিছনে খুশিতে আপনমনে কথা বলছে রানা, অনেকগুলো রশির প্রান্ত নিয়ে টানাটানি করছে। কোনটা ঢিল দিল একটু, কোনটা টানল, অদ্ভুতদর্শন পালটাকে নিখুঁত করার চেষ্টা, ঠিকমত যাতে বাতাস পায়।

অবশেষে রানার হাসির আওয়াজ পেল সোহানা। 'নির্ঘাত বারো নটে ছুটছি আমরা, সোহানা। বাহনটাকে তোমার কেমন লাগছে?'

'ভালই। তবে ওকে তোমার ধরতে হবে, রানা।' কাঁধের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'টিলারটাকে বেঁধে ফেলো, যাতে খুব কম নড়ে। তাহলে বড় কোন ঝাঁকি খেলেও ঘুরবে না বা থামগুলো ভাঙবে না।'

'ঠিক আছে।' হামাগুড়ি দিয়ে সোহানার পাশে চলে এল রানা, হাতে রশি। কাঁকর ও নুড়ি ছড়ানো জমিনের ওপর দিয়ে বেশ দ্রুত ছুটছে ট্রলি। তেমন একটা ঝাঁকিও খাচ্ছে না। ভয় দমকা বাতাসকে, আর নজর রাখতে হবে কোর্স-এর দিকে। তাছাড়া আপাতত আর কোন চিন্তা নেই।

ভাগ্য খুব একটা খারাপ না হলে বাতাসটা টিকবে। ওরা জানে, মরুভূমির বাতাস একশো দিনে মাত্র ছ'দিন গতি হারায়। ধু-ধু প্রান্তরে কোন বাধা নেই, এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত প্রান্তরটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। পরে অবশ্য এই শক্ত প্রান্তর থেকে বালিময় মরুভূমিতে গিয়ে পড়বে ওরা, তবে সেখানে আরও ভালভাবে ছুটবে ওদের স্যান্ড-ইয়ট—যে-কোন লরি বা ট্রাকের চেয়ে ভালভাবে। ঝুরঝুরে আলগা বালিতে ট্রাকের চাকা পিছলে যায়। ওদের ট্রলির কোন ড্রাইভিং হুইল নেই,

এটাকে শক্তি যোগাচ্ছে পালটা।

টিলারটা আলগাভাবে বাঁধল রানা। 'কোর্স ঠিক আছে তো, সোহানা?'

'ঠিক আছে।' এটা একটা অদ্ভুত গুণ সোহানার। কম্পাস না থাক, আকাশে তারা না থাক, এমনকি চোখ বেঁধে দিলেও নির্ভুলভাবে দিক নির্ণয় করতে পারে ও

হাত বাড়িয়ে ছুরিটা চেয়ে নিল, চোখ বুলাল আকাশে, প্ল্যাটফর্মের গায়ে তির্যক একটা রেখা তৈরি করল ফলার ডগা দিয়ে। 'রেখাটা পোল স্টার বরাবর রাখবে, তাহলে আর দিক হারাতে হবে না।'

মাথা ঝুঁকিয়ে আবার ট্রলির পিছন দিকে ফিরে এল রানা, পালটাকে অ্যাডজাস্ট করল। একটা চাদরের ভাঁজ খুলে ট্রলির ওপর বিছাল ও। 'তুমি শুয়ে পড়ো, সোহানা।'

দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হলো না, শুয়ে পড়ল সোহানা। 'কোন কাজ থাকলে ডেকো আমাকে,' বলল ও।

'ডাকব। কেমন আছে হাতটা?'

'আছে।' চোখ বুজল সোহানা। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, 'কাজটা শেষ করা গেল না বলে খারাপ লাগছে, রানা। পাইথন আর পেনিফিদার সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে।'

'খারাপ আমারও লাগছে। কিন্তু আমাদের সাথে নিরীহ ও আনাড়ী অতগুলো লোক থাকায় ঝুঁকি নেয়া উচিত হত না। ওদেরকে নিয়ে সেসনা চলে যাবার পর অবশ্য একটা ঝুঁকি নিতে পারতাম আমি, কিন্তু তোমার হাতের কথা ভেবে সাহস পাইনি।'

'হ্যাঁ, ঝুঁকি নেয়া উচিত হত না।'

অনেকক্ষণ আর কোন কথা হলো না। তারপর রানা বলল, 'তবে পাইথনের সাথে আবার আমার দেখা হবে, সোহানা। হয়তো আমিই ওকে খুঁজে বের করব। ব্যাপারটা যখন শুরু হয়েছে, এর শেষটা আমাকে দেখতে হবে। ভৌতিক একটা ভয় নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সোহানা?'

রানার কথা শুনতে পায়নি সোহানা, ঘুমিয়ে পড়েছে। কালো আকাশের গায়ে জ্বলজ্বল করছে তারাগুলো, তরতর করে এগিয়ে চলেছে ওদের ট্রলি।

নয়

দ্বিতীয় দিন দুপুরের দিকে, মাস থেকে প্রায় দুশো মাইল দূরে পৌঁছে, ট্রলির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটল ওদের। এর আগে, কাল রাতে, স্নাইপারটা হারিয়েছে ওরা। বেদুইন ডাকাতরা অতর্কিতে হামলা করেছিল, সাত-আটজনের দলটাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্যে সবগুলো গুলি খরচ করতে হয়েছে রানাকে। পিছনে দুটো লাশ

রেখে গেছে তারা, আহত হয়েছে আরও তিনজন। রানার ভয় ছিল, আবার ওরা ফিরে আসবে। কিন্তু আসেনি।

বালিয়াড়ি শুরু হয়েছে, ট্রলিটাকে তবু টেনে আনতে হলো রানাকে। আট মাইল এগোতে সময় লাগল দু'ঘণ্টা। কাজেই এবার এটাকে বাদ দিতে হয়।

পানি আছে আর এক ক্যান, ক্যানটা পিঠে বেঁধে নিল রানা, ভাঁজ করা শীটটা থাকল ক্যান-এর ওপর। চাদর দিয়ে এক জোড়া আলখাল্লা মত বানিয়েছে রানা, পরে নিল দু'জনে, শরীরের ঘাম যাতে বাষ্প হয়ে উড়ে না যায়। স্লিং, ছুরি আর পাতলা পলিথিনটা নিল ও, বাকি সব ফেলে দিল।

এখান থেকে রওনা হয়ে চব্বিশ ঘণ্টায় চব্বিশ মাইল এগোবে ওরা, হাঁটবে শুধু রাতে, দিনের প্রচণ্ড গরমে বিশ্রাম নেবে। ফাটলবহুল পাথুরে জমিন ও শুকনো নালাবহুল হাম্মাদায় প্রচুর ছায়া পাবে ওরা, ছায়া পাবে বালিয়াড়ির নিচে। প্রয়োজনে পলিথিন শীট দিয়ে মাথার ওপরটা ঢাকা যাবে।

ভোরে থামল ওরা, সারা রাত হেঁটেছে। বালিতে একটা গর্ত করল রানা। মনটা খুশি থাকারই কথা, শুধু সোহানার হাতটা ওকে ভাবিয়ে তুলছে। বাহুটা ফুলতে শুরু করেছে, ক্ষতের চারপাশে লাল হয়ে উঠেছে চামড়া। ওর চোখ দুটো অতিরিক্ত চকচক করছে, তারমানে জ্বর আসছে। মরুভূমির দিনগুলো এত বেশি গরম যে ভাল ঘুম হবার কথা নয়, কিন্তু সোহানা একেবারেই ঘুমাতে পারছে না। লক্ষণটা ভাল ঠেকছে না রানার। ওর দিকে তাকাল একবার। চোখ বুজে ছটফট করছে, বারবার পাশ ফিরছে, তন্দ্রার মধ্যে বিড়বিড় করছে। ক্যাকটাসের লম্বা কাণ্ড খাড়া করে পলিথিনের শীটটা টাঙিয়েছে রানা, ছায়ার ভেতর শুয়ে রয়েছে সোহানা।

এক ঘণ্টা হলো গর্তটা খুঁড়ছে রানা। দৈর্ঘ্যে ওটা দশ ফুট হলো, ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে, শেষ মাথার কাছে গভীরতা তিন ফুট। বিস্কিটের টিনটা খুলল ও, পলিথিন মোড়া খাবারগুলো বের করে ঢাকনির ওপর রাখল, খালি টিনটা নামিয়ে দিল গর্তের ভেতর। ছুরি দিয়ে কয়েকটা ক্যাকটাসের গা কাটল, টুকরোগুলো বসিয়ে দিল গর্তের ঢালু গায়ে, তারপর গর্তের ওপর চাপা দিল পলিথিন শীটটা। মাঝখানে খানিকটা ঝুলে পড়তে দিল ওটাকে। গর্তের কিনারায়, শীটের সবগুলো প্রান্তে, বালি চাপা দিল, তা না হলে গর্তের ভেতর পড়ে যেতে পারে ওটা। কয়েকটা নুড়ি পাথর রাখল মাঝখানে, মাঝখানটা যাতে আরেকটু নিচের দিকে ডেবে থাকে। কাজটা শেষ করে খুঁটিয়ে দেখল রানা, নিশ্চিত হলো পলিথিনটা নিচের টিন বা গর্তের পাশগুলো স্পর্শ করছে না। এরপর ছায়ায়, সোহানার পাশে ফিরে এল ও। চোখ বুজে এক এক করে দুশ্চিন্তাগুলো তাড়াল মন থেকে, শরীরের ব্যথা ও অস্বস্তি ভুলে যাবার চেষ্টা করল, ফলে ঘুম আসতে দেরি হলো না। মরুভূমিতে টিকে থাকতে হলে ঘুমের কোন বিকল্প নেই।

সারাটা দিন পলিথিন শীটের ভেতর দিয়ে রোদের তাপ নামল গর্তের নিচে, ক্যাকটাসের টুকরো ও ভেজা ভেজা বালি থেকে বাষ্প উঠল। বাষ্পগুলো জমাট বাঁধল পলিথিন শীটের উল্টোদিকে, ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে থাকল টিনে। সন্ধের

দিকে দুই কি তিন পাইন্ট পানি জমল ওটায়। খুব বেশি হয়তো নয়, তবে ওদের পানির সঞ্চয় খানিকটা বাড়ল বৈকি।

ধু-ধু মরু-প্রান্তরে রাত নামল। তারার মেলা বসল কালো আকাশে। পাশাপাশি শুয়ে ঘুমাচ্ছে ওরা।

পাঁচটনি ট্রাকের ওপরটা পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে। মালপত্রের ওপর ক্যানভাসের আবরণ, ফলে কাঠের বড় বাক্সগুলো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। কাঠের বাক্সগুলো ছাড়াও পেট্রল ও পানির ড্রাম তোলা হয়েছে ট্রাকে। ক্যাব-এর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাইথন, হাতে একটা সিগার, বিশাল মুখটা শান্ত ও নির্লিপ্ত।

উপত্যকার মুখ থেকে হেঁটে এল পেনিফিদার। পাইথনের দিকে তাকাল সে, চোখ ও চেহারায় ব্যঙ্গ মেশানো তৃপ্তির ভাব। দানবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর মুখ খুলল, 'ঠিক আছে। এবার আমরা রওনা হতে পারি।'

সবিনয়ে মাথা ঝাঁকাল পাইথন। 'অবশ্যই। আলজিরিয়ান বন্ধুদের কি হবে?'

'ল্যান্ড রোভার দুটো নিতে বলেছি ওদেরকে। যেদিক খুশি চলে যাক। এই ট্রাক নিয়ে এল গোলিয়া পর্যন্ত যেতে পারবে তো তুমি?'

'কোন সন্দেহ নেই।'

মিটিমিটি হাসল পেনিফিদার, চোখে কৌতুক। 'এখন আর তুমি ক্যানিং সাহেবের প্রিয়পাত্র নও। ব্যর্থ হবার পর কেমন লাগছে তোমার, পাইথন?'

'তোমার তাই মনে হচ্ছে বুঝি, আমি ব্যর্থ হয়েছি?' চুটকি মেরে সিগারের ছাই ঝাড়ল পাইথন, চেহারা আগের মতই নির্লিপ্ত। 'গুপ্তধন উদ্ধার করা হয়েছে, সেটা কার কৃতিত্ব?'

'কিন্তু ক্যানিং সাহেবকে বিপদে ফেলে দিয়েছ তুমি। রানা ও সোহানা মুখ খুলবে, কোন সন্দেহ নেই। হয়তো এই মুহূর্তে কথা বলছে তারা। ক্যানিং সাহেব অবশ্যই ফেঁসে যাবেন। আর সেজন্যে একা তুমি দায়ী।'

'হোয়াইটস্টোন আর তার দল যা-ই বলুক, ওগুলোর কোন অর্থ করা যাবে না। এখানে তাদেরকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে, এ-সবের সাথে ভিক্টর ক্যানিংকে জড়ানো সম্ভব নয়। মাসুদ রানা ও সোহানা চৌধুরী মুখ খুলবে?' মাথা নাড়ল পাইথন। 'আমার তা বিশ্বাস হয় না। যে-কোন সমস্যা সমাধানের নিজস্ব পদ্ধতি আছে ওদের। আমার ধারণা, ওদের নিয়তি ওদেরকে আমার কাছে টেনে নিয়ে আসবে। তারমানে আমার অসমাপ্ত কাজটা আমি সমাপ্ত করার সুযোগ পাব। সত্যি যদি মুখ খোলার ইচ্ছে ওদের থাকত, ক্রনেলের নোট-বুকটা নিয়ে যেত ওরা। বাকি থাকল বিল ওয়াটসন। তার পক্ষেও মুখ খোলা সম্ভব নয়, কারণ তাতে তার নিজের ভূমিকা ফাঁস হয়ে যাবে।' সামান্য হাসল পাইথন। 'আমার মনে হয় না ভিক্টর ক্যানিং কোন বিপদে পড়েছেন।'

'তা যদি না-ও পড়ে থাকেন, এরপর তিনি আর তোমাকে কোন কাজ দেবেন বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যে তিনি বুঝতে পেরেছেন, কাজের চেয়ে আনন্দ-

ফুর্তিকেই তুমি বেশি গুরুত্ব দাও।'

'আনন্দ-ফুর্তিই তো জীবন,' বলল পাইথন। 'আমি যে হাস্যরস ভালবাসি, তিনি জানেন। অভিযোগ করার সুযোগ আগে কখনও পাননি। আমরা কি এবার যাব?'

ক্যাব-এর ভেতর তাকাল পেনিফিদার। 'ক্রনেল কোথায়?'

চেহারায় অসন্তোষের ভাব, কাঁধ ঝাঁকাল পাইথন 'নিচে নোট-বুকে লেখার জন্যে সম্ভবত নাট-বল্টু গুনছে।'

ছয় চাকা ট্রাকের সামনে দিয়ে আরেক দিকে চলে এল পেনিফিদার। ট্রাকের তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে ক্রনেল, বাইরে শুধু বেরিয়ে আছে তার পা দুটো। কথা বলার জন্যে ঝুঁকল পেনিফিদার, কিন্তু গলায় আটকে গেল আওয়াজ, গলার ভেতরটা হঠাৎ করে ভয়ে শুকিয়ে গেল। ক্রনেলের শুয়ে থাকার মধ্যে অস্বাভাবিক একটা স্থির ভাব রয়েছে, বুট পরা পা দুটো একবারও নড়ছে না।

সিধে হচ্ছে পেনিফিদার, জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে অস্ত্রটা ধরতে যাচ্ছে, এই সময় পিছন থেকে তার ঘাড়টা এক হাতে আঁকড়ে ধরল পাইথন।

ঠাণ্ডা চাঁদের আলোয় তিন রাত হাঁটল ওরা। দিনের বেলা ছায়ায় বিশ্রাম নিয়েছে। অলস, আড়ষ্ট একটা ভঙ্গি এসে গেছে ওদের নড়াচড়ায়, প্রয়োজন না হলে কথা বলছে না।

দ্বিতীয় দিন একটু সুস্থবোধ করল সোহানা। তৃতীয় দিন অসুস্থতা বাড়ল। তারার ওপর সতর্ক চোখ রেখে দিক নির্ণয় করছে রানা।

চারদিনের দিন ভোর বেলা থামল ওরা, ধীরে ধীরে এক পাক ঘুরে ওদেরকে ঘিরে থাকা সীমাহীন প্রান্তরের সবগুলো দিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিল রানা। উত্তর-পশ্চিম দিকের একটা অংশ হাম্মাদা—কাত হয়ে থাকা মালভূমি ও গম্ভীরদর্শন পাথরের টাওয়ার জড়িয়ে আছে চক ও স্যান্ডস্টোনের সঙ্গে। দৃশ্যটার মধ্যে পরিচিত কি যেন একটা আছে বলে মনে হলো রানার। স্মৃতির পাতা ওল্টাতে শুরু করল ও। তারপর মনে পড়ে গেল।

দুর্গ। প্রাচীন ফরাসী দুর্গ। আকারে ছোট, গোটা সাহারা জুড়ে এরকম অনেকগুলোই ছড়িয়ে আছে। আরবরা ওগুলোকে বরদিয়া বলে। মেইন ট্রান্স-সাহারান রুট ধরে যারা আসা-যাওয়া করে, এ-ধরনের পরিত্যক্ত দুর্গে আজও আশ্রয় নিতে পারে তারা। পরিত্যক্ত হলেও, সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার প্রায় প্রতিটি দুর্গের জন্যে একজন করে পাহারাদার নিয়োগ করে, বিশেষ করে দুর্গটি যদি মরুপথের পাশে কোথাও থাকে।

বরদিয়া কেরিম। নামটা মনে পড়ল রানার। রেগুলার ক্যারাভান রুট থেকে অনেকটা দূরে নিঃসঙ্গ একটা আউটপোস্ট। চার বছর আগে দুর্গটায় হপ্তাখানেক থাকতে হয়েছিল ওকে। কপালে হাত রেখে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখার চেষ্টা করল ও। মরুভূমিতে দূরত্ব আন্দাজ করা সহজ কাজ নয়, তবু বুঝতে পারল হাম্মাদার শেষ প্রান্তে নিচু পাহাড়শ্রেণীর কিনারায় কোথাও আছে দুর্গটা, এখান থেকে সাত-

আট মাইলের কম নয়।

আপনমনে হাসল রানা, তাকাল সোহানার দিকে। চাদরের ভাঁজ খুলছিল ও, কিন্তু এই মুহূর্তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটা হাত মাথার মাঝখানে, নিজের চারদিকে কি যেন খুঁজছে ব্যাকুলদৃষ্টিতে। রানা ওর দিকে ফিরতেই জানতে চাইল, 'আশরাফ কোথায় গেছে বলো তো? আর জেনি?'

তলপেটের ভেতর ভয় যেন সাপের মত মোচড় খেল, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সোহানার অক্ষত হাতটা ধরে ফেলল রানা। কথা বলল স্বাভাবিক সুরে, 'ওরা ভাল আছে, সোহানা। আমাদের আগে চলে গেছে ওরা। এবার তোমার হাতটা একটু দেখি।'

'না, দরকার নেই, আমার হাত ভাল আছে,' খিটখিটে গলায় বলল সোহানা, যেন খুব বিরক্তি বোধ করছে। চোখের দৃষ্টি যেন কেমন, মনে হলো ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না।

'ভাল থাকলে তো ভালই, দেখলে ক্ষতি কি। কই, দাও।' সামান্য বাধা দিল সোহানা, ওকে বসাবার জন্যে একটু জোর খাটাতে হলো রানাকে। এই প্রথম অবাক হয়ে উপলব্ধি করল, অসম্ভব দুর্বল হয়ে পড়েছে সোহানা। পায়ের সামনে, জমিনের ওপর তাকিয়ে থাকল, রানাকে ওর কাজে বাধা দিল না। আলখেল্লা খুলে সরিয়ে রাখল রানা, তারপর শার্টের বোতামগুলো খুলল। আস্তিনটা কব্জি থেকে নামাবার সময় দু'বার ব্যথায় শিউরে উঠল সোহানা।

তাকিয়ে থাকল রানা, আশঙ্কায় ধক ধক করছে বুকের ভেতরটা। কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত ফুলে ঢোল হয়ে আছে হাতটা। ব্যান্ডেজের নিচে ফোলা মাংস প্রায় টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। শার্ট আর আলখেল্লা আবার পরিয়ে দিল ওকে। 'তোমার এই হাতটার যত্ন নিতে হবে, সোহানা।'

ভোঁতা দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল ও। মাথা ঝাঁকাল।

'কাছাকাছি একটা দুর্গ আছে। পৌঁছুতে দু'তিন ঘণ্টা লাগবে। ওখানে পানি পাব আমরা, আশ্রয় পাব।'

আশ্রয় অবশ্যই পাওয়া যাবে, আজও যদি দুর্গটা খাড়া থাকে। পানিও পাওয়া যাবে, কুয়াটা যদি শুকিয়ে গিয়ে না থাকে। মরুপথ থেকে এতটা দূরে দুর্গটায় কোন পাহারাদার থাকবে বলে আশা করা যায় না।

নির্দয় রোদের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা। পানির ক্যান, চাদর, খাবার ইত্যাদি শরীরের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে রানা। সোহানার অক্ষত হাতটা ধরে রেখেছে। রানার গায়ে প্রায় হেলান দিয়ে রয়েছে ও। পা ফেলছে এলোমেলো, অন্ধের মত। হোঁচট খাচ্ছে মাঝে মধ্যে।

ভাগ্য ভাল, দুর্গটা আজও ভেঙে পড়েনি। দীর্ঘ ঢালের মাথা থেকে নিচের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল রানা। ত্রিশ মিনিট পর গেটের ভেতর উঠানে ঢুকল ও সোহানাকে নিয়ে। গেট বলতে ভাঙা ইঁটের স্তূপ, দু'পাশে পাঁচিলের কোন অস্তিত্ব নেই। পাঁচিল ভেঙে ইঁটগুলো নিয়ে গেছে আরব বেদুইনরা। রানা ধারণা করল, দুর্গের ভেতরও কাজে লাগতে পারে এমন কিছু পাওয়া যাবে না।

উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। চারদিকে তাকিয়ে দেখল, সবই আছে, আবার কিছুই নেই। ওর সরাসরি সামনে, উঠানের মাঝখানে দু'তলা ভবন, তার পাশে সিঁড়ি, উঠে গেছে দুর্গের ছাদে। উঠানের দু'পাশে নিচু দু'সারি ব্যারাকরুম, অ্যামুনিশন স্টোর, আস্তাবল আর অফিসার্স কোয়ার্টার। সবই আছে, কিন্তু কোন কাঠ বা লোহার চিহ্নমাত্র নেই। একটা ঘরেরও দরজা দেখা যাচ্ছে না। ক্ষতবিক্ষত ইঁটের ও পাথরের গাঁথুনি ছাড়া আর কিছুই নেই।

শরীরে বাঁধা জিনিসগুলো এক এক করে নামাল রানা: সোহানাকে বুকে তুলে নিয়ে অফিসার্স কোয়ার্টারে চলে এল। ডান দিকে ঘুরে যাওয়া মোটা পাঁচিলের এক ধারে ছোট্ট একটা কামরা, ছায়ার ভেতর। কামরাটা তৈরি করা হয়েছিল মাটির অনেকটা নিচে থেকে, যাতে গরম কম লাগে। একই কোণে ইঁটের গাঁথুনি দিয়ে ঘেরা একটা ঘর রয়েছে, ভেতরে কুয়া। ঘরটার কাঠের ছাদ অদৃশ্য হয়েছে।

কুয়াটা পঞ্চাশ ফুট গভীর, পাথর ভেদ করে নেমে গেছে সোজা। নিচে পানির একটা স্রোত আছে, হাম্মাদা এলাকা থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। বেদুইনরা কাঠের মোটা তক্তাটা নিয়ে যায়নি, কুয়ার ওপর পড়ে রয়েছে সেটা। ওই ঢাকনি না থাকলে বালিতে ভরে যেত ভেতরটা।

কুয়ার সামনে কয়েক ফুট জায়গা জুড়ে কিছু মরু ঝোপ দেখা গেল। চার বছর আগে ওখানে খুদে একটা গোলাপ বাগান দেখেছিল রানা। সৌখিন কোন লোক দীর্ঘদিন ছিল হয়তো এখানে, বেদুইন শ্রমিকদের দিয়ে কুয়া থেকে পানি তুলিয়ে গোলাপ গাছের গোড়ায় ঢালত। গোলাপ গাছগুলোর আজ আর কোন অস্তিত্বই নেই, তবু জায়গাটা একটু ভেজা ভেজা হয়ে আছে, আধ ফুট লম্বা ঝোপ জন্মেছে কয়েকটা। তেতো আপেলের একটা গাছও দেখতে পেল রানা, পাশেই একটা শশা ও থালা গাছ।

রানার নির্বাচিত কামরাটা প্যাসেজের শেষ মাথায়, কয়েকটা ধাপ বেয়ে নামতে হয়। এই কামরার ওপর আরও দুটো ঘর আছে। ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা লাগল। কামরার একদিকের দেয়ালে লম্বা একটা গর্ত, আলোর কোন অভাব নেই। এককালে ওটা একটা জানালা ছিল।

দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল সোহানা। নরম বালির ওপর একটা কম্বল বিছাল রানা। বলতেই বাধ্য মেয়ের মত সেটার ওপর শুয়ে পড়ল সোহানা। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে কুয়াটা পরীক্ষা করল রানা। ছোট একটা পাথর ফেলল নিচে, ছলকে ওঠা পানির শব্দ পেল। প্রয়োজন হলে পানি তোলার ব্যবস্থা করা যাবে, আপাতত ক্যানের পানি খরচ হোক। ঘরে ফিরে এসে পাথর আর ছুরি ঘষে আগুন জ্বালল ও, টিনে পানি ফোটাতে শুরু করল। শার্টটা ছিঁড়ে অর্ধেকের বেশি ছেড়ে দিল ফুটন্ত পানিতে।

আবার কুয়ার কাছে ফিরে এল রানা। একটা ঝোপের কয়েকটা পাতা ছিঁড়ল। এই পাতা বেটে উটের ক্ষতস্থানে বেদুইনদের লাগাতে দেখেছে ও। জীবাণুমুক্ত তো করেই, ক্ষতগুলো সেরেও ওঠে দ্রুত।

পলিথিনে মোড়া অল্প কয়েকটা বিস্কিট এখনও আছে। তবে শুকিয়ে শক্ত হয়ে

গেছে সবগুলো। পানিতে ভিজিয়ে নরম করল। দশ মিনিট পর রশি বাঁধা গরম টিন নিয়ে সোহানার পাশে চলে এল রানা। চোখ মেলে তাকাল ও। জ্বরে লাল হয়ে আছে চোখ দুটো। মুখের ফর্সা রঙও টকটক করছে। 'কেমন আছ, রানা?' দুর্বলকণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'তুমি কেমন আছ, সোহানা?' গরম পানিতে ভিজিয়ে ওর হাতের ব্যান্ডেজটা খুলতে শুরু করল রানা। ফুলে ওঠা অংশের মাঝখানে হলুদ পুঁজ দেখে দম বন্ধ করল। জোর করে হাসল ও। 'মন্দ নয়। সামান্য একটু ব্যথা পাবে, সোহানা।'

'তুমি? আমাকে? ব্যথা দেবে?' দুর্বল হাসি ফুটল সোহানার ঠোঁটে। 'দাও!'

সদ্য শান দেয়া জীবাণুমুক্ত ছুরিটা ফুটন্ত টিনের পানি থেকে তুলল রানা। এটা তৃতীয়বার গরম করা পানি, দ্বিতীয়বার ফোটানো পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিয়েছে ও। ছুরির ডগা দিয়ে ক্ষতের ফুলে ওঠা চারপাশটা ছ'জায়গায় ছোট করে কাটল, তারপর মাঝখানটা কাটল একটু বড় করে। সোহানা নড়ল না, কথাও বলল না; প্রতিক্রিয়া বলতে ওর চোখে শুধু অকস্মাৎ একটা শূন্য দৃষ্টি ফুটে উঠল। কাপড় দিয়ে পুঁজ মুছল রানা, পরিষ্কার করল মুখগুলো, তারপর আবার চাপ দিয়ে পুঁজ ও রক্ত বের করল। ক্ষতের ভেতরটা যতক্ষণ না পুরোপুরি পরিষ্কার হলো, থামল না ও।

এক সময় আর পুঁজ বেরুল না, চাপ দিতে শুধু হড়হড় করে রক্ত বেরিয়ে এল। 'হাতটা নেড়ো না, ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে,' বিড়বিড় করল সোহানা।

কেটে আনা ঝোপের পাতাগুলো বেটে আগেই পেস্ট তৈরি করে রেখেছে রানা। ক্ষতের ওপর সেটা লেপে দিল, তার ওপর বসিয়ে দিল কাদা হয়ে ওঠা বিস্কিট। ব্যান্ডেজ বাঁধার সময়ও এক চুল নড়ল না সোহানা। যতক্ষণ বিস্কিট থাকবে, দু'ঘন্টা পর পর পুলটিসটা পাল্টে দিতে পারবে রানা। ও জানে, সোহানার শরীরের প্রতিরোধ শক্তি কম নয়, ভেষজ রসটুকু ক্ষতটাকে জীবাণুমুক্ত করতে সাহায্য করবে। আশা করা যায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সঙ্কট কেটে যাবে। বলল, 'তোমাকে প্রচুর পানি খেতে হবে, সোহানা। আছেও প্রচুর—কুয়াটায় এখনও হাত দিইনি।'

'ঠিক আছে।'

ওর মাথাটা কোলে তুলে নিল রানা, বোতল ভরা পানি ধরল মুখে। একটু একটু করে খেল সোহানা। 'লক্ষ্মী মেয়ে, এবার তুমি ঘুমোবে।' কোল থেকে মাথাটা নামিয়ে শুইয়ে দিল ওকে রানা।

চোখ বুজল সোহানা। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। কিছুক্ষণ পর উঠল ও, উঠানে বেরিয়ে এসে একটা চাদর ছিঁড়ে পাকাল, টিনটাকে কুয়ায় নামাতে হবে।

পরদিন ভোর হবার এক ঘণ্টা বাকি থাকতে রানা উপলব্ধি করল, সোহানার বিপদ কেটে গেছে। ক্ষতের চারপাশটা এখন আর আগের মত ফুলে নেই, চামড়াও এখন আগের মত লাল নয়। তবে জ্বরটা আছে, যদিও ঘুমাতে পারছে ও।

রানা জানে, ঘুম ভাঙার পর অসম্ভব দুর্বল লাগবে নিজেকে সোহানার। তবে সেটাও তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠবে ও। ওর শরীরে দ্রুত আরোগ্যলাভের শক্তি প্রচুর। সংক্রমণ ঠেকানো গেছে, কাজেই ওদের সামনে আর কোন বাধা নেই।

এখন প্রথম কাজ খাবার সংগ্রহ করা। এটা রানার জন্যে কোন সমস্যা নয়। যেভাবে হোক যোগাড় করবে। মাত্র দু'দিন পরই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে সোহানা। চারদিনের দিন আবার হাঁটতে পারবে আগের মত।

সারা রাত জেগে থাকায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রানা, ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। তবে মনে দুশ্চিন্তা না থাকায় ক্লান্তিটুকু উপভোগ্য লাগছে ওর। ভোর হবার খানিক পরই ঘুম ভাঙল সোহানার, মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ওর দিকে। গলাটা দুর্বল শোনাল, তবে প্রলাপ বকছে না। 'রানা, তোমাকে আমি খুব বিপদে ফেলে দিয়েছিলাম, না?'

'একটু। হাতটা কেমন লাগছে?'

হাতটা সামান্য একটু নাড়ল সোহানা, মৃদু হাসল। 'ভালই তো মনে হচ্ছে। তবে কেমন যেন আচ্ছন্ন বোধ করছি। আমরা কোথায় বলো তো?'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'তোমার জন্যে একটা দুর্গ বানিয়েছি আমি, তবে দরজা-জানালাগুলো এখনও লাগানো হয়নি। শুধু তোমার আর আমার জন্যে বানিয়েছি। আছিও শুধু আমরা দু'জন। পানির কোন অভাব নেই। আবার চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, চোখ বুজল। কুয়ার কাছে চলে এল রানা, পানি তুলতে হবে। নিজেকে তিরস্কার করল, ঘুমিয়ে পড়ার আগে সোহানাকে পানি খাওয়াতে ভুলে গেছে।

খানিক পর গোসল করে স্ল্যাকস আর বুট পরল রানা, শার্ট না থাকায় খালি গায়ে দুর্গের ভেতরটা ভাল করে ঘুরে দেখার জন্যে কামরা থেকে বেরিয়ে এল। দুর্গের মাথায় উঠে এসে পাথরবহুল হাম্মাদার দিকে তাকাল, ওদিকটাতেই যদি কিছু খাবার পাওয়া যায়। মরুভূমিতেও প্রাণীরা বসবাস করে, শুধু গিরগিটি বা ইঁদুর নয়, পাখি থেকে শুরু করে হরিণ পর্যন্ত অনেক কিছু পাওয়া যায়।

ভাঙাচোরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল রানা। এক কামরা থেকে আরেক কামরায় ঢুকল, আশা, কাজে লাগতে পারে এমন কিছু যদি পাওয়া যায়। পুরানো একটা চটের বস্তা পেলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাবে ও, শার্টের বদলে কাজ চালানো যাবে। খুশি হবে একটা বালতি পেলেও, কারণ বিস্কিটের টিনটা ফুটো হতে শুরু করেছে। মাটির তলায় পানির জন্যে ফাঁদ পাততে হলে একটা কিছু দরকার।

কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। লম্বা ব্যারাকরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা, অফিসার্স কোয়ার্টারের দিকে হাঁটছে। বেশি বেলা হয়নি, সম্ভবত দশটা বাজে। ঘুম পাচ্ছে ওর, শুতে পারলে মন্দ হয় না। সন্ধের আগে হাম্মাদা থেকে ঘুরে আসা যাবে একবার।

কুয়া থেকে বিশ পা দূরে রানা, এই সময় পাইথনের ভরাট, সকৌতুক কণ্ঠস্বর প্রচণ্ড ঘুসির মত আঘাত করল ওকে। 'তাহলে আবার আমাদের দেখা হলো। বেশ নাটকীয় একটা সংলাপ, কি বলো, মাসুদ রানা?'

ধীরে ধীরে ঘুরল রানা। উঠনের একধারে, একটা পাথুরে বেঞ্চের ওপর বসে রয়েছে দৈত্যটা। পরনে শ্ল্যাকস ও শার্ট, তবে মাথায় হ্যাট নেই। তার বুটে ধুলো থাকলেও, কোথাও ছেঁড়েনি।

ভেবে লাভ নেই দানবটা কিভাবে এখানে এল। এসেছে, এটাই বড় কথা। খালি গা, হাতে কোন অস্ত্র নেই, শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। হতাশা বিশাল একটা ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ছে ওর সমগ্র অস্তিত্বে।

'তাহলে তোমাকে একা ফেলে রেখে চলে গেছে ওরা?' হাসল পাইথন। 'তখুনি আমার বোঝা উচিত ছিল, অবশ্যই। ওদের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে ভারি। এমনকি আমাদের অন্যতম সেরা পাইলট ওয়াটসনের পক্ষেও জাদু দেখানো সম্ভব নয়।' চোখ নামিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকাল সে। 'খুবই অস্বস্তিবোধ করেছিলাম, পরদিন যখন ট্রলিটা খুঁজে পাওয়া গেল না। ওটা নিয়ে কি করেছ তুমি, মাসুদ রানা?'

রানা কথা বলল না। ক্ষীণ একটা আশার আলো জ্বলে উঠেছে ওর মনের এক কোণে। পাইথন ওকে একা পেয়েছে এখানে, ধরে নিয়েছে ওর সঙ্গে আর কেউ নেই। সেটাই স্বাভাবিক। আহত অবস্থায় সোহানা মরুভূমি পাড়ি দেবে, এটা কেউ আশা করতে পারে না, যদি না কোন বিকল্প থাকে।

পাইথনের জানার কথা নয়, আর কোন বিকল্প ছিল না।

'লাজুক ছেলেদের মত চুপ করে থেকো না,' বলল পাইথন। 'অন্তত এই কারণে তোমাকে আমি শাসন করব না। কি করেছ ট্রলিটা নিয়ে?'

'ওটাকে আমি স্যান্ড-ইয়ট বানিয়েছিলাম,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। 'আইডিয়াটা সোহানার। দশ দিনের হাঁটা পথ চব্বিশ ঘণ্টায় পেরিয়ে এসেছি।'

দামী পাথরের মত জ্বলজ্বল করে উঠল পাইথনের চোখ, হাসির দমকে কাঁপতে লাগল শরীরটা। 'তোমার বান্ধবী খুব চালাক। পরের বার আরও সাবধান হব আমি।' আবার ঘড়ি দেখল সে। 'অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আমার সময় খুব কম। কাজেই তোমার পিছনে খুব বেশি ব্যয় করতে পারব না। তবু, যতটুকু আছে, এসো দু'জন মিলে তার স্বাদ গ্রহণ করি। ভাবছি, কি সুবর্ণ ক্ষণেই না এখানটায় আমার থামতে ইচ্ছে করেছিল। অবশ্য পেনিফিদারকে বলছিলাম, তোমার নিয়তিই তোমাকে আমার কাছে টেনে আনবে। ঘটেছে অবশ্য উল্টোটা—তোমার নিয়তি আমাকে তোমার কাছে টেনে এনেছে। আশ্চর্য, কেন থামলাম আমি? এই দুর্গের তেমন কোন আর্কিওলজিকাল মেরিট নেই...' খোশ-গল্পের মেজাজে বকবক করে চলেছে সে।

আশার আলোটা বড় হচ্ছে রানার মনে। পাইথনের তাড়া আছে, দেখে মনে হচ্ছে সঙ্গে আর কেউ নেই। নিশ্চয়ই পায়ে হেঁটে মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছে না সে। দুর্গের বাইরে কোথাও একটা ট্রাক আছে। কিন্তু যদি ট্রাক নিয়ে এসে থাকে, শব্দ হয়নি কেন? প্রশ্নটা কঠিন নয়। মরুভূমিতে চলার সময় ড্রাইভার তার এঞ্জিনের যত্ন নেয়, বিশেষ করে রেডিয়েটর-এর। পার্ক করার সময় বনেট রাখে বাতাসের দিকে। ঢাল বেয়ে নামার সময় বন্ধ করে দেয় এঞ্জিন। দুর্গে পৌঁছুতে হলে দীর্ঘ

একটা ঢাল বেয়ে নামতে হয়। ট্রাকটা নেমে এসেছে নিঃশব্দে।

একটু পরই অসমাপ্ত কাজটায় হাত দেবে পাইথন, জানে রানা। শুরু করেছিল দশ বছর আগে, শেষ করবে সভ্যতা থেকে অনেক দূরে এই নির্জন খাঁ-খাঁ মরুতে। লড়বে ওরা। কিন্তু আসলে কি সেটাকে লড়াই বলা যাবে?

পাইথনের সঙ্গে পারার কথা রানা ভাবে না। যা সম্ভব নয়, বাস্তব নয়, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি। দানবটা ওর সঙ্গে লড়বে না, ওকে নিয়ে খেলবে। তার শরীরে দশজন লোকের শক্তি ধরে, কিংবা হয়তো আরও বেশি, ওকে অনায়াসে খুন করবে সে। তারপর ট্রাক নিয়ে চলে যাবে পাইথন। সময়ের অভাব, পরিত্যক্ত একটা দুর্গ ঘুরেফিরে দেখতে চাইবে না।

সোহানাকে পাবে না সে।

প্যাসেজের শেষ মাথায়, যে কামরায় ঘুমাচ্ছে সোহানা, ওর হাতের নাগালের মধ্যেই আছে ক্যান ভর্তি পানি আর অল্প কিছু খাবার। সোহানার জন্যে ওইটুকুই যথেষ্ট। ধীরে ধীরে, দু'চারদিনের মধ্যেই, নিজের শক্তি ফিরে পাবে ও। অস্তিত্ব রক্ষা করবে।

রানা জানতে চাইল, 'পেনিফিদার কোথায়?'

বকবক করছিল পাইথন, হঠাৎ থেমে ভুরু কোঁচকাল। 'মহান পেনিফিদার আর তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্রুনেল জীবনের বোঝা থেকে মুক্তিলাভ করেছে,' গম্ভীর সুরে বলল সে। 'কেউ কেউ ভেবেছিল অপরপ্রান্তে ওদের জন্যে রাজকীয় অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু আমি আমার অন্নদাতার সাথে একান্তে আলাপ করেছি, তাঁকে বুঝিয়েছি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঠিক কি করা উচিত। সে যাই হোক, তুমি আমাকে মাঝপথে বাধা দিয়েছ, রানা। এমন হতে পারে, এমন হওয়া কি সত্যি সম্ভব যে তোমাকে আমি যা মনে করিয়ে দিতে চাইছিলাম তার কিছুই তুমি শোননি?'

রানা কথা বলল না।

দাঁড়াল পাইথন, তার বিশাল দুই হাত ঝুলে পড়ল, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে রানার দিকে। 'আমার মুখ-নিঃসৃত মধুর বচন তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি, বোঝা গেল। কিন্তু তোমাকে তো বলেইছি, আমার হাতে সময় কম। এদিকে আমার পা দুটো নিশপিশ করছে তোমার পাঁজরগুলো ভাঙার জন্যে। তোমাকে আমি বলেছি, হাড় ভাঙার শব্দ শুনতে ভালবাসি আমি? বলিনি...?' হঠাৎ থেমে গেল সে, রানাকে ছাড়িয়ে আরও দূরে সরে গেল তার দৃষ্টি, চোখ দুটো সামান্য বড় হয়ে উঠল। 'দেখা যাচ্ছে,' উল্লাসে অধীর শোনাল তার কণ্ঠস্বর, 'মাসুদ রানা একা নয়, সাথে সোহানা চৌধুরীও আছে। রানা, সত্যি খুশি হলাম। কারণ, দেখা যাচ্ছে, আমার ভয়ে তুমি বুদ্ধি হারাওনি। তোমার মাথাটা কাজ করছে। তুমি আমাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করেছ। আশা করি, যতটুকুই শক্তি রাখো, পারো আর না পারো, অন্তত আমার সাথে লড়তে চেষ্টা করবে তুমি!'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, হতাশা ও প্রচণ্ড রাগে অসুস্থবোধ করল। প্যাসেজের শেষ মাথায়, দরজার বাইরে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে

এসেছে সোহানা, বিশ গজ দূরে। মুখটা ফ্যাকাসে, চোখ দুটো বড় বড়। সোহানার গায়ে শার্ট নেই, বাহুর ব্যান্ডেজটা দেখা যাচ্ছে। একমাত্র আল্লাহই বলতে পারে কিভাবে ওর ঘুম ভাঙল। সম্ভবত জানালা দিয়ে পাইথনের গলার আওয়াজ পেয়েছে ও, ধাপ ক'টা টপকে উঠে এসেছে, দরজা পেরিয়ে বেরিয়ে এসেছে প্যাসেজে।

রানা বা পাইথন, কেউ নড়ল না। ধীরে ধীরে, অনেক কষ্টে, দরজার পাশে হেলান দিয়ে বসল সোহানা, তাকিয়ে আছে রানার দিকে, হাত দুটো কোলের ওপর। সমস্ত শক্তি এক করে গলায় জোর আনার চেষ্টা করল ও, বলল, 'এবার তোমাকে জিততে হবে, রানা।'

হেসে উঠল পাইথন। রানার অস্তিত্বের গভীরে হিংস্র একটা পশু গর্জে উঠল, ওর চেহারা হয়ে উঠল আশ্চর্য শান্ত। হঠাৎ মাথার ভেতরটা স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়ে গেছে। নিজের কথা ভাবছে না ও। ভাবছে সোহানার কথা। ওকে বাঁচাতে হবে।

বেশ। তাই হোক।

পাইথনের কাছাকাছি হওয়া মানে আত্মহত্যা করা। তার নাগালের মধ্যে কোনভাবেই যাওয়া চলবে না। গরিলার হাত দুটো অসম্ভব ক্ষিপ্র। ওই হাতে একবার যদি শক্ত করে ধরতে পারে সে, মাসুদ রানা স্রেফ মারা যাবে। হাত দুটো অস্বাভাবিক লম্বা, কিভাবে ওগুলোর কাছ থেকে দূরে সরে থাকা যায়? ওই হাতে একবার যদি ধরা পড়ে ও...।

হ্যাঁ, হাত দুটো। হ্যাঁ।

ধীরে ধীরে সামনে বাড়তে শুরু করল রানা, শরীরটা ঝুঁকে আছে, হাত দুটো সামনে বাড়ানো। হাসল পাইথন, যেন বাচ্চা একটা ছেলের খেলা দেখছে। সে-ও হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিল, একটু নিচের দিকে রাখল ওগুলো, তলপেটের নিচের অংশটা সুরক্ষিত করার জন্যে। তার হাতের আঙুল ছড়িয়ে আছে, লোহার আঙটার মত বাঁকানো।

অ্যাক্রোব্যাটদের প্রিয় একটা মুভ হলো নিতম্বে ভর দিয়ে শরীরটাকে চরকির মত ঘোরানো। দূরত্বটা মেপে নিল রানা, তারপর হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। শরীরটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল, শূন্যে ডিগবাজি খেল একটা, ঘুরে গেল, ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত লম্বা হলো পা, পাইথনের ডান হাতে আঘাত করল বুট, সেই একই মুহূর্তে মাটিতে তালু ঠেকিয়ে শরীরটা আবার ঘোরাল ও, নাগালের অনেক বাইরে সরে এল।

রশির মাথায় বাঁধা ভারি পাথরের মত বুটটা আঘাত করছে পাইথনের হাতে, হাড় ভাঙার আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে রানা। এখনও হাসছে পাইথন, তবে সামান্য হলেও আড়ষ্ট সেটা। হাতটা ঝাড়া দিল সে, যেন কোন অনুভূতি আছে কিনা পরীক্ষা করল। তারপর আবার সামনে বাড়তে শুরু করল, এবার আগের চেয়ে দ্রুত।

আবার হাতের ওপর ভর দিয়ে জোড়া পা ছুঁড়ল রানা। ঝট করে হাত দুটো বুকের কাছে টেনে নিল পাইথন। জমিনে ড্রপ খেয়ে শূন্যে উঠল রানা, দুই পা এক করে প্রচণ্ড বেগে ছুঁড়ল—মাথায় নয়, পাইথনের হাতে। চওড়া বুকের সঙ্গে সেঁটে

থাকা মোটা হাত দুটো থেঁতলে দিল।

হোঁচট খেয়ে এক পা পিছু হটল পাইথন, তবে দাঁড়িয়ে থাকল সিধে হয়ে। অন্য কেউ হলে ছিটকে পড়ত মাটিতে।

এত দূর থেকেও হাড় ভাঙার শব্দটা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে সোহানা। ওর শরীরে শক্তি বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই, রানাকে কোনভাবেই সাহায্য করতে পারবে না। ক্রল করে দিনের আলোতে বেরিয়ে আসার আগে ঝাপসা দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়েছে রানার ছুরিটা দেখতে পাবার জন্যে, কিন্তু খোঁজার মত সময় ছিল না। পেলেও কোন কাজে আসত বলে মনে হয় না, রানার দিকে ছুঁড়ে দিতে পারত না।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড হলো শুরু হয়েছে ওদের লড়াই, তবু প্যাটার্নটা ধরতে পারছে সোহানা। পাইথনের হাত দুটো অকেজো করতে চাইছে রানা। কৌশল হিসেবে খুবই কঠিন, লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ ও অসম্ভব ক্ষিপ্র একজন ফাইটারের পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব শুধু। এরইমধ্যে প্রতিপক্ষের খানিকটা ক্ষতি করেছে বটে রানা, তবে তারমানে এই নয় যে সুবিধেজনক অবস্থায় পৌঁছুতে পেরেছে। দু'জনের শক্তির মধ্যে ভারসাম্য আনতে হলে পাইথনের আরও অনেক ক্ষতি করতে হবে রানাকে। তবে একই পদ্ধতিতে তাকে দু'বার বোকা বানান যাবে না। নতুন কোন অপ্রত্যাশিত কৌশলে কাজটা করতে হবে রানাকে। দানবের ওই বিশাল হাত দুটোকে আঘাত করতে হবে, একই সঙ্গে দূরে সরে থাকতে হবে ওগুলোর মুঠো থেকে।

দুজনেই ঘুরছে ওরা, আক্রমণাত্মক ভঙ্গি। রানার ঘোরার গতি বাড়ল, মনে হলো পিছলে গেলো। শরীরের নিচে থেকে ছিটকে গেল পা, জমিনে পিঠ দিয়ে পড়ল ও। সামনে ও নিচের দিকে লাফ দিল পাইথন। রানার পায়ে দ্বিতীয়বার বিদ্যুৎ খেলে গেল, প্রতিপক্ষের তলপেটের নিচেটা ওর লক্ষ্য। দানবের প্রকাণ্ড হাত দ্রুত উরুসন্ধি আড়াল করল। কিন্তু রানার লাথিটা ছিল অসময়োচিত, আড়ষ্ট ও স্রেফ একটা ভান, আসল লাথিটা এল আধ সেকেন্ড পরে, আড়াআড়ি দুই হাতের ওপর, পাইথনের ডান হাতের আঙুলগুলো থেঁতলে দিল রানার গোড়ালি। সাবলীল গড়ান দিয়ে এক লাফে সিধে হলো রানা, সরে এল নাগালের বাইরে।

লড়াইটা কুৎসিত হয়ে উঠছে। দু'জন মানুষ যখন খালি হাতে পরস্পরকে খুন করার চেষ্টা করে, ব্যাপারটা কুৎসিত না হয়ে পারে না। পাইথন তার হাত দুটোকে মুগুর হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করল। আক্রমণ বন্ধ করে ঠেকাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা, ঠেকাচ্ছে বুট দিয়ে, সংঘর্ষে প্রচণ্ডতা আনার জন্যে একা শুধু পাইথনকে শক্তি ব্যয় করতে দিচ্ছে।

কিন্তু একবার একটা মুগুরের বাড়ি ঘষা খেল ওর কাঁধে, চোখের পলকে পড়ে গেল রানা। ওই অতিকায় শরীর নিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে লাথি মারার জন্যে লাফ দিল পাইথন। এখন ওটাকে ঠেকাতে যাওয়া মানে হাত ভাঙার ঝুঁকি নেয়া, তার বদলে লাথিটা শরীরে গ্রহণ করল রানা, তবে গ্রহণ করল দ্রুত গড়াতে শুরু করে, ফলে পিঠের খানিকটা চামড়া উঠে গেলেও কোন হাড় ভাঙল না।

আরেকবার রানার জন্যে চমৎকার একটা ফাঁদ পাতল পাইথন। ওকে নাগালের মধ্যে পাবার জন্যে হঠাৎ ঘুরে সোহানার দিকে ছুটল সে। হিংস্র চিতার মত আকাশ থেকে তার পিঠে নামল রানা, হাঁটু ভাঁজ করা, আঙুল ডেবে গেল ব-দ্বীপ আকৃতির পেশীতে। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে একটা হাত আনল পাইথন রানাকে ধরার জন্যে, এক হাতে তাকে ধরে থেকে অপর হাতের কিনারা দিয়ে পাইথনের আঙুলগুলোয় আঘাত করল রানা, বারবার, যতক্ষণ না ব্যথা ও আক্রোশে গর্জে উঠল পাইথন। পিছন দিকে লাফ দিল সে, মাটিতে আছাড় খাবে, শরীরের ভারে পিষে ফেলবে রানাকে। জমিন আর পাইথনের মাঝখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল রানা, মাটিতে পড়ল উবু হয়ে, পাইথন সিধে হতেই আবার তার হাতে লাথি মারল।

লড়াই যতই দীর্ঘ হচ্ছে, দু'জনের গতিবিধি সম্পর্কে ততই ঝাপসা হয়ে আসছে সোহানার ধারণা। লড়াই হচ্ছে একটা গরিলার সঙ্গে মানুষের। কমব্যাট টেকনিক খুব কমই জানে পাইথন, এ-সব তার কখনও প্রয়োজনও হয়নি। স্রেফ তার শক্তিই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে এতদিন। কোন মানুষ একটা গরিলার হাত বা ঘাড় মোচড় দিয়ে ভাঙতে পারে না, কারাতের কোন মার দিয়েও তাকে কাবু করা সম্ভব নয়, উচিত নয় তার নাগালের মধ্যে যাবার সাহস করা।

যে পদ্ধতিটা রানা বেছে নিয়েছে, সেটা থেকে সুফল পেতে হলে ঝুঁকি নিতে হবে ওকে চুলচেরা হিসেব করে। ওর শরীরে লাল লম্বা একটা রক্তের ধারা গড়াতে শুরু করেছে, আরেক জায়গায় চামড়া ফুলে উঠে গোলাপি হয়ে গেছে। ওই দু'জায়গায় পাইথনের আঙুল ও মুঠো শুধু ঘষা খেয়েছে, ঠিকমত লাগেনি। ঠিকমত লাগল না, এরকম আঘাত একের পর এক অনেকগুলো সহ্য করতে হলো রানাকে। এই লড়াই যে কখন শেষ হবে, কেউ বলতে পারে না। কারণ শেষ করার জন্যে রানাকে নাগালের মধ্যে পেতে হবে পাইথনকে, কিন্তু রানা তার হাতে ধরা দেবে না। সারা শরীরে রক্ত ঝরছে, তবে রানাও মাঝে মধ্যে দু'একটা আঘাত ওর নির্বাচিত লক্ষ্যস্থলে লাগাতে পারল। হাতে।

তারপর রানার হিসেবে সামান্য ভুল হয়ে গেল। ওর একটা কব্জিতে লোহার আঙটার মত কামড় দিল পাইথনের হাত। তবে হাতটা এখন থেঁতলানো ও রক্তাক্ত। একটা আঙুল অস্বাভাবিক বাঁকা হয়ে বাকিগুলোর কাছ থেকে সরে আছে। প্রাণপণ শক্তিতে নিজের কব্জি মোচড়াল রানা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছাড়িয়ে নিল। পিছু হটল ও, এবং এই প্রথমবার সঙ্গে সঙ্গে নাগালের বাইরে সরে এল না। শান্ত, সন্ধানী দৃষ্টিতে দৈত্যটার দিকে তাকাল ও।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মিটমিট করল পাইথন। ক্ষতবিক্ষত হাতটা তুলল সে, দেখল। কিছু একটা ঘটল তার মুখে। দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড পর হাসল সে। সিনথেটিক মুখ-ভেঙচানো বলা যায়, কৌতুকে ভরপুর ও চরম আত্মবিশ্বাসে ভরাট হাসি, দীর্ঘ বহু বছর ধরে চর্চা করার ফলে ইচ্ছে করলেই অনায়াসে হাসতে পারে। 'আমার ধারণা,' বলল সে, একটু ভারি নিঃশ্বাস ফেলছে। 'আমার ধারণা, সত্যি বলছি, ড্র করার কৃতিত্ব দেখিয়েছ তুমি।'

রানার সবুট পা সরাসরি তার মুখে আঘাত করল। অন্ধের মত পিছন দিকে হোঁচট খেল পাইথন, গলা থেকে উঠে এল দুর্বোধ পশুর আওয়াজ, শেষ হলো ফোঁপানোর কাছাকাছি একটা শব্দ করে।

দেয়ালের গায়ে নেতিয়ে পড়ল সোহানা। ও বিশ্বাস করে, রানা কোনভাবেই জিততে পারবে না। এমন কি এখনও, যখন এ-ব্যাপারে আর প্রায় কোন সন্দেহই নেই, উল্টোটা বিশ্বাস করতে ওর মন সায় দিল না। পাইথনের আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে; তার অস্ত্র, অস্বাভাবিক দীর্ঘ বাহুর শেষ মাথায় হাত দুটো, ভেঙে গেছে।

মুহূর্তের জন্যে চোখ দুটো বন্ধ করল সোহানা। আবার চোখ মেলে যা দেখল, নিজেকে মনে হলো হ্যালুসিনেশনের শিকার। প্রকাণ্ড দৈত্যের গোটা কাঠামো শূন্যে খাড়াভাবে ঝুলছে, মাথাটা নিচের দিকে, জমিন থেকে এক গজ ওপরে। ঝুঁকে রয়েছে রানা, সিধে করা একটা মাত্র পায়ে ভর দিয়ে, এক হাতে ধরে রেখেছে পাইথনের মাথাটা।

কি ঘটেছে বুঝতে পারল সোহানা। এটাকে বলা হয় স্প্রিঙ-হিপ থ্রো, অত্যন্ত কঠিন একটা কৌশল। এক পায়ে নিখুঁতভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে, একই সঙ্গে স্প্রিঙ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে দ্বিতীয় পা, হাঁটু ভাঁজ করে সামনের ও ওপরের দিকে ঠেলে দিয়ে আঘাত করতে হবে প্রতিপক্ষের পেটে, যাতে তার শরীরের নিচের দিক ও পা-গুলো সবেগে উঠে যায় শূন্যে। পাইথন প্রায় তিনশো পাউণ্ড, তবু কাজটা করতে পেরেছে রানা। করেছেও উল্টোদিক থেকে, পাইথনের পিছনে দাঁড়িয়ে। এক সেকেণ্ডের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ সময় নিয়েছে রানা, আর ঠিক ওই মাহেন্দ্র ক্ষণটিতেই চোখ বুজে ছিল সোহানা।

এই মুহূর্তে, এখনও রানা ছাড়েনি, ভাঁজ করা একটা হাঁটু জমিনে গেড়ে শরীরটা নিচু করল ও, ঠিক যখন পতন ঘটল পাইথনের। পাইথন খাড়াভাবে পড়ল, প্রথমে মাথাটা। পাথুরে জমিন থরথর করে কেঁপে উঠল। আরেকটা কাঁপুনি উঠল জমিন থেকে, গোড়া কাটা গাছের মত ভূপাতিত হলো দানব।

মাটিতে এক হাঁটু গেড়ে স্থির হয়ে থাকল রানা, ফুসফুসে ঝড় তুলছে বাতাস। তারপর, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল, প্রতিপক্ষের মৃত্যু। বেশি সময় লাগল না। খুলিটা ভেতর দিকে ডেবে আছে। ভেঙে গেছে ঘাড়। দু'পায়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল ও, মুখ তুলে তাকাল সোহানার দিকে, দুর্বলভাবে ডান হাতটা একবার নাড়ল।

তারপর, এতক্ষণে, প্রতিক্রিয়া হলো রানার। যেন হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে কাঁপুনি ধরে গেল শরীরে। যা ঘটতে পারত, কিন্তু ঘটেনি, কল্পনা করে আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল ওর মন। সামান্য টলছে, রক্তাক্ত বুক ঘন ঘন ফুলে উঠছে; সোহানার দিকে তাকিয়ে আছে আচ্ছন্নের মত। এর আগে সম্ভবত এভাবে কখনও সোহানার সঙ্গে কথা বলেনি ও, এই সুরে বা এই ভাষায়। 'তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছিলে, ওভাবে বেরিয়ে এলে যে? ঘরটার ভেতর সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলে তুমি। বেরিয়ে এসেছিলে কি মরার জন্যে? পাইথনকে তুমি চেনো না, জানো না কি করত তোমাকে নিয়ে?' ধুলো, রক্ত আর ঘামে ভেজা চুলে আঙুল চালাল রানা। 'তুমি ভালভাবেই জানতে,

মিরাকুলাস কিছু একটা না ঘটলে লোকটার সাথে আমার পারার কথা নয়…ফর গডস সেক, এরকম ঝুঁকি আর কখনও নিয়ো না!'

সোহানার ভেতর থেকে কাঁপা কাঁপা একটা হাসি উঠে এল, কিন্তু দুর্বলতার কারণে আওয়াজটা ফুটল না। নিচের ঠোঁটটা এক সেকেন্ডের জন্যে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল ও, চোখ দুটো বন্ধ করল, কুঁচকে থাকল পাতা। তারপরও পানির দুটো ধারা নেমে এল গাল বেয়ে। 'আমাকে বকো না, রানা…,' তারপর আর আওয়াজ বেরুল না।

হাঁটু গেড়ে নিচু হলো রানা, হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সোহানাকে। 'দুঃখিত, সত্যি দুঃখিত। ইজি। এভরিথিং'স ফাইন।' কান্নার ঝোঁকটা না থামা পর্যন্ত সোহানাকে শক্ত করে ধরে রাখল ও, তারপর দু'হাতের ওপর তুলে নিল শরীরটা। 'চলো, তোমাকে শুইয়ে দিই। চারদিকটা একবার ঘুরে দেখতে হবে। দিনটা আজ আমাদের জন্যে ভাল মনে হচ্ছে।'

পাঁচ মিনিট পর, ঠাণ্ডা কামরায় শুয়ে, ট্রাকের আওয়াজ শুনতে পেল সোহানা, উঠনে এসে ঢুকল। ভেতরে এসে ওর সামনে দাঁড়াল রানা, হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা। 'প্রথমে শোনো, ডিনারে আজ কি খাব আমরা,' বলল রানা, বসে পড়ল সোহানার পাশে, ওর একটা হাত তুলে নিল। 'চিকেন সুপ, গ্রীন ভেজিটেবল। টিনের খাবার, তবু। বিস্কিট, চকলেট, ফল, পনির, নারকেল, খই। যা খুশি অর্ডার করো, পেয়ে যাবে। দু'দিনের মধ্যে বাঘের সাথে লড়াই করার শক্তি এসে যাবে তোমার শরীরে।'

রানার চোখে চোখ রেখে হাসল সোহানা। 'আমি জানতাম—তুমি যখন আছ, সব ব্যবস্থাই হবে।'

'রাখো তোমার ঠাট্টা।' হাসল রানাও। 'এ সবে শুরু। আরও কি কি পেয়েছি শোনো। অস্ত্র, আমাদের কাপড়চোপড় ভরা স্যুটকেস, মেডিকেল-কিট। ত্রিশ গ্যালন পানি, হ্যান্ডব্যাগ, প্রচুর পেট্রল, তেরপল, কম্বল, স্লিপিংব্যাগ ইত্যাদি ইত্যাদি।'

ট্রাকটার কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? ওটাই তো আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।'

'শুধু কি ট্রাক? আগে দেখ, তারপর…তারপরও বিশ্বাস করবে কি না সন্দেহ। পাঁচ টনী ট্রাক, ছ'টা চাকা। পাঁচ টন, কিন্তু কার্গো ভরা হয়েছে সম্ভবত সাত টনের ওপর, বেশিরভাগই…থাক, নিজের চোখেই দেখবে। ভাল কথা, ট্রাকে একটা ফ্রিজও আছে, ব্যাটারিতে চলে।'

রানার শরীরে চোখ বুলাল সোহানা। 'আগে মেডিকেল-কিটটা নিয়ে এসো, রানা। নিজের যত্ন নাও।'

'শিওর।' দাঁড়াল রানা। 'পাইথনকে সরাতে হবে, তারপর ট্রাকে আর কি আছে দেখব। প্রকাণ্ড আকারের তিনটে কাঠের বাক্স রয়েছে। ভেতরে কি আছে জানি না।'

আবার হেসে উঠল সোহানা, এবার আওয়াজটা ফুটল। 'কি আছে কল্পনা করে নাও।'

'ডোমিটিয়ান মাসের কথা আমি ভুলিনি,' বলল রানা, হাসছে। 'হ্যাঁ, ওগুলোয় সম্ভবত গুপ্তধনই আছে।'

'কিছু কাপড়ও এনো, রানা,' বলল সোহানা। 'আর সাবান। কুয়ার পানিতে গোসল করব আমি। তবে প্রথমে ওষুধ লাগাও গায়ে।'

এক ঘণ্টা পর সোহানাকে পাঁজাকোলা করে কুয়ার কাছে নিয়ে এল রানা। রোদে গরম করা পানিতে ওকে গোসল করিয়ে দিল। অ্যান্টিবায়োটিক অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে নতুন করে ব্যান্ডেজ করল ক্ষতটা। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে বেণী করল এক জোড়া। নিজের হাতে কাপড় পরাল। তারপর ফিরিয়ে আনল ঠাণ্ডা কামরাটায়। বলল, 'আগামী দুটো দিন রাক্ষসীর মত খাবে, মরা কাঠের মত ঘুমোবে। তারপর আমরা নিজেদের পথে রওনা হব।' বড় করে নিঃশাস ফেলল রানা, চেহারায় সন্তুষ্টি। 'আমাদের কাজ প্রায় শেষ।'

'প্রায়,' বলল সোহানা, চোখে আদর নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'বাকি শুধু ভিক্টর ক্যানিং-এর সাথে বোঝাপড়া।'

দশ

'আমার ধারণা ছিল আপনারা আরও আগে আসবেন,' বললেন স্যার ভিক্টর ক্যানিং। 'প্রায় এক মাসের মত হতে চলল না!'

মাথা ঝাঁকালেন বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলো, কথা বললেন না। তাঞ্জিয়ার থেকে রানা তাঁকে ফোন করেছে আজ ছাব্বিশ দিন হলো।

ওঁদের নিচে দীর্ঘ খালি সৈকত, চিকচিক করছে। ক্যানেস ও সেন্ট রাফায়েল-র মাঝখানে ছোট্ট একটা খাঁড়ি এটা। ক্যানিং'স বে। পাহাড়ের ঢালু মাথায় ঝুলে আছে লাল টালির ভিলাটা, শান্ত সাগর থেকে পঞ্চাশ ফুট ওপরে। গ্রীষ্মের সূর্য প্রখর রোদ ছড়াচ্ছে। তীর্যকভাবে নেমে আসা সিঁড়ির ধাপগুলো চলে গেছে সোজা বোটহাউসের দিকে, পাশেই জেটি।

টেরেসে বসে রয়েছেন ওঁরা, দু'জনের মাঝখানে একটা নিচু টেবিল। মারভিন লংফেলোর পরনে লাইটওয়েট নেভী স্যুট, সাদা শার্ট ও ক্লাব টাই। ভিক্টর ক্যানিং পরে আছেন সাদা টাওয়েলিং বীচ-রোব, আলখেল্লার মত দেখতে। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন তিনি। 'এটা কি অফিশিয়াল ভিজিট, মি. লংফেলো?'

মাথা নাড়লেন বিএসএস চীফ। 'অফিশিয়ালি কেউ আপনার কাছে আসবে না। প্রফেসর হোয়াইটস্টোন আর তাঁর টিমের লোকজন পুলিসকে যা বলেছেন, সে-সব তো খবরের কাগজেই আপনি পড়েছেন। একদল লোক মাস দখল করে নেয়, তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। তাদের বক্তব্যের অনেকটাই দুর্বোধ্য।'

'হ্যাঁ, দুর্বোধ্য হবারই কথা,' ভিক্টর ক্যানিং একমত হলেন। 'আশরাফ চৌধুরী আর অন্ধ মেয়েটা?'

'তাঁরা কিছু বলেননি। মানে আমাকে ছাড়া আর কি। তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন মি. রানা ও মিস. সোহানার ফেরার জন্যে।' এক সেকেন্ড বিরতি নিয়ে আবার বললেন মারভিন লংফেলো। 'দু'হপ্তা আগে ফিরেছেন ওঁরা।'

ভিক্টর ক্যানিং বললেন, 'আচ্ছা।' সাগরের দিকে তাকিয়ে আছেন, চেহারা দেখে বোঝা গেল না কি ভাবছেন। 'যেভাবেই হোক, কারও চোখে ধরা পড়েননি ওঁরা। পাইথনের কোন খবর জানেন ওঁরা?'

'হ্যাঁ, জানেন। পেনিফিদার আর ক্রনেলকে খুন করে সে। ধরে নেয়া চলে আপনারই নির্দেশে—পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে। তারপর মাল ভর্তি একটা ট্রাক নিয়ে রওনা হয় সে। কোথায় যাচ্ছিল, আমার কোন ধারণা নেই, তবে আপনি সম্ভবত জানেন। মি. রানা ও মিস. সোহানার সাথে তার দেখা হয়। এই মুহূর্তে সাহারার কোথাও আছে, মাটির তলায়। না, কবরটা চিহ্নিত করা হয়নি—মানে, আমি যতটুকু জানি।'

'আর ট্রাকের মালপত্র?'

'ধরে নেয়া চলে তা-ও মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়েছে। মালপত্রের বিশেষ অংশটুকু আর কি।'

'আচ্ছা।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন ভিক্টর ক্যানিং। তাঁর চেহারায় তিক্ত পরাজয় বা হতাশার কোন ছাপ নেই। অবশেষে মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, পাইথনকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। ঠিক কে তাকে…ঠিক কে তার ব্যবস্থা করল?'

'মি. রানা, আমার ধারণা।'

মারভিন লংফেলোর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন ভিক্টর ক্যানিং। 'আপনার প্রভাব সম্পর্কে সবই আমি জানি। যে-কোন মুহূর্তে প্রাইম মিনিস্টারের সাথে দেখা করতে পারেন, দশ নাম্বারের দরজা আপনার জন্যে সব সময় খোলা। তারপরও বলছি, আপনি যদি আমার সাথে লাগালাগি করতে চান, আপনাকে হার মানতে হবে। আমার আছে, সংবাদপত্রের ভাষায়, একটা বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপায়ার। এই সাম্রাজ্য আমাকে গোপন অনেক প্রভাব এনে দিয়েছে, আপনার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী আমি। তাছাড়া, আপনার কথা সংশ্লিষ্ট মহলকে বিশ্বাস করানো যাবে বলে মনে হয় না, মি. লংফেলো। কিছু কিছু ব্যাপার কখনোই বিশ্বাসযোগ্য হয় না।'

'সম্পূর্ণ সত্যি। দীর্ঘকাল ধরে এই বাস্তবতাই আপনাকে শক্তি যুগিয়েছে, আমার ধারণা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার হাতঘড়ি দেখলেন ভিক্টর ক্যানিং। 'বেলা এগারোটায় সাঁতার কাটা আমার অনেক দিনের পুরানো অভ্যেস। কাজেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে মাফ করার অনুরোধ জানাব আপনাকে। তার আগে দয়া করে বলবেন কি, কেন আপনি এসেছেন?'

কপালে হাত রেখে দূরে তাকালেন মারভিন লংফেলো, সাগরের একটা জাহাজ দেখার চেষ্টা করছেন। দিগন্তের কাছে দুলছে ওটা। 'আগেকার দিনে,' তিনি

বললেন, 'খানিকটা খেয়ালী হলেও, খুবই কাজের ও সিভিলাইজড একটা রীতির চল ছিল। মেসের ফান্ড মেরে দিয়ে ধরা পড়লে বা এ-ধরনের কোন কাজে দায়ী বলে সাব্যস্ত হলে, হাতে একটা রিভলভার ধরিয়ে দিয়ে তাকে বেডরুমে ফিরে যেতে বলা হত। মর্যাদা হারাবার চেয়ে খুলি ফুটো করে সমস্যার সমাধান করার সুযোগ পেত সে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ভিক্টর ক্যানিং। 'আপনার কথাই ঠিক—কাজের, কিন্তু সেকেলে। তাছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা, ফাঁস হয়ে যাবার কোন ঝুঁকি আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার মর্যাদাও ক্ষুণ্ন হতে যাচ্ছে না। পরিস্থিতিটা এমন নয় যে নিজের খুলি ফুটো করে সমস্যার সমাধান করতে হবে আমাকে। আমি তো কোন সমস্যাই দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমি পাচ্ছি,' হাসিমুখে বললেন মারভিন লংফেলো। 'আপনি তা না করলে মি. রানা আপনাকে খুন করবেন।'

চোখে কৌতূহল, তাকিয়ে থাকলেন ভিক্টর ক্যানিং। 'প্রতিশোধ? ঈর্ষা? আক্রোশ? নাকি স্রেফ আত্মরক্ষা?'

হেসে উঠলেন মারভিন লংফেলো। 'ওগুলোর কোনটাই নয়। তাঁর সাথে এ-ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছি আমি। মি. রানা চান না আপনি বেঁচে থাকুন। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, বেঁচে থাকলে আপনি আরও অনেক মানুষকে মারবেন। নিরীহ, নিরপেক্ষ মানুষদের। যেমন মেরেছেন ড. জিমসনকে, জুলি উডহাউসকে। যেমন, বাধা দেয়া না হলে, মারতেন প্রফেসর হোয়াইটস্টোন আর তাঁর আর্কিওলজিকাল টিমের সদস্যদের। সেজন্যেই আপনাকে মারতে চান মি. রানা। আপনাকে থামানোর জন্যে।'

কাঁধ দুটো উঁচু করলেন ভিক্টর ক্যানিং। 'গোটা ব্যাপারটা উদ্ভট লাগছে আমার কাছে—আমি তো কাউকেই খুন করিনি।'

'সেটা আরও খারাপ।'

'আই বেগ ইওর পার্ডন?'

'আপনি খুন করেছেন প্রক্সির মাধ্যমে। নির্দিষ্ট কিছু কাজ করানোর জন্যে পাইথনকে আপনি ভাড়া করেছিলেন। তার দ্বারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে দিনে দিনে মোটা হয়েছেন আপনি।'

'আমি আরও একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। দেশে আইন আছে। আইনের সাহায্য না চেয়ে আপনার মত একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বিদেশী এক লোকের অন্যায় আবদার কেন রক্ষা করতে চাইছেন?'

'আপনার হয়তো জানা নেই, মি. রানার কাছে ব্রিটিশ পাসপোর্ট আছে, তিনি একজন ব্রিটিশ নাগরিক। আর আইন যে আপনার কিছু করতে পারবে না, আপনার মত মি. রানাও তা জানেন।'

কয়েক মুহূর্ত কথা বললেন না ভিক্টর ক্যানিং। তারপর মাথার চুলে হাত চালালেন। 'এ-ধরনের হুমকি রীতিমত অসহ্য। মাথার ওপর এ-ধরনের একটা হুমকি নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।'

'আপনাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না,' গম্ভীর সুরে বললেন মারভিন লংফেলো।

'অবশ্যই আমি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করব না। আপনার মি. রানার ব্যবস্থা করার জন্যে এখুনি লোকজনের সাথে যোগাযোগ করব আমি। তার আগে নিজের নিরাপত্তার দিকে কড়া নজর রাখব। লক্ষ রাখব, মি. রানা বা তার সাঙ্গপাঙ্গরা যাতে আমার ত্রিসীমানায় না আসতে পারে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মারভিন লংফেলো। 'ওঁর সম্পর্কে আপনার ভুল ধারণা রয়েছে, মি. ক্যানিং। মি. মাসুদ রানা কখনও আপনার মত প্রক্সির সাহায্যে খুন করেন না। কাজটা তিনি নিজেই করবেন। এ-ব্যাপারে আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে মৃদু হাসলেন ভিক্টর ক্যানিং। তাকে সাহসের পরিচয় দিতে হবে, সাংঘাতিক ঝুঁকিও নিতে হবে। একটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি। ভিলার ভেতর কোথাও একটা বেল বাজল। বিশ সেকেন্ড পর সাদা জ্যাকেট পরা এক লোক বেরিয়ে এল টেরেসে। লোকটা দীর্ঘদেহী, কালো। ভিক্টর ক্যানিঙের কাছ থেকে কয়েক পা দূরে এসে দাঁড়াল সে, সবিনয়ে। 'আমার বিশেষ নাম্বারে ফোন করো—লন্ডন, প্যারিস, জুরিখ, রোম, ব্রাসেলস, ওয়াশিংটন ও টোকিওতে। সাড়ে এগারোটা থেকে শুরু করো, পাঁচ মিনিট পরপর। ও, মিচেল, লক্ষ্য রেখো, মি. লংফেলো বিদায় নেয়ার আগে তাঁকে যেন হুইস্কি দেয়া হয়।'

মাথাটা সামান্য কাত করল মিচেল, তারপর মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল। 'মশিয়ে?'

'আ হুইস্কি অ্যান্ড সোডা, প্লীজ।'

নিঃশব্দে চলে গেল মিচেল। ভিক্টর ক্যানিং বললেন, 'আমি লোকজনকে দিয়েই কাজ করাই। কোনটা ভাল, দেখতে পাব আমরা। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার মি. রানার কোন সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।' পরনের বীচ-রোবটা খুলতে শুরু করলেন তিনি। ভেতরে স্যুইম-স্যুট পরে আছেন।

'আপনি তাহলে রিভলভার হাতে বেডরুমে ঢোকার কথা বিবেচনা করছেন না?' জানতে চাইলেন বিএসএস চীফ। 'মি. রানা কিন্তু ওটাই পছন্দ করতেন।'

ভুরু জোড়া সামান্য কোঁচকালেন ভিক্টর ক্যানিং। 'ভড়ং আমার একেবারেই পছন্দ নয়, মি. লংফেলো, প্লীজ।' রোবটা চেয়ারের পিঠে রাখলেন, হাতঘড়িটা টেবিলের ওপর। 'আপনি আসায় আমি খুশি হয়েছি, বিলিভ মি। গুডবাই।' ঘুরলেন তিনি।

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে তাঁকে নেমে যেতে দেখলেন মারভিন লংফেলো। জেটিতে পৌঁছে ইতস্তত করলেন না ভিক্টর ক্যানিং, শেষ মাথা পর্যন্ত হেঁটে গেলেন, তারপর ডাইভ দিলেন পানিতে। খানিক পর পানির ওপর মাথা তুললেন, দ্রুত সাঁতার কেটে দূরে সরে যাচ্ছেন। দুশো গজ দূরে পানির ওপর মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে ছোট একটা দ্বীপ।

ট্রে হাতে ফিরে এল মিচেল, টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। সেদিকে

তাকালেন না মারভিন লংফেলো। ভিলার দিকে ফেরার জন্যে ঘুরল মিচেল, নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে তার পিছু নিলেন তিনি।

ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর সামনে থামলেন বিএসএস চীফ। কামরার শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিল মিচেল।

'আমি সিদ্ধান্ত পাল্টেছি,' বললেন মারভিন লংফেলো, দরজার গায়ে হেলান দিয়ে তাকিয়ে আছেন সাগরের দিকে, চেহারায় অন্যমনস্কভাব। 'হুইস্কির জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু সময় নেই, আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে।'

'জ্বে আজ্ঞে, মশিয়ে।' রিসিভার নামিয়ে রাখল মিচেল, অতিথি বিদায় নেয়ার অপেক্ষায় থাকল।

সৈকত থেকে একশো গজ দূরে দ্রুত, নিয়মিত ছন্দে সাঁতার কাটছেন ডিক্টর ক্যানিং। ছন্দে হঠাৎ করে, মুহূর্তের জন্যে, একটা পতন ঘটল। হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি। পানি একটু ছলকালও না, বিনা নোটিসে। নীল সাগরের পিঠ থেকে স্রেফ গায়েব হয়ে গেলেন।

কামরার ভেতর দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যাবার সময় মারভিন লংফেলো বললেন, 'তোমাকে ফোন করার সুযোগ দেয়া উচিত আমার, মিচেল।'

সৈকত থেকে আধ মাইল দূরে, খাঁড়ির পশ্চিম কোণের আড়ালে, ছোট একটা মোটরবোটে বসে বাদাম খাচ্ছে সোহানা। স্থানীয় ইংরেজ জেলে বৌ-এর মত ছুটা-ফাটা স্কার্ট ও ব্লাউজ পরেছে ও, হ্যাট দিয়ে মুখটা আড়াল করা। নির্দিষ্ট একটা কোর্সে অত্যন্ত ধীরগতিতে এগোচ্ছে বোটটা। বোটের নিচে, ত্রিশ ফুট রশির শেষ মাথায়, একটা ওয়াটার-প্রুফ লাল ল্যাম্প ঘন ঘন জ্বলছে আর নিভছে।

দশ মিনিট পর গানওয়েলে বাঁধা একটা রশিতে টান পড়ায় ছোট দু'টুকরো কাঠ পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খেল। প্রটল বন্ধ করে চারপাশে তাকাল সোহানা। সাগরে কেউ কোথাও নেই। চোখে বিনকিউলার তুলে কর্কশ পাহাড়ের গায়ের ওপর দৃষ্টি বুলাল, ঢালটা সৈকত থেকে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে।

কেউ লক্ষ করছে না বুঝতে পেরে রশিটায় দু'বার টান দিল সোহানা। দশ সেকেন্ড পর পানির ওপর মাথা তুলল রানা, স্কুবা স্যুটের কালো ছুড়ে চকচক করছে পানি। তাড়াতাড়ি বোটে উঠে স্কুবা স্যুট খুলে ফেলল ও, রশি টেনে তুলে নিল ল্যাম্পটা।

সোহানা জানতে চাইল, 'সব কাজ শেষ?'

উত্তরে ক্ষীণ হাসল রানা। ডিক্টর ক্যানিঙের পা ধরে হিড়হিড় করে নিচে টেনে এনেছিল ও। ধস্তাধস্তির কোন সুযোগ পাননি তিনি, নাগালের বাইরে ছিল রানা। কোন রকম ছটফটও করেননি ভদ্রলোক। রানার ধারণা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ফুসফুস পানিতে ভরে গিয়েছিল। লাশটা যদি পাওয়া যায়, শরীরে কোন চিহ্ন থাকবে না—ঠিক যেমন ড. জিমসনের বা জলি উডহাউসের শরীরে কোন চিহ্ন ছিল না।

'সব কাজ শেষ,' বলল রানা। 'চলো, বাড়ি ফিরি, সোহানা। আশরাফ আর জেনি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।'

*

সকালের প্রথম রোদ লেগে ভিলার সাদা পাঁচিল ধবধব করছে। গ্রামের শেষ মাথায় স্থির হয়ে আছে বনভূমি, আজ এখনও বাতাস দেয়নি। দিনটা শুকনো ও ভাল যাবে বলে মনে হলো সোহানার।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল ও, গা এখনও একটু ভেজা ভেজা। শার্ট ও কর্কশ টুইড স্কার্ট পরল, শার্টের ওপর চড়াল পুরানো একটা জ্যাকেট। খালি পায়ে নিচতলায় নেমে এল ও, কিচেনে ঢুকে কফি বানাল। আশরাফ বা জেনি, কারও ঘুম ভাঙেনি, যে যার কামরায় ঘুমোচ্ছে। কফি কাপে চুমুক দিতে দিতে টেবিলের ওপর একটা অর্ডন্যান্স ম্যাপের ভাঁজ খুলল ও। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর পেন্সিল দিয়ে একটা রেখা আঁকল ম্যাপে–ভিলা থেকে শুরু হয়ে বিশ মাইল দূরে থামল রেখাটা। বনভূমির ভেতর দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ, এঁকেবেঁকে চলে গেছে, একবার শুধু একটা তেমাথা পেরুতে হবে।

পথটা মনে গেঁথে নিয়ে কফি শেষ করল সোহানা, তারপর কফি ভর্তি ফ্লাস্ক ও পানির বোতল ভরল একটা লম্বা ব্যাগে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, ভাবল সঙ্গে খাবার নেবে কিনা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা বাতিল করে দিল ও।

ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে ভিলা থেকে বেরিয়ে এল সোহানা। মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকল, খালি পায়ে হাঁটতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

দু'ঘণ্টা পর একটা পাহাড়ের কাঁধের নিচে বসে বিশ্রাম নিল সোহানা, আরও এক'কাপ কফি খেল। দুপুরের মধ্যে মাত্র তিনজন লোকের সঙ্গে দেখা হল ওর–দু'জনকে দেখল দূর থেকে, শেষ লোকটাকে কাছ থেকে। তাকে চিনতে পারল সোহানা, ওদের গ্রামেরই একজন কাঠুরে, কিন্তু মাথায় চওড়া হ্যাট ও পরনে পুরানো কাপড়চোপড় থাকায় লোকটা সম্ভবত ধরে নিল কোন জিপসি হবে। রওনা হবার ছ'ঘণ্টা পর গন্তব্যে পৌঁছুল সোহানা। সরু একটা নদীর ওপর গাছপালা ঝুঁকে আছে, জঙ্গল ঢাকা ঢাল বেয়ে নেমে গেছে স্রোতটা।

এবার খিদে পেয়েছে সোহানার, তবে খিদে মেটাবার কোন চেষ্টা করল না। নদীর কিনারা থেকে কয়েক ফুট দূরে ঘাসগুলো লম্বা আর শুকনো। কফি খেল ও, ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়ল। একটু পরই ঘুম নেমে এল চোখে।

ঘুম একবার হালকা হলো সোহানার, অস্পষ্টভাবে ধোঁয়ার গন্ধ পেল নাকে, কোথাও যেন ডালপালা পুড়ছে। বুঝতে পারল, ও একা নয়। কটেজে ফেলে আসা ম্যাপটার কথা মনে পড়ল একবার, পুলক ও তৃপ্তির একটা আবেশে শিরশির করে উঠল শরীর, আবার তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

সূর্য তখনও যথেষ্ট গরম, পুরোপুরি ঘুম ভাঙল সোহানার। পাঁচ-সাত গজ দূরে ঘাসের ওপর শুয়ে রয়েছে রানা, ওর পাশে ছাইয়ের একটা উঁচু স্তূপ, স্তূপটা থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল সোহানা, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা ফ্লাস্কটা নামিয়ে রানার পাশে এসে বসল। 'চিনতে পারো, আমি সোহানা,' বলল ও। 'কি খেতে দেবে তাড়াতাড়ি দাও, খিদেতে আমার জান বেরিয়ে যাচ্ছে।'

একটা লাঠি দিয়ে ছাইটা নাড়ল রানা। ছাই সরে যেতে দেখা গেল, ভেতরে কাদার দুটো বড় বল রয়েছে, ফুটবল আকৃতির। আগুনে পুড়ে বল দুটো শক্ত ও কালো হয়ে গেছে। একটা ছুরি বেরিয়ে এল ওর হাতে। বলল, 'না খেয়ে বলতে পারব না কেমন হয়েছে।'

'জিনিসটা কি?'

'জিপসিদের খাবার, নাম জানি না,' বলল রানা, হাসছে। 'খরগোশের মাংস।'

জবাই করা খরগোশ, তবে ছাল ছাড়ানো হয়নি। কাদার ভেতর পুরো দু'ঘণ্টা পোড়ানো হয়েছে আগুনে। মাটির শক্ত বল ভাঙার সময় শিরদাঁড়া ও চামড়া, দুটোই নিজে থেকে বেরিয়ে আসবে। মাংসটা কচি, গন্ধ পেয়ে জিভে পানি এসে গেল সোহানার।

খাবার সময় গোগ্রাসে খেল, দু'জনেই। কেউ কোন কথা বলল না। কলাপাতা কেটে এনে পরিবেশন করল রানা, পাতার টুকরো হাতে নিয়ে নরম মাংস ছিঁড়তে কোন অসুবিধে হলো না ওদের। খাওয়া শেষ হতে কফি পরিবেশন করল সোহানা, জানতে চাইল, 'হেঁটে এসেছ নাকি, রানা?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কটেজে আজ দুপুরের একটু পর ফিরেছি। ম্যাপটা দেখে সোজা চলে এলাম।' জরুরী কাজে লন্ডনে গিয়েছিল ও, আজই ওর ফেরার কথা ছিল। 'গাড়িটা রেখে এসেছি খানিক দূরে, বিশ মিনিট লাগবে পৌঁছুতে।'

নদী থেকে মুখ ধুয়ে এল সোহানা। 'আশরাফ কি বলছে, শুনবে?'

'কি বলছে?'

'খুবই আড়ষ্ট তার হাবভাব, কিন্তু সিদ্ধান্তে অটল,' হাসি চাপল সোহানা। 'বলছে, জেনি উডহাউর্স নাকি জন্মেছেই তার জন্যে, সে-ও জেনি উডহাউসের জন্যে। মস্কোয় ফিরে যাবার আগেই বিয়ে করতে চায় ওরা।'

'শুনে তুমি কি বললে?'

হেসে উঠল সোহানা। 'আমি আবার কি বলব! সে কি আমার পরামর্শ চেয়েছে? বললাম, এরচেয়ে সুখবর আর কিছু হতে পারে না। তোমার কি মনে হয়?'

'আমিও জেনিকে তাই বলেছি,' বলল রানা। 'সে-ও আমাকে ওদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে।'

'এখন কি করবে বলে ভাবছ?' জানতে চাইল সোহানা।

'তোমার ছুটি শেষ হলেও কাজ করতে হবে ইউরোপে, কিন্তু বস্ আমাকে ঢাকায় ডেকে পাঠিয়েছেন,' বলল রানা। 'ওদের বিয়েটা দেখেই আমি ফিরে যাব।'

'ভালই হবে, বসের কাছে সরাসরি রিপোর্ট করতে পারবে তুমি। ভাল কথা, গুপ্তধন বলতে কি কি পেয়েছি আমরা, রানা? মনে পড়ছে, তুমি বলেছিলে মাটিতে পুঁতে রাখার জন্যে ট্রাক নিয়ে একটু দূরে যাচ্ছ। কিন্তু ট্রাক নিয়ে তুমি চলে যাবার আগে বাক্সগুলোয় কি আছে দেখা হয়নি আমার।'

'কি আছে দেখার আগ্রহ তখন খুব একটা ছিল না আমারও,' বলল রানা 'শুধু একটা বাক্স খুলেছিলাম।' সিধে হয়ে বসল রানাও, পকেটগুলো হাতড়াল। 'তুমি

কথাটা তুলতে মনে পড়ে গেছে। বিল ওয়াটসনকে টাকা দিয়েছ তুমি, কাজেই ভাবলাম ওই টাকার বিনিময়ে এটা তোমার পাওয়া উচিত।' মুঠো করা হাতটা সোহানার দিকে বাড়িয়ে ধরল ও।

হাত পাতল সোহানা, ওর তালুতে একজোড়া ঝলমলে চুনি পাথর রাখল রানা।

'মাই গড!' রুদ্ধশ্বাসে বলল সোহানা, তারপর মূল্যবান রত্ন দুটোর দিকে চুপচাপ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টে।

'শুধু এই দুটো এনেছি আমি,' বলল রানা। 'তিনশো গারামান্টাস পাথর থেকে। স্রেফ খরচ তোলার জন্যে। বাকিটা প্রিয় মাতৃভূমির কোষাগারে জমা দেয়া হবে, উপযুক্ত সময়ে।'

মুখ তুলল সোহানা। 'কিন্তু ওয়াটসনকে যে টাকা দিয়েছি তা তো এরই মধ্যে তুলে ফেলেছি আমি।'

'তুলে ফেলেছ? মানে? কিভাবে?'

'তুমি ভিক্টর ক্যানিঙের খবর নেয়ার দু'দিন আগে ক্যানিং হোল্ডিঙের কিছু শেয়ার আমি বিক্রি করে দিই। পঞ্চাশ হাজার শেয়ার। মারা যাবার খবরটা জানাজানি হতেই শতকরা পঁচিশ পার্সেন্ট দাম কমে গেছে।'

হেসে উঠল রানা। 'তাহলে পাথর দুটো নিয়ে কি করব আমরা?'

রানাকে ওগুলো ফিরিয়ে দিল সোহানা। 'দুটো আঙটি তৈরি করতে দাও, ওদের বিয়েতে দু'জনকে উপহার দেয়া যাবে,' প্রস্তাব দিল ও।

'দারুণ প্রস্তাব!' চুনি দুটো পকেটে রেখে দিল রানা। 'এবার তাহলে রওনা হতে পারি আমরা, কি বলো?'

একটু পরই বনভূমিতে গাঢ় ছায়া নেমে এল, সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই। সরু পথ ধরে পাশাপাশি হাঁটছে ওরা, রানার একটা হাত ধরে আছে সোহানা, মুখে হাসি।

মাসুদ রানা

আমি সোহানা

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

দাঁড়াল পাইথন, তার বিশাল দুই হাত ঝুলে পড়ল, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে রানার দিকে। 'আমি কি তোমাকে বলেছি, হাড় ভাঙার শব্দ শুনতে যে ভালবাসি? বলিনি…?' রানাকে ছাড়িয়ে আরও দূরে সরে গেল তার দৃষ্টি। 'দেখা যাচ্ছে, উল্লাসে অধীর শোনায় তার কণ্ঠস্বর, 'মাসুদ রানা একা নয়, সাথে সোহানা চৌধুরীও আছে!' প্যাসেজের শেষ মাথায়, দরজার বাইরে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সোহানা, বিশ গজ দূরে। মুখটা ফ্যাকাসে, চোখ দুটো বড় বড়। গায়ে শার্ট নেই, বাহুর ব্যান্ডেজটা দেখা যাচ্ছে। একমাত্র আল্লাহই বলতে পারে কিভাবে তার ঘুম ভাঙল। ধীরে ধীরে, অনেক কষ্টে, দরজার পাশে হেলান দিল ও, তাকিয়ে আছে রানার দিকে, হাত দুটো কোলের ওপর। সমস্ত শক্তি এক করে গলায় জোর আনার চেষ্টা করল ও, বলল, 'এখন তোমাকে জিততে হবে, রানা।' রানার অস্তিত্বের গভীরে গর্জে উঠল হিংস্র একটা বাঘ। সোহানার কথা ভাবছে। ওকে বাঁচাতে হবে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০